

উৎকর্ষের সন্ধানে: বাংলাদেশ সিরিজ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মানবিক রাষ্ট্র

ডেটার ১০টি ব্যবহার



রকিবুল হাসান

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মানবিক রাষ্ট্র

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মানবিক রাষ্ট্র

ডেটার ১০টি ব্যবহার

রকিবুল হাসান





প্রকাশক: আদর্শ

৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০

☎ +০২-৯৬১২৮৭৭, ০১৭৯৩২৯৬২০২, ০১৭১০৭৭৯০৫০

✉ hello@adarsha.com.bd 🌐 www.adarsha.com.bd

📍 myAdarsha 📍 my.Adarsha 📍 c/myAdarsha 📍 company/adarsha

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মানবিক রাষ্ট্র

৩য় মুদ্রণ: ১৯শে পৌষ ১৪২৯; ৩ জানুয়ারি ২০২৩

২য় মুদ্রণ: ২৪ ভাদ্র ১৪২৮; ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

১ম প্রকাশ: ১৫ বৈশাখ ১৪২৭; ২৮ এপ্রিল ২০২১

© রকিবুল হাসান

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত; লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো
মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা: আদর্শ প্রিন্টার্স

রকমারিতে আদর্শের বই: www.rokomari.com/adarsha

Kritrim Buddhimattay Manabik Rashtro (Published in Bengali)

by *Rakibul Hassan*

Published by Adarsha

38 P. K. Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100

ISBN: 978-984-95648-8-1

উৎসর্গ

পরিষেবা

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের

যাদের প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনায় সহজ হচ্ছে সরকারি সেবা। যারা সেবাগুলোকে সহজ করে নিয়ে যাচ্ছেন মানুষের দোরগোড়ায়।

নীতিমালার মারপ্যাঁচে নয় বরং কী করলে মানুষের জীবন সহজ হবে, সেই ছোট ছোট উদ্ভাবনায় কাটছে যাদের প্রতিদিন। তবে, এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে পরিষেবা দিতে তাদের দরকার একটা জাদুর কাঠি, যা ছুঁয়ে দেবে ১৭ কোটি জীবনকে, তাদের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নে।

সেই জাদুর কাঠি ডেটার ব্যবহার নিয়ে এই বই, যা পাল্টে দিচ্ছে ‘বুদ্ধিমান’ দেশগুলোকে।

ধন্যবাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারকে সেরা ৩০টা বছর দেবার জন্য। বিশেষ করে, ডেটার ব্যবহার নিয়ে আমার ‘অন্তর্দৃষ্টি’ খুলে দেবার ব্যাপারে।

এই বইটি হয়তোবা আরও ৫ বছর পর লেখা যেত, তবে, আমার মনে হয়েছে— অনেক কাজ অসাধারণ গতিতে এগিয়েছে ভেতরে-ভেতরে।

প্রযুক্তির একদম ভেতরের মানুষ হিসেবে বলছি। এখন দরকার শুধু যোগসূত্র, সংস্থাগুলোর মধ্যে। টাইম লাইন, মাত্র ৩ বছর।

রকিবুল হাসানের অন্য বইসমূহ

হাতেকলমে মেশিন লার্নিং (২য় সংস্করণ)

শূন্য থেকে পাইথন মেশিন লার্নিং (৩য় সংস্করণ)

হাতেকলমে পাইথন ডিপ লার্নিং

হাতেকলমে ‘বাংলা’ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং

সূচি

উৎকর্ষের সন্ধানে: বাংলাদেশ	১৩
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটার ১০টি ব্যবহার = মানবিক রাষ্ট্র	১৩
টেকনোলজিক্যাল জাস্টিস অর্থাৎ ‘প্রযুক্তিগত ন্যায়বিচার’	১৫
যে ১০টি জিনিস পাল্টে দিতে পারে বাংলাদেশকে (২০২২-২৪)	১৭
১৬ কোটি মানুষের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা	১৭
একটা মানুষকে ‘এনাবল’ করতে হবে তার স্বপ্নের কাছে যেতে	১৮
আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট, ‘ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার’— ব্লকচেইন	২২
জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী অর্থাৎ ‘সোশ্যাল সেফটি নেট’	২৪
ভর্তুকি, ‘ঋণাত্মক আয়কর’ এবং সর্বজনীন ন্যূনতম আয়	২৫
ওপেন ডেটা শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম— তথ্যকে ব্যবহার	২৫
‘অ্যান্টিসিপেটরি গভর্নমেন্ট’ অর্থাৎ আগাম ধারণার প্রশাসন	২৬
মহামারি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার	২৭
বুদ্ধিমান আয়কর পদ্ধতি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ম্যানেজমেন্ট	২৮
আইন, নীতিমালা, বিধি তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	২৯
‘স্পেশলাইজড’ কাজে যন্ত্র সেরা	৩০
বাংলাদেশ প্রস্তুতাবনা, কোথায় যাব আমরা?	৩০

কৃতজ্ঞতা এবং বাড়তি রিডিং ৩২

রিবুটিং ইন্ডিয়া, রিয়ালাইজিং এ বিলিয়ন অ্যাসপিরেশন্স	৩২
অক্সফোর্ডের একটা অনলাইন কোর্সওয়ার্ক	৩৩
মোবাইল অপারেটরদের গ্রুপের ডকুমেন্টেশন	৩৪
বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অসংখ্য ডকুমেন্ট	৩৪

কেন বইটা লিখতে চাইলাম? ৩৭

চিন্তা করতে শেখা, রাস্তায় নামলেই হাজার চিন্তা	৩৭
স্ট্যান্ডিং অন দ্য শোল্ডার'স অব জায়ান্ট	৩৯
ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম	৪২
দেশ কীভাবে চালাতে হয় সেটার অপটিমাইজেশন প্ল্যান	৪৩
রি-ইউজ্বেল জ্ঞান	৪৪
দেশ চালানোর বিজনেস প্ল্যান এবং ড্যাশবোর্ড	৪৬

প্রাথমিক 'রিভিউ ব্লক' ৪৯

অটোমেশন, বুদ্ধিমান সফটওয়্যার = কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	৪৯
ডেটা, 'স্ট্রাটেজিক অ্যাসেস্ট' এবং ওপেন ডেটা ইনিশিয়েটিভ	৫২
৬ মাসে বর্তমান যেকোনো সরকারি সেবাকে অনলাইনে আনা	৫৫
ক্লাউড কম্পিউটিং, ডেটা রেসিডেন্সি, তথ্যের নিরাপত্তা	৫৬

এআই: শুরুর ধারণা ৬৩

কীভাবে এখানে এলাম?	৬৩
কেন প্রয়োজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার?	৬৬
'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' জিনিসটা কী?	৬৮
যন্ত্রের নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা	৬৮
সনাতন প্রোগ্রামিংয়ের সঙ্গে মেশিন লার্নিং একদম উল্টো কেন?	৬৯
পেছনের ড্রাইভিং ফ্যাক্টরগুলো কী কী?	৭১
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুটো 'অ্যাপ্রোচ'	৭৫
টেক্সটবুকের কিছু ডেফিনিশন	৮০

চার ডাইমেনশনে, আট ডেফিনেশন	৮২
অ্যারিস্টোটলের বিখ্যাত ‘ধারণার নীতিমালা’ (ল’স অব থটস)	৮৪
মানবিক ক্ষমতা: যুক্তিযুক্তভাবে কাজ করতে পারা	৮৬
অ্যালান টুরিং টেস্ট	৮৬
বর্তমান চিন্তাধারণা, যন্ত্রের চিন্তা নিয়ে	৮৮
যন্ত্রের উপলব্ধি বোধ, চাইনিজ-রুম যুক্তি	৮৮
মানুষ এবং যন্ত্র কীভাবে শেখে?	৯০
মানবিক ক্ষমতা: ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (এনএলপি)	৯১
সিদ্ধান্তের ‘লুপ’ থেকে মানুষকে বের করে আনা	৯৫
ইফ দিস, দেন দ্যাট: এবং ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিকেশন	৯৬
সরকারকে ছোট করে নিয়ে আসার ধারণা	৯৭
ডেটা কীভাবে কথা বলে?	৯৮
মেশিন লার্নিং কেন?	১০৯
ডিপ লার্নিং ব্যাপারটা কী?	১১২
শব্দের এমবেডিং প্রজেক্টর, ঘটনার সিগনেচার	১২০

আগাম ধারণার প্রশাসন	১২৬
ভবিষ্যতের সরকার এবং গ্লোবালাইজেশন ইফেক্ট	১৪০
অপরাধ শনাক্তকরণ পদ্ধতি, ক্রাইম ডেটা	১৪৮
‘ক্রাইম প্রেডিকশন’, অপরাধ না হলে কেমন হয়?	১৪৯

বাংলাদেশ এবং আগাম ধারণার প্রশাসন, কীভাবে?	১৫৫
অ্যান্টিসিপিটরি গভর্নমেন্ট অর্থাৎ আগাম ধারণার প্রশাসন	১৫৫
প্রেডিকটিভ মডেল, সামাজিক সুবিধা দেবার ক্ষেত্রে	১৫৭
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ‘সামগ্রিক’ প্রশাসন	১৫৭
শক্তি উৎপাদন, জেনারেশনে অসাধারণ ‘অপটিমাইজেশন’	১৫৮
বিভিন্ন জরুরি সেবা কল সেন্টারের ডেটা অ্যানালাইসিস	১৬০
মানুষকে মধ্যে রেখে সল্যুশন— ‘হিউম্যান সেন্টারড ডিজাইন’	১৬১

‘কো-ক্রিয়েশন’, জনগণকে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিতে আনা	১৬১
কৃষক এবং অন্যান্য আত্মহত্যার যোগসূত্র	১৬৩

বাংলাদেশে আইডেনটিফিকেশন ১৬৭

কাগজের ফটোকপি দৌরাওয়া, আর কত দিন?	১৬৭
কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর, বর্তমান শনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং ফটোকপি	১৭২
শনাক্তকরণ পদ্ধতি/আইডেনটিফিকেশন	১৭৭
সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (সিআরভিএস)	১৮৪
সিআরভিএস এবং শিক্ষার্থী একীভূত আইডি	১৮৭
জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং পাসপোর্ট	১৯১
এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস, জাতীয় ডেটাহাব	১৯৪

দেশের নীতিনির্ধারণী ড্যাশবোর্ড ১৯৭

নীতিনির্ধারণী ড্যাশবোর্ড নিয়ে কাজ	১৯৭
ড্যাশবোর্ড কী এবং কেন এটা দরকার?	২০০
দেশের কাজগুলোর অগ্রগতি জানব কীভাবে?	২০৩

সরকারি সার্ভিসগুলোর সহজীকরণ ২০৭

সরকারি খাতে উদ্ভাবনা স্পর্শ করবে মানুষের জীবন	২০৭
ডিজিটাল প্রসেস-ফ্লো এবং অ্যানালগ কর্মপন্থা	২১৭
সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ এবং প্রসেস ম্যাপ তৈরি	২২০
সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের দৃষ্টান্ত এবং সিঙ্গাপুর	২৩৫
একটা উদাহরণ, আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র	২৪০

সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর সুবিধা বণ্টন ব্যবস্থাপনা ২৪৯

মানবিক রাষ্ট্র থেকে কত দূরে বাংলাদেশ?	২৪৯
সুবিধাবঞ্চিতদের শনাক্ত করব কীভাবে?	২৫১
ফ্রেমওয়ার্কের আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে সুবিধা প্রদান	২৫৪
সর্বজনীন ন্যূনতম আয়, ব্লকচেইন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	২৫৭

বুদ্ধিমান ভর্তুকি বণ্টনব্যবস্থা ২৬৪

উদীয়মান অর্থনীতিতে শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং কৃষি ভর্তুকি	২৬৪
ভর্তুকি বণ্টন নীতিমালা এবং তার ব্যবস্থাপনার ড্যাশবোর্ড	২৬৮
ভোক্তাকে সরাসরি ভর্তুকি প্রদানের ধারণা, শনাক্তকরণ পদ্ধতি	২৭০

নতুন আয়কর পদ্ধতি: পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ২৭৪

বুদ্ধিমান আয়কর সংস্থা এবং তার কাজ	২৭৪
এক সংস্থা, তবে গ্রুপভিত্তিক আলাদা মাথা	২৭৮
অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট’ ব্যবস্থাপনা	২৮১

নীতিমালা তৈরিতে এআই ২৮৬

নীতিমালা তৈরিতে কেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?	২৮৬
সবার জন্য নীতিমালা, স্বচ্ছতার ভিত্তিতে	২৮৭
‘ডেটা ড্রিভেন’ সরকারের ম্যান্ডেট	২৮৯
ছোট ছোট সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়া যায় যন্ত্রের কাছে	২৯১
দরকার ডেটা শেয়ারিং, সংস্থাগুলোর ভেতরে	২৯১
সিদ্ধান্তে অ্যালগরিদমের ব্যবহার	২৯৩
মানুষকে কিছু ‘অদরকারি’ সিদ্ধান্তের লুপ থেকে বের করে আনা	২৯৫
ফেসবুকের নিউজফিড অ্যালগরিদম	২৯৬
শ্রম চাহিদা ও বেকারদের (লেবার মার্কেট) সহায়তা অ্যালগরিদম	২৯৭
স্বাস্থ্যসেবা খাতের বিলের সত্য্যখান অর্থাৎ ভেরিফিকেশন	২৯৮
সামাজিক অ্যালগরিদম: কী ঘটতে যাচ্ছে সামনে?	২৯৯
নীতিমালা তৈরির ফ্রেমওয়ার্ক, পলিসি সাইকেল	৩০০
রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা, শুরুতেই সমস্যাটা কী?	৩০২
ডেটা থেকে নীতিমালা প্রণয়ন	৩০৪
ডেটা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা	৩০৭
ডেটার সঙ্গে নীতিমালার বাস্তবায়ন	৩০৯

সামগ্রিক প্রস্তাবনা	৩১২
ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মন্ত্রণালয়, চিফ ইনফরমেশন অফিসার	৩১২
‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট’, ব্লকচেইন ‘ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার’	৩১৩
সেবা সহজীকরণ প্রসেস ম্যাপ তৈরি, সংস্থাভিত্তিক	৩১৪
ইউনিক শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে অনলাইন আবেদনের বাধ্যবাধকতা	৩১৫
সংস্থাগুলোর মধ্যে ডেটা শেয়ারিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার	৩১৬
ডেটা সেন্টারের প্রাইভেটাইজেশন/পিপিপি, ক্লাউড	৩১৮
ইলেকট্রিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলোকে সিকিউরিটি প্রদান	৩২০
লাইসেন্সবিহীন ওপেনসোর্স প্রযুক্তির ব্যবহার (ছোট স্কেলে)	৩২১
প্রশাসনে একীভূত ‘এলড্যাপ ডিরেক্টরি’ সার্ভিস	৩২২
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়ার গবেষণায় আনা	৩২২
সহজীকরণ প্রসেস ম্যাপ থেকে ‘রুল বেইজড’ পদ্ধতিতে কনভার্সন	৩২৩
ভর্তুকিকে প্রান্তিক পর্যায়ে নিতে প্রয়োজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	৩২৪
এআই’র ব্যবহারে সবাইকে সমাজে ফিরিয়ে আনা: মানবিক রাষ্ট্র	৩২৪

উৎকর্ষের সন্ধানে: বাংলাদেশ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটার ১০টি ব্যবহার = মানবিক রাষ্ট্র

এখনই সময়

The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is NOW.

—Chinese proverb

কোথায় যেতে চাই আমরা?

কয়েক হাজার বছরে মানবসভ্যতা এগিয়েছে অনেক। উৎকর্ষতা, অপটিমাইজেশন এবং দক্ষতা হচ্ছে এই শতকের মূল মন্ত্র। সেটার প্রয়োজনে যোগ দিয়েছে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’। যাকে আমরা ইংরেজিতে বলছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সংক্ষেপে ‘এআই’। মানুষের সহজাত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তার যোগসূত্র না থাকলে পরবর্তী শতকে যাওয়া দুষ্কর। সবার জন্য জুতসই শিক্ষা’, প্রযুক্তিগত ন্যায়বিচার, নতুন ড্রাগ ডিসকভারি, দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি, আরবান প্ল্যানিং, মাস ট্রানজিট সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিক রাষ্ট্রের ধারণা, ড্যাশবোর্ডের সাহায্যে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো অনেকটাই যৌথ উদ্যোগ ডেটার সাহায্যে, এ মুহূর্তে। বিশেষ

১. জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ‘গুণগত শিক্ষা’, বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছে। তাই শিক্ষার পাশাপাশি ‘বৈষম্য হ্রাস’ এবং ‘বিচার প্রাপ্তির শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান’-এর জন্য শিক্ষা, বিচারিক ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

করে মানুষকে ‘এনাবল’ করতে— তার স্বপ্নের জায়গায় পৌঁছাতে। তার জীবদ্দশায়। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনায় এসব কিছুই করা সম্ভব অল্প সময়ে। সেখানে আমরা পড়ে আছি অনেক পেছনে। অন্য সম সম্ভাবনার দেশগুলো থেকে।

আগে যেই জিনিস করতে লাগত কয়েক যুগ, সেটা এখন লাগছে কয়েক বছর। এই কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের কথাই ধরুন। এখন প্রযুক্তির সাহায্যে যেকোনো কোভিড-১৯ ভাইরাস ভ্যারিয়েন্ট ভ্যাকসিন তৈরি করা যায় ৩০ দিনে। আমাদের দেশে একটা পাসপোর্ট কিংবা একটা ক্লিয়ারেন্স, নামজারি, দলিল ইত্যাদি বানাতে কয়েক সপ্তাহ থেকে মাস লাগলেও আমরা চেষ্টা করলে হাতের নাগালের প্রযুক্তি সেটাকে ডেলিভারি দিতে পারে কয়েক ঘণ্টায়। সরকারি/বেসরকারি সার্ভিস ঘণ্টায় নামিয়ে আনতে পারলে মানুষের এক জীবনেই অনেক কিছু করা সম্ভব। প্রতিটা মানুষ অনেক স্বপ্ন নিয়ে জন্মায়। এই প্রযুক্তির সাহায্যে একটা মানুষকে ‘এনাবল’ করা সম্ভব, তার স্বপ্নের কাছে যেতে।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার সেই মাসলোর তত্ত্বের প্রাথমিক/মাধ্যমিক চাহিদা মেটাতে প্রযুক্তি রয়েছে আমাদের হাতের নাগালে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর ব্যবহার ঠিকমতো করা গেলে এক জীবনেই অনেক কিছু করতে পারবে মানুষ। সেই ‘দক্ষতা’ এবং উৎকর্ষের সন্ধানে আপনাদের সঙ্গে করে নেমেছি এই বইটাতে। একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন— মানুষের প্রাথমিক চাহিদা মিটে গেলে সেই একই মানুষ অনেক কাজ ফেরত দিতে পারেন মানব কল্যাণে। সে কারণে উন্নত বিশ্বের শীর্ষে থাকা মানুষজন ‘ফিলানথ্রোপিক’ অর্থাৎ জনহীতকর কাজে ঝুকে পড়ছেন।

এখন আমরা হয়তোবা বাঁচি ৭০-৮০ বছর। এই সময়ের মধ্যে প্রতিটা মানুষকে ‘এনাবল’ করতে পারলে— আমরা দেশ হিসেবে যেতে পারতাম আরও দূরে। এখন বেসিক সার্ভিস ডেলিভারি (যেমন— নিজ এলাকায় বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি, আয়কর রিটার্ন, পেনশন, জন্মনিবন্ধন ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেলিভারি) জায়গাগুলোতে সময় বাঁচিয়ে দিতে পারলে সেই মানুষটা তার স্বপ্নের কাজে সময় দিতে পারত আরও বেশি। একটা মামলার রায় পেতে যত দিন হারিয়ে যায় একটা মানুষের জীবন থেকে, সেই সময়টা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেবে বর্তমান প্রযুক্তি। ‘প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষের ক্ষমতায়ন’ কাজের আউটপুট পেতে হলে প্রযুক্তির সেই দক্ষতা

এবং উৎকর্ষের ধারণাতে যুক্ত হতে হবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। পাল্টাতে হবে আমাদের ‘মাইন্ডসেট’।

সংজ্ঞা: egalitarian

believing in or based on the principle that all people are equal and deserve equal rights and opportunities.

যেমন— ‘a fairer, more egalitarian society’.

—Dictionary

টেকনোলজিক্যাল জাস্টিস অর্থাৎ ‘প্রযুক্তিগত ন্যায়বিচার’

ইদানীংকালে ‘টেকনোলজিক্যাল জাস্টিস’ অর্থাৎ ‘প্রযুক্তিগত ন্যায়বিচার’ ধারণাটা চলছে বিশ্বজুড়ে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিকভাবে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধানে এবং সেই সঙ্গে এই ধারণাটা আরও সমতাবাদী সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। একটা দেশে সবাই সব ধরনের নাগরিক সুবিধা (ইগালিটারিয়ান ধারণা = পৃথিবীর সবাই সমান, তাই তাদের সুবিধাও সমান) পেলে অন্য দেশগুলোর নাগরিকদের কী হবে?

বিশেষ করে, এখন প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ‘অসাধারণ’ উন্নয়ন সব ধরনের সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করছে। তবে, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সুবিধাগুলো বিশ্বব্যাপী ‘অসমভাবে’ বিতরণ করা হয়েছে বললে ভুল হবে। কারণ, এখন যে কেউই সেই উদ্ভাবনাগুলোকে ব্যবহার করতে পারে এই ওপেনসোর্সের যুগে। বরং, এই প্রযুক্তিগুলোকে ঠিকমতো ব্যবহার না করায়— আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, যা আমাদের ভেতরের বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

এই বইয়ে, আমাদের বিশ্বব্যাপী সমাজে (আমরা এখন গ্লোবাল সিটিজেন*), বিশেষত, দারিদ্র্য কমাতে ও টেকসই অগ্রগতির জন্য সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলোকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির একটা নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখাব

২. গ্লোবালাইজেশনের ইফেক্ট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অথবা আরেকটা দেশে কী হচ্ছে, সেটা নিয়ে আমাদের দেশের মানুষ উদ্বিগ্ন প্রকাশ করছেন। সেভাবে, আমাদের দেশে কিছু ঘটলে সেটা নিয়ে অন্য দেশের মানুষ কথা বলছেন।

আমরা। উন্নত দেশগুলোর সব উদ্ভাবনার পেছনে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে ‘বুদ্ধিমান’ ডেটা ড্রিভেন সফটওয়্যার (প্রযুক্তি), যোগুলোর সবকিছুই ‘ইন্টার-কানেকটেড’। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে। এ ধরনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়ে আছে আমাদের দেশেও।

এর পাশাপাশি, আমাদের সমাজের মধ্যে ‘প্রযুক্তিগত ন্যায়বিচার’ অর্থাৎ ‘টেকনোলজিক্যাল জাস্টিস’ ধারণাটা গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, মানুষের নতুন মাইন্ডসেট ঘিরে, ডেটা শেয়ারিংয়ের উৎকর্ষে। এই ধারণাটা আমি পেয়েছি ‘জি-২০’ দেশগুলোর পলিসি অ্যাজেন্ডা থেকে। তারা এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটা নীতি ও পদক্ষেপের প্রস্তাব দেয়, যাতে ‘জি-২০’ দেশগুলো প্রযুক্তির এই অবদানকে বৈশ্বিক কর্মসূচিতে রেখে সেটার একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিতে পারে। এই ধারণা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ, আমাদের সেই প্রযুক্তি আছে হাতের নাগালে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, হাতের নাগালের প্রযুক্তি

প্রযুক্তির এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ধরনের ধারণা পাচ্ছিলাম গত এক দশক ধরে। তবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জিনিসটা যখন ‘রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ ধাপ পেরিয়ে চলে এসেছে ‘গুরুতর’ ব্যবহারিক পর্যায়ে তখন ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ থেকে সুবিধা না নিতে পারলে আবারও পিছিয়ে পড়ব আমরা। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু সফটওয়্যারের পেছনের প্রযুক্তি যেমন ‘ডিপ লার্নিং’, পাশাপাশি আমাদের হাতে এত বেশি ডেটা এসেছে, সেটা থেকে প্রজ্ঞা না নিতে পারা অদক্ষতার মধ্যে পড়ে যায়। ‘এনলাইটেড’ অর্থনীতিগুলোতে অদক্ষতা এখন শাস্তির পর্যায়ে পড়ে। আমাদের নীতিমালাও আছে তৈরি, প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগ।

এদিকে অনেক দেশ এবং কোম্পানিগুলোর মধ্যে যাদের কাছে ডেটা আছে, তারাই অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের অগোচরে। সেদিক থেকে আমরা কত দূরে সেটা নিয়েই আলাপ করব একটা পর্যায়ে। বাংলাদেশের এত বিশাল জনগোষ্ঠীকে সার্ভিস ডেলিভারিতে ডেটা ‘ড্রিভেন’ হওয়া ছাড়া গতি নেই আমাদের। এত অল্প জায়গায় এত জনবলকে তাদের আকাঙ্ক্ষার দাম দিতে চাইলে কাজের প্রসেস অপটিমাইজেশন দরকার আগে, শুরুরতে।

ডেটা = ‘স্ট্রাটেজিক’ অ্যাসেট

ডেটাকে ‘ডিক্লেয়ার’ করতে হবে জাতীয় পর্যায়ে— ‘স্ট্রাটেজিক’ অ্যাসেট হিসেবে। পাবলিক ডেটাকে ওপেন ‘এপিআই’, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস দিয়ে যুক্ত করতে দিতে হবে সংস্থাগুলোর মধ্যে। ‘প্রাইভেসি’ ডেটার জন্য আছে আলাদা সমাধান। তবে, আমাদের একদম নিজস্ব ডেটা প্রাইভেসীর জন্য প্রচুর কাজ হয়েছে অন্যান্য দেশে। কিছু কাজ হয়েছে আমার হাতে। এই ডেটাই দেবে আমাদের মুক্তি। ব্যক্তিগত ডেটাকে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত না করেই ব্যবহার করা যায় আমাদের অনেক ডেটা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহারের জন্য আমাদের প্রথম ৩ বছর (২০২২-২৪) দরকার পড়বে সরকারি-বেসরকারি ডেটাসেটগুলোকে সংযুক্ত করতে। এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। তবে, সেগুলোর সমাধান আছে সামনে।

যে ১০টি জিনিস পাণ্টে দিতে পারে বাংলাদেশকে (২০২২-২৪)

১. বাংলাদেশে ডেটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, তিন বছরের টাইমলাইন (২০২২-২৪)
২. ‘অ্যান্টিসিপেটরি গভর্নমেন্ট’ অর্থাৎ আগাম ধারণার প্রশাসন
৩. একীভূত শনাক্তকরণ ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশে ‘আইডেনটিফিকেশন’
৪. দেশের নীতিনির্ধারণী ড্যাশবোর্ড, প্রতিটি কাজের অগ্রগতি দেখার জায়গা
৫. সরকারি সার্ভিসগুলোকে সহজীকরণ
৬. ‘সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী’র সুবিধা বণ্টন ব্যবস্থাপনা
৭. রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির বণ্টন ব্যবস্থাপনা, ‘ঋণাত্মক আয়কর’ এবং ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়ের ধারণা
৮. বুদ্ধিমান আয়কর পদ্ধতির ভবিষ্যৎ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট’
৯. দেশীয় আইন/নীতিমালা/বিধি তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
১০. সরকারি ওপেন ডেটা শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম— তথ্যকে ‘অ্যাসেটে’র মতো ব্যবহার

১৬ কোটি মানুষের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা

বাংলাদেশ একটা বিশাল ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের ওপর বসে আছে, যেখানে জনসংখ্যা শুমারি বলছে ৬৬ শতাংশ জনবল কর্মক্ষম থাকবে ২০২০ থেকে। হিসেব বলছে, জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ ১৫ বছরেরও

কম এবং মাত্র ৮ শতাংশের বয়স ৬০-এর ওপরে। বিশ্লেষকেরা এই পরিস্থিতিতে দেশের উন্নয়নের জন্য একটি ভালো সুযোগ হিসেবে দেখছেন। এর পাশাপাশি সরকারকে এই সুযোগটিকে কাজে লাগানোর জন্য বলে আসছেন। এই ‘উইন্ডো’টা হারানো উচিত হবে না আমাদের। এই সুযোগটা সেরকম থাকবে না ১০-১৫ বছর^৩ পরে।

একটা মানুষকে ‘এনাবল’ করতে হবে তার স্বপ্নের কাছে যেতে

বুঝতেই পারছেন ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণ/তরুণীরা ‘অসম্ভব’ সম্ভাবনাময়। আমার হাতের ডেটা সেটাই বলছে। এই গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। তবে, এই অংশে বেকারত্ব বাড়ছে। যাদের সামর্থ্য আছে, তাদের অনেকেই দেশ ত্যাগ করছেন উন্নত এবং নিরাপদ জীবনের আশায়। তবে, তারা যাতে দেশে ফেরে— সেই নিরাপত্তাবলয় তৈরি করতে দরকার ডেটার ব্যবহার। নতুন কাজ তৈরিতে দরকার শিক্ষার কিছু পরিবর্তন, যেটা নিয়ে বিস্তর আলাপ করব সামনে। ব্যাপারটা এরকম যে রাষ্ট্রকে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে, যাতে জনগণ তার জীবনের সব চাওয়ার কাছাকাছি যেতে পারে। সেটার জন্য সেই মানুষটাকে ‘এনাবল’ করতে যা করা প্রয়োজন সেটা করবে রাষ্ট্র।

দক্ষতা এবং অটোমেশন

The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency.

—Bill Gates

এত বিশাল জনগণের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষাকে মেটাতে বর্তমান প্রশাসনিক প্রসেসে জটিলতা বেড়েই চলেছে। এত বড় জনগোষ্ঠীকে ‘সরকারি সার্ভিস ডেলিভারি’ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে অটোমেশনের বিকল্প নেই। অটোমেশনের শুরুরটা হবে একটা ‘ইউনিফাইড শনাক্তকরণ’ পদ্ধতিতে,

৩. আমার কাছে প্রচুর ডেটা থাকলেও সেটাকে ব্যবহার করছি না, যাতে গদ্যের ছন্দপতন না হয়।

যার অনেকটাই ঠিক হয়ে আসছে নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে।

জমি/সম্পত্তি কেনাবেচা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল সিম রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স/ব্যবসা আইডেনটিফিকেশন নম্বর, পাসপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে এই পরিচয়পত্র কিছুটা বাধ্যতামূলক হওয়ায় সার্ভিস ডেলিভারি অনেকটাই ঠিক হয়ে আসছে একটা সিস্টেম তৈরি হবার কারণে। যখন প্রতিটা নাগরিককে ঠিকমতো শনাক্ত করা যাবে, তখন তাদের সব ধরনের সার্ভিস নিশ্চিত করা সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, বর্তমান পৃথিবীর প্রসেস-ফ্লো প্রোডাকটিভিটির কথা চিন্তা করে সার্ভিস ডেলিভারিতে সময় অনেকখানি কমিয়ে আনা সম্ভব।

এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে সরকারি সার্ভিস ডেলিভারি ঠিকমতো দেবার জন্য মানুষের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নিতে হবে। যেই সার্ভিস ডেলিভারিতে আজ এক-দুই মাস লাগছে— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সেই সার্ভিস ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব কয়েক ঘণ্টায়। তবে পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় অর্থাৎ ফুল অটোমেশনে মাইগ্রেট করার আগে মানুষ এবং যন্ত্রের সহযোগিতায় সেই ব্যাপারটিকে কয়েক দিনে নামানো সম্ভব— যখন বর্তমান সরকারি সেবা সহজীকরণ পদ্ধতিতে যাব।

অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে মেলালে এত বড় বিশাল জনসংখ্যাকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য মানুষের সঙ্গে যন্ত্রকে সংযুক্ত করতে হবে। যখন পদ্ধতিগুলো পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় চলে যাবে, তখন অনেক কাজ ছাঁটাই হয়ে যাবে। এই অবস্থায় ছাঁটাইকৃত জনগণকে সেই দক্ষতার বিপরীতে ‘ডিউ-ডিলিজেন্স’ করে যত টাকা বেঁচে যাবে, সেই টাকা দিয়ে ‘ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম’ অর্থাৎ ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়’ পদ্ধতি চালু করা সম্ভব।

জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ঠিকমতো ‘ডেলিভারি’ অথবা ‘এনাবলার’ হিসেবে সরকারকে কাজ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পুরোনো মানসিকতার পরিবর্তন। শুধু মুখে ‘সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ’ ব্যাপারটা সত্যিকারের ইমপ্লিমেন্টেশন আসবে এই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে। যেখানে ‘ডিজিটাল সিগনেচার’ প্রযুক্তির আইন থাকলেও সেটার ব্যবহার প্রয়োগ করতে পারা যায়নি ‘কোভিড-১৯’ মহামারির সময়। ইলেকট্রনিক ট্রানজ্যাকশনে সেকেন্ডে কোটি টাকা ট্রান্সফার করা গেলেও আমরা বৃদ্ধভাতা/পেনশনের

কয়েকটা টাকা পাঠানোর জন্য মুখ লুকিয়েছি কাগজের ১২ স্তরের নথিতে। মানবিক দিক থেকেও দেখিনি প্রযুক্তিকে।

অথচ পাঠাও, বিকাশ, ভিসা, নগদের মতো ডিজিটাল টাকা ট্রান্সফারে আমরা বিশ্বাস করিনি। বর্তমানে পেনশনের সমস্যাটা আপডেট হয়েছে ইদানীং সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে। প্রযুক্তি সমস্যা নয়, সমস্যা মাইন্ডসেটে। সমস্যা দক্ষতায়। অফিসগুলোতে জনবলের সমস্যার কথা বলা হয় সার্ভিস ডেলিভারিতে। বরং চাহিদার তুলনায় জনবল বেশি এবং এনালগ প্রসেস থেকে ডিজিটাল প্রসেসে ঠিকমতো মাইগ্রেট করতে না পারায় জটিলতা বেড়েই চলেছে। জনবলের বাহুল্য বাড়িয়েছে ‘বায়াস’^৪, প্রসেসকে ধর্তব্যে আনিনি।

স্থানীয় সরকারের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ মানে ইন্টার-অ্যাকশন হচ্ছে কাজ ঠিকমতো ডেলিভারি হবার চাবিকাঠি। মজার কথা হচ্ছে অন্যান্য দেশের সরকারের ‘রিচ’ বাড়তে কমিয়ে এনেছে কাঠামোগত সরকারি অফিস। জনগণকে নিয়ে এসেছে মোবাইল অথবা ইন্টারনেটের সরকারি পোর্টালে। সবাইকে দিয়েছে একটা ইউনিক শনাক্তকরণ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সেই মানুষটা বলতে পারেন এই মানুষটা উনি নিজেই। জনগণ তাদের বিভিন্ন চাহিদা জানায় সিস্টেমকে। বাংলাদেশের এতো মানুষকে সার্ভিস দিতে গেলে লাগবে সঠিকভাবে ডিজাইন করা অটোমেশন। আর সে কারণে প্রয়োজন ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’, এবং এখনই। সেটা নাহলে আমাদের নির্ভর করতে হবে অন্য দেশের তৈরি ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’র সফটওয়্যারে।

‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ মানে মানুষ এবং মেশিনের মধ্যে ‘তথ্যাকথিত’ মুখোমুখি যুদ্ধ নয়, বরং এটা সমাজের একটা সক্ষমতা তৈরি করে দেবে, যেখানে প্রাচুর্যের পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসবে সবার মধ্যে। মানুষের নিরাপত্তা, সুশাসন, সুস্বাস্থ্য ও প্রাণোচ্ছল সমাজ তৈরির পেছনে এর অবদান শুরু হয়ে গেছে এই দশকে। সরাসরি বললে, স্থানীয় উৎপাদন এবং সেটার

৪. উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, ইন্টারনেটে মানুষের মুখ দিয়ে সার্চ করলে সাদা চামড়ার মুখ বেশি আসে। কারণ, এই ডেটা দিয়েই ট্রেনিং হয়েছে বেশি। কালো চামড়ার মানুষের চেহারা দিলে সেটা ঠিকমতো ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারে না। ফলে মেশিনের বায়াস হবার আশঙ্কা থাকে, বিশেষ করে একটা গোষ্ঠীর ডেটা কম থাকাতো। এ ধরনের ‘বায়াস’ নিয়ে পরবর্তী বইয়ে আলোচনা করব।

সাপ্লাই চেইন অর্থাৎ সরবরাহকে বাজারের অনুকূলে এনে এটিকে ব্যয়-প্রতিযোগিতামূলক (খরচ কমিয়ে) লেভেলে নিয়ে এসে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ সিস্টেমগুলো আমাদের আরও নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করে দেবে। মানুষের কায়িক/মানসিক পরিশ্রম চলে যাবে যন্ত্রের কাছে। এর পাশাপাশি দেশগুলোর বৃহত্তর জাতীয় সুরক্ষার সক্ষমতা বাড়াতে, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি এবং অর্থনৈতিক নিম্নমুখিতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এবং কার্যকর ‘রেজিলিয়েন্স’ মানে স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করে দেবে।

এই বই থেকে কী আশা করছি?

১. নীতিনির্ধারকদের জন্য সহজ ভাষায় ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ এবং ডেটার ধারণা, কেন প্রয়োজন, বিশেষ করে বাংলাদেশে? কীভাবে ‘ইমপ্লিমেন্ট’ করা সম্ভব? সেটার একটা প্রাথমিক ধারণা।
২. একটা তিন বছরের ব্লু-প্রিন্ট (২০২২-২৪), যা অনুসরণ করলে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সার্ভিস ডেলিভারির কাতারে আনা সম্ভব। আর এই ব্যাপারটার জন্য ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি আছে ইতিমধ্যেই, দরকার প্রয়োজনীয় ‘ইন্টিগ্রেশন’।
৩. বাংলাদেশের মতো এত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এত মানুষকে সেবা দিতে চাইলে সার্ভিস লেভেলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ ‘অটোমেশন’ ছাড়া গতি নেই। একেকটা সেবায় মাস চলে গেলে জনগণকে ‘এনাবল’ করা কষ্টকর। জনগণ অর্থাৎ সেবাগ্রহীতাদের সময় কমিয়ে আনতে পারলে তাদের জীবনকালে অনেক কিছুই করতে পারবেন তারা। সময় এখন একটা বড় মাইলস্টোন, জীবনে অনেক কিছু করতে চাইলে।
৪. দেশের জনগণ তার বাসায় বসে সরকারি/বেসরকারি সার্ভিসগুলোর ডেলিভারি পেতে পারেন ই-সার্ভিসের ভিত্তিতে। সেটার ভিত্তি হচ্ছে একটা ‘একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি’ এবং ডিজিটাল সিগনেচার (একটা নেটওয়ার্কে আমি যে আমি সেটা প্রমাণ করার জন্য)। সেটার আলাপ করা হয়েছে বিশদভাবে, ভেতরে। ‘এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস’ অথবা ‘ডেটাহাব’ নিয়ে কাজ করার আলোকে প্রতিটা সরকারি এবং বেসরকারি সার্ভিস কোম্পানিগুলোকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসার ধারণা আসবে এখানে।
৫. সরকারি সার্ভিসগুলোকে সহজীকরণে প্রসেস-ফ্লো সংকোচন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পারমিট, লাইসেন্স, অনাপত্তি পত্র প্রদানে ডেটার ব্যবহার। মানুষকে এই ধরনের ‘সিদ্ধান্তের লুপ’ থেকে বের করে আনার কর্মপন্থা।
৬. নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নীতিমালা তৈরিতে ডেটার ব্যবহার— জনবান্ধব নীতিমালা তৈরিতে কীভাবে যুক্ত করব জনগণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে?
৭. ডেটাভিত্তিক ড্যাশবোর্ড, নীতিনির্ধারকদের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের জন্য

সাহায্যকারী ‘পুরো দেশের একীভূত ড্যাশবোর্ড’ তৈরিতে আগাম ধারণার প্রশাসন। পাশাপাশি সব ধরনের প্ল্যানিং, যেমন ‘আরবান’, গৃহায়ণ প্ল্যানিং ইত্যাদির জন্য ড্যাশবোর্ড তৈরিতে ডেটা পাব কোথায়? নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে থাকা মানুষদের ঠিকমতো ‘ভিজুয়লাইজেশন’ তৈরী করে দেওয়া গেলে সম্ভব অনেক কিছুই।

৮. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর সুবিধা বণ্টন ফ্রেমওয়ার্কের আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুবিধা প্রদান। মানুষের স্পর্শ ছাড়াই ব্যাপারটা করা সম্ভব, তবে শেষ সিদ্ধান্ত নেবে কমিটি। ‘স্বণাতক আয়কর’, এবং সর্বজনীন ন্যূনতম আয়ের ব্যাপারে কার্যকরী ধারণা।
৯. অর্থনীতির জীবনীশক্তি কর ব্যবস্থাপনাকে ডেটা-নির্ভর না করলে বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত পৃথিবীর অনুপাতে সেই অনেক কমই থাকবে। কর বিভাগের সংস্কারের জন্য ডেটার ব্যবহার জরুরি। আয়কর ব্যবস্থাপনা হচ্ছে যেকোনো দেশের ‘লাইফলাইন’ অর্থাৎ জীবনীশক্তি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট’-এর জটিল ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দেওয়া যায় ডেটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর।
১০. উদীয়মান অর্থনীতিতে শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং কৃষি ভর্তুকি কীভাবে কোন খাতে এবং কোন নীতিমালায় যাচ্ছে সেই ভর্তুকির বণ্টন-ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করার ব্যাপারে ডেটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার। ভর্তুকির বণ্টন-ব্যবস্থার অটোমেশন এবং কত ভর্তুকির অনুপাতে কত অর্জন তার পাবলিক ড্যাশবোর্ড তৈরি।
১১. ‘অ্যান্টিসিপিটরি গভর্নমেন্ট’ অর্থাৎ আগাম ধারণার প্রশাসন, ডেটার ভবিষ্যৎ দেখার বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যবহার করে প্রশাসন জনগণের চাহিদা বুঝতে পারবে— সমস্যা হওয়ার আগেই। সেই প্রযুক্তিতে প্রতিদিন কত সমস্যার সমাধান হচ্ছে সেটা আসবে পাবলিক ড্যাশবোর্ডে।

আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট, ‘ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার’— ব্লকচেইন

জাতিসংঘের ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য’ অর্থাৎ ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল’ ১৬.৯ বলছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিনা খরচায় জন্মনিবন্ধকরণসহ বিশ্বের সব নাগরিকের জন্য ‘আইনি পরিচয়’ দিতে হবে। তাদের ভাষ্যমতে, ব্যক্তিগত শনাক্তকরণের অ্যাক্সেস সর্বজনীন হতে হবে। রাষ্ট্রের এই সুবিধা দেবার ব্যাপারে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ অর্থ হচ্ছে সবাই সমাজে অন্তর্ভুক্ত, কেউ পেছনে পড়ে নেই— তাদের সবাইকে একই সুবিধা দেওয়া হবে। এদিকে আমরা এগিয়ে আছি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিতে জনগণের ‘শনাক্তকরণ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

প্রতিটা মানুষের একটা নিজস্ব সত্তা, সবাই যে আলাদা, তাদের আলাদা পরিচয় আছে সেটার বড় পরিমাপ হচ্ছে এ ধরনের শনাক্তকরণ পদ্ধতি। একটা হিসেবে দেখা গেছে, নাগরিকরা তাদের পরিচয় প্রমাণ করতে পারলে, দেশের জনগণ ক্ষমতায়িত হয় এবং তাদের জীবনে উন্নতি আসে। আইডি একটি বৈধ অন্তর্ভুক্তিমূলক একটা কাজ এবং সমাজের বিভিন্ন পরিষেবাতে আরও ভালো ‘অ্যাক্সেস’ দিতে সক্ষম। নাগরিকরা যখন তাদেরকে সিস্টেমে শনাক্ত করাতে পারেন, সরকার তখন তাদের নীতিনির্ধারণী এবং উন্নয়নের অগ্রগতি পরিমাপ করতে একটা দক্ষ, নির্ভরযোগ্য এবং আসল ‘কানেক্টেড’ ডেটা তৈরি করতে পারে।

জনগণের ‘শনাক্তকরণ’ অর্থাৎ প্রতিটা নাগরিকের জন্য ‘আইনি পরিচয়’ ব্যাপারটি মানব বিকাশে জড়িত— বিশেষত দারিদ্র্য হ্রাস, সবাইকে শিক্ষানীতির ভেতরে আনা, সবার জন্য স্বাস্থ্য এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সবাইকে একই ধরনের রাষ্ট্রীয় সুবিধা (বিশেষ ভাতা, ভর্তুকি, পেনশন, বিদেশ যাওয়ার পাসপোর্ট, জননিরাপত্তা, ভোট দেবার অধিকার, ব্যবসার লাইসেন্স ইত্যাদি) দেবার ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখছে। ব্যাপারটা শুধু সরকারি সেবায় নয়, এই শনাক্তকরণ সুবিধা না থাকলে নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত, অনেক সময় অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে বাদ পড়ে যেতে পারেন। কারণ, তারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ঋণ নেওয়া, চাকরি পাওয়া, মোবাইল ফোন অথবা ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন করতে গিয়ে শনাক্তকরণ পদ্ধতি না দেখাতে পারলে সেটার সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

আগের সব ধারণাকে এক জায়গায় এনে— জনগণের দোরগোড়ায় সার্ভিস পৌঁছাতে গেলে সবচেয়ে প্রথমে যে জিনিসটি প্রয়োজন— জনগণের একটি একীভূত পরিচয় নিবন্ধন সার্ভিস অর্থাৎ ‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’^৫। জনগণ সঠিকভাবে সরকারি অথবা বেসরকারি সার্ভিসগুলো ঠিকমতো পাচ্ছে কি না এর পাশাপাশি তার নিরাপত্তা, তার নিজস্ব তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা সরকারের একটা বড় দায়িত্ব। সেখানে বাংলাদেশের ৫টি ডেটাসেট ব্যবহার করে একটি একীভূত শনাক্তকরণ

৫. পৃথিবীর অনেক দেশেই একীভূত শনাক্তকরণ সিস্টেম দেখে মনে হয়েছে যে ডিজিটাল সিগনেচার অংশকে কানেক্ট না করলে এর সুফল পাওয়া সম্ভব নয়।

পদ্ধতি তৈরি করার প্রস্তাবনা থাকবে ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার তৈরিতে, যা আসলে ব্লকচেইনভিত্তিক একটা একীভূত আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট।

শনাক্তকরণ পদ্ধতি কীভাবে এল?

In 1793, French mathematician and philosopher Nicolas de Condorcet laid the foundations of ‘social mathematics’. He studied the relationship between the individual and the collective to formalize the foundations of the democratic system.

He chose the mathematical term ‘Identity’ to represent the algebraic concept of equality among citizens in terms of their legal rights and obligations: one nation and multiple individuals who, by ‘identically’ accepting the rules of the community, attain the status of citizens.

আমাদের শনাক্তকরণ সিস্টেম অনেকগুলো এবং সব আলাদা করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে একটা ফাউন্ডেশন সিস্টেম লাগবে সবকিছুকে একীভূত করতে। আমার মতামত হচ্ছে, আমাদের অনেক শনাক্তকরণ পদ্ধতি থাকলেও সেটার একটা ফাউন্ডেশন আসতে পারে ‘জাতীয় পরিচয়পত্র’ থেকে। তবে সেটা আসতে পারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যানারে। সেই আলাপগুলো করেছি ভেতরে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী অর্থাৎ ‘সোশ্যাল সেফটি নেট’

একটা দেশের বয়স যখন বাড়তে থাকে, তখন সেই দেশটা আস্তে আস্তে জনকল্যাণমুখী কাজে মনোযোগ দেয়। এককথায় বলতে গেলে দেশটা তখন মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত হবার জন্য যেটা দরকার, সে ধরনের কৌশলপত্র তৈরি এবং সেটার বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে কাজ শুরু করে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান রাষ্ট্রের একটি আবশ্যকীয় কর্মসূচি। ১৯৭২ সালে যখন আমাদের সংবিধানের কার্যকারিতা শুরু হয়, তখনই ১৫-এর ঘ এ সামাজিক নিরাপত্তার (সোশ্যাল সিকিউরিটি) সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এটাকে বাজেটের সঙ্গে মেলালে সেটা ১৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ এবং জিডিপি ৩ দশমিক ০১ শতাংশ হয়। এই

টাকা সুবিধাভোগীদের কাছে কীভাবে পৌঁছাবে? এই বিশাল মহাযজ্ঞ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দরকার ডেটা এবং ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’র।

ভর্তুকি, ‘ঋণাত্মক আয়কর’ এবং সর্বজনীন ন্যূনতম আয়

ভোক্তাকে সরাসরি ভর্তুকি প্রদানের ধারণাটা নতুন নয়। উদাহরণ হিসেবে বলছি, যিনি বিদ্যুতের বিল ভর্তুকি পাবেন, তাকে শনাক্ত করে ভর্তুকি পৌঁছানোটা একটা বড় সমস্যা ছিল আগে। তবে এ ধরনের সমস্যাগুলোকে মিটিয়ে আসছে উন্নত দেশগুলো— বহু বছর ধরে। বিদ্যুৎ জেনারেশনে অর্থাৎ উৎপাদনে ভর্তুকি না দিয়ে যারা সত্যিকারের ভর্তুকি পাওয়ার যোগ্য, তাদের ঠিকমতো শনাক্ত করে ভর্তুকির প্রাপ্য টাকাটা তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া একটা দক্ষ পদ্ধতি। ভর্তুকি বণ্টন নীতিমালা এবং তার ব্যবস্থাপনা তৈরি সম্ভব ডেটার সাহায্যে।

সর্বজনীন ন্যূনতম আয়ের ব্যাপারটা আসবে এর সঙ্গেই। সেটা মেটানো সম্ভব একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি দিয়ে। এর পাশাপাশি, ‘ঋণাত্মক আয়কর’ ব্যাপারটা শুরু করা যেতে পারে, যার ফলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের নিচের উপার্জনকারীরা কর পরিশোধের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে জীবন নির্বাহ করার জন্য পরিপূরক খরচ পাবেন।

ওপেন ডেটা শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম— তথ্যকে ব্যবহার

সরকারের কাছে ডেটা এবং উদ্যোক্তাদের কাছে আছে আছে বুদ্ধি— এই দুটো মিলিয়ে চলছে পৃথিবী। শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ‘আবহাওয়া’ এবং ‘জিপিএস’ ডেটা উন্মুক্ত করে না দিলে আজ আবহাওয়া এবং নেভিগেশন ব্যবসায় এতো বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট এবং মানুষের জীবন এতোটা সহজ হতো না। আজকে সেই কারণে— যেকোনো উদ্যোক্তা সহজেই বানাতে পারছেন আবহাওয়া এবং নেভিগেশন সম্পর্কিত অ্যাপ্লিকেশন। ১৯৮৯ সালে ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন ‘ওয়াই-ফাই’ স্পেকট্রাম উন্মুক্ত করে না দিলে আজকে এই স্পেকট্রাম ঘিরে ট্রিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হতো না। স্পেকট্রাম জাতীয় সম্পদ হলেও সেটার কিছু অংশ বিনামূল্যে ব্যবহার করা হয়েছে সবার স্বার্থে।

এটা ঠিক যে— অনেক সময় সরকার ধারণা করতে পারে না, তার সম্পদ মানে ‘রিসোর্স’ কীভাবে সবচেয়ে ‘ভালো ব্যবহার’ অর্থাৎ ‘বেস্ট ইউটাইলাইজড’ হবে। সে কারণে বেশিরভাগ দেশে— অনেক সরকারি ডেটাকে ‘ওপেন ডেটা’ নীতিমালায় ফেলে বাধ্য করা হয় এজেন্সিগুলোকে, যাতে তারা ডেটাকে অন্য যেকোনো সম্পদের মতো ‘শেয়ার’ করে। শুরুতে নিজেদের মধ্যে। এ ছাড়া বেশিরভাগ সময় ডেটাকে উন্মুক্ত করে দিতে বলা হয় যাতে জনগণের জন্য উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনায় কাজে লাগে। সমাজের একটা সমস্যাকে মেটাতেই এই উদ্ভাবনা।

এর অর্থ হচ্ছে— অনেক সময়, সরকারকে আগ বাড়িয়ে নিজস্ব সম্পত্তিকে ঠিকমতো উন্মুক্ত করে দিলে তার মূল্যমানের হাজার গুণ ফেরত আসে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। সব ঘটনাই ইন্টার-কানেক্টেড। এখানেই দরকার ডেটা শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম, এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস, যাকে কিছুটা ‘জাতীয় ডেটাহাব’ বলা যেতে পারে। সেটা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে আমাদের দেশে। সেটার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাপ হবে ভেতরে। দেশের হাজারো ভিন্ন ধরনের ডেটাবেজ যাতে একসাথে কথা বলতে পারে, সেজন্য এই ব্যবস্থা।

‘অ্যান্টিসিপেটরি গভর্নমেন্ট’ অর্থাৎ আগাম ধারণার প্রশাসন

ডেটার ভবিষ্যৎ দেখার বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যবহার করে প্রশাসন একধরনের ‘অ্যান্টিসিপেটরি গভর্নমেন্ট’ অর্থাৎ আগাম ধারণার প্রশাসন তৈরি করতে পারে। মানুষ কালকে অর্থাৎ সামনের মাসগুলোতে যেই সমস্যাগুলোতে পড়তে পারে, সেটা যদি আগেভাগে সমাধান করা যায়, তাহলে কেমন হয়? সেই প্রশাসনকে মানুষ ভালো না বেসে যাবে কোথায়? ডেটাকে ঠিকভাবে অ্যানালাইসিস অর্থাৎ নিরীক্ষণ করলে সামনে কী ঘটতে পারে, সেটা নিয়ে কাজ করছে অনেক দেশের প্রশাসন।

সামনের ঘটনাকে আগে থেকে দেখা

এই বিষয়টা নিয়ে অনেক গবেষণা চালু আছে। তবে ২০০৬ সালে গড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস অ্যাকটিভিটি’র (আইআরপা) কাজগুলো অবিস্বাস্য ধরনের ‘ফিউচার-প্রফ’। মনে আছে ‘ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ এজেন্সি (ডারপা)–এর কথা, যারা ইন্টারনেট বানিয়েছিল? একে ‘আইআরপা’কে তৈরি করা হয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা অধিদপ্তরের সঙ্গে

করে। তাদের একটা প্রোথাম, ‘সেইজ’— ‘সিনারজিস্টিক অ্যান্ডিসিপেশন অব জিওপলিটিক্যাল ইভেন্টস’-এর কাজ হচ্ছে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোকে আগে থেকে প্রেডিক্ট করা, যাতে সেটাকে ঘটান আগেই আটকাতে পারে। যেমন, ৯/১১-এর মতো ঘটনা।

ব্যাপারটাকে ঠিকমতো বুঝতে অনেকগুলো কম্পিটিশন হয়েছে বাঘা বাঘা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে। সেটাকে তারা বলছে, ‘হাইব্রিড ফোরকাস্টিং কম্পিটিশন’। এই ফোরকাস্টিংয়ে মানুষও কাজ করবে সঙ্গে। সে ধরনের কাজ সম্ভব এখানেও। একটা লঞ্চ দুর্ঘটনা অথবা বন্যাকে এড়ানো গেলে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু আমরা কমাতে পারি। অথবা রিখটার ৬ স্কেলে কয়টা ভূমিকম্প হতে পারে সামনের মাসে? এটাকে ‘বেস্ট ইফোর্ট’ হিসেবে বলতে পারি, চেষ্টা করতে শুরু করা। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মডেলগুলো আরও ‘অ্যাকুরেসি’ পাবে।

মহামারি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার

এটা ঠিক যে, এই মহামারি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে দেশীয় রিসোর্সের ব্যবহার ‘অপটিমাইজেশনের’ ব্যাপারে। যখন মহামারি বাড়ছিল তখন জনগণ এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার এবং স্থানীয় সরকারের কাছে কিছু বিনিয়াদি মানে ‘ফান্ডামেন্টাল’ প্রশ্ন তুলেছিল। আমাদের কাছে কি প্রয়োজনীয় হাসপাতালের বেড আছে? দরকারি মেডিকেল সাপ্লাই এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয় জনবল এই মহামারিকে সাপোর্ট দিতে পারবে কি না? যেহেতু আমাদের দেশ খাদ্যশস্যের ব্যাপারে কিছু দেশের ওপর নির্ভরশীল, সে কারণে প্রশ্ন থাকতে পারে— আমাদের খাদ্যশস্য ফুরিয়ে যাবে কি না?

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো (ধরুন, পোশাকশিল্প) জিজ্ঞাসা করছিল, তারা তাদের কর্মচারীদের চাকরিতে রাখতে পারবে কি না? সরকার এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে কি না? এ ধরনের হাজারো প্রশ্নের মধ্যে সরকারকে নিজেকে চালানোর মতো যথেষ্ট রিসোর্স— যেমন পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন চালু রাখা, ট্রেন সার্ভিস, পোস্টাল সার্ভিস চালু রাখার পাশাপাশি খাদ্যশস্যের সাপ্লাই চেইন ঠিকমতো কাজ করছে কি না তার ওপর নজরদারি রাখা, বর্জ্য ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে স্কুলগুলো কখন খোলা ঠিক হবে, সেগুলো নিয়ে সুচারুভাবে কাজ করতে গেলে শুরুতেই দরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

কোভিড-১৯-এর সময় প্রতিটা সরকারের দক্ষতার একটা পরীক্ষা দেখেছি বিভিন্ন সেক্টরে। আমাদের দেশে অনেক সেক্টরে ঠিক সেরকম ‘পারফর্ম’ করতে না পারলেও ডেটার ক্ষমতা দেখেছি নিজের চোখে। সরকারি/বেসরকারি অনেক সংস্থার ডেটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম, ডেটার ‘ইন্টিগ্রিটি’র কতটা দরকার। গার্বের্জ ইন, গার্বের্জ আউট। আমাদের সিস্টেম ধরে ডেটার ভুল ঠিক করে এগোনো কষ্টকর। এই সময়ে অল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদ দিয়েই কাজ ডেলিভারি করতে হয়েছে আমাদের। আমাদের মতো দেশে ‘কন্সট্রাক্ট ট্রেসিং’/হাসপাতালের ‘অকুপ্যান্সি’ অ্যাপ্লিকেশন কতটুকু কাজ করবে সেটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে, সেটা একটা হিমবাহের অগ্রভাগ মাত্র। এই সময়টাতে ডেটার কথা বলার ধরন দেখে আমি অবাক হয়েছি বটে!

বুদ্ধিমান আয়কর পদ্ধতি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ম্যানেজমেন্ট

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ছে সময়ের সঙ্গে। পেছনের কিছু ডেটা দেখি। আমাদের ২০০১-১০ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.৬% থেকে বেড়ে ২০১১-১৯ সালে এসে দাঁড়ায় ৬.৯%, যা আশপাশের অনেক দেশের থেকে ভালো। এর মধ্যে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ২০১১-১৯ সময়কালে বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধিতে দারিদ্র্য ৪৮.৯% থেকে কমে ২০.৫%-এ দাঁড়ায়। এর পাশাপাশি চরম দারিদ্র্য ৩৪.৩% থেকে কমেছে ১০.৫ শতাংশে।

তবে যেটা বোঝা গেছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত এবং দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রয়োজন দেশের ভেতর থেকে। দেশের এই সীমিত আয় (বিশেষত, প্রত্যক্ষ কর থেকে) নিজেদের অবকাঠামো তৈরি এবং সামাজিক খাতের জন্য যৎপরনাস্তি অর্থাৎ ‘যারপরনাই’ অপরিপূর্ণ। আপনি জেনে অবাক হবেন, আমাদের যত টাকা কর আদায় হয়, যা জিডিপির ৯%-এর চেয়ে কম (আয়করের ২%), যা বিশ্বের সর্বনিম্নতমের মধ্যে একটি।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ‘এপিআই’ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি তাদের ডেটার ওপর নির্ভরতা। তবে, বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশের ওপর ‘স্ট্রেনদেনিং দা পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম টু এনাবল সার্ভিস ডেলিভারি’র ওপর ডকুমেন্টগুলো পড়তে গিয়ে এই সার্ভিস

ডেলিভারি নিয়ে অনেক ধারণা হয়েছে। এর পাশাপাশি কথা হয়েছে অনেকের সাথে। কাজের ঝামেলা এড়াতে অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের অর্থের হিসেবের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাতে পারে। এ ছাড়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে (ক) আর্থিক অপরাধ রোধ [মানি লন্ডারিং ইত্যাদি] ও দুর্নীতির পূর্বাভাস (খ) সরকারি কেনাকাটায় টাকা সাশ্রয় (গ) সরকারি ব্যয় হ্রাস করার সুযোগগুলো চিহ্নিত করে নীতিনির্ধারকদের জানানো এবং (ঘ) পাবলিক সেক্টরের অডিট অর্থাৎ নিরীক্ষণের জন্য অসংগতিগুলো শনাক্ত করা এখন সময়ের ব্যাপার।

সরকারি কেনাকাটা

AI has the potential to not only streamline procurement processes, but to transform them – saving time and money.

—How AI can help governments manage their money better, Ernst & Young Global Limited

এ অবস্থায় আমাদের দরকার একটি দক্ষ, মানুষের মতো বুদ্ধিমান, ‘প্রসেস ড্রিভেন’ এবং স্বচ্ছ ‘পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট’ এবং করব্যবস্থা, যা সামগ্রিক প্রশাসনের জবাবদিহির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সংস্থান অর্থাৎ ‘রিসোর্স মোবাইলাইজেশন’ সহায়তা করতে পারবে। এখানে সরকারের ‘পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট’ এবং আয়কর সংস্থার কাজ নিয়ে আলোচনা করব।

আইন, নীতিমালা, বিধি তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

প্রশাসনের পক্ষে হঠাৎ করে একটা নীতিমালা তৈরি করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। বর্তমানে যে ধরনের নীতিমালাগুলো তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে ডেটা থেকে ইনপুট না নিলে সে ধরনের নীতিমালাটি শুরু থেকেই সমস্যায় পড়তে পারে। সে কারণে বহুল প্রচলিত নীতিমালা তৈরির যে ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, যেমন পলিসি সাইকেল, সেগুলো পুরোটাই ডেটা-নির্ভর। একটা নীতিমালা তৈরি করার পরে সেটা বাস্তবে ঠিকমতো কাজ করবে কি না, এই ধরনের সিমুলেশন করার জন্য প্রয়োজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

আমার বিটিআরসি'এর ৭ বছরের অভিজ্ঞতায় টেলিযোগাযোগ বাজার নিয়ে কাজ করার সময় দরকারি নীতিমালা, বিধি এবং পরিচালনসংক্রান্ত নির্দেশনা তৈরি করতে গিয়ে রাষ্ট্রপক্ষ, গ্রাহকস্বার্থ এবং পুরো বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ বাজারে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ভূমি বজায় রাখার জন্য ডেটার ক্ষমতা দেখেছি। সরকার যেখানে একাধারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার 'নিয়ন্ত্রক' এবং ব্যবহারকারী, সেখানে এর জন্য একটা 'বাস্তব' নীতিমালা জরুরি।

কেন মানুষ বুদ্ধিমান যন্ত্র চায়?

শত বছর ধরে 'ইন্টেলিজেন্ট' মেশিনের খোঁজে মানুষের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা দেখছি অনেক কিছু। আয়রনম্যানের জার্ডিস, টার্মিনেটর, নাইট রাইডারের 'কিট' পার্সোনালিটিগুলোর প্রতি আমাদের ব্যাকুলতা অথবা উৎসুক ভাব একটা 'পাওয়ারফুল' আইডিয়া। যন্ত্র মানুষের মতো চিন্তা করতে পারছে কি পারছে না অথবা চিন্তা করতে পারার মতো যন্ত্র তৈরি হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে মানুষ হাল ছাড়ছে না এই 'আইডিয়া' থেকে।

'স্পেশালাইজড' কাজে যন্ত্র সেরা

সামনে বড় বড় সমস্যা সমাধানে যেমন রোগ নিরাময়ে, ডিএনএ সিকোয়েন্সিংয়ে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, গ্যালাক্সি জয়ে আমাদের পাশে দরকার ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেমগুলো। মানুষের দরকার নিজের প্রয়োজনে। চিন্তা করুন, পুরো পৃথিবীর বিজনেস ট্রানজাকশনগুলোর বেশির ভাগ চলছে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। গত বছরের আগের বছরে আলি এক্সপ্রেসের ১১:১১ ফেস্টিভ্যালের প্রথম ৬৮ সেকেন্ডে বিক্রি হয়েছে ১ বিলিয়ন ডলার। পরের হিসেব ইতিহাস। এর মানে হচ্ছে, এত ক্রেডিট কার্ড ডেটা প্রসেসিং করে 'ফ্রড ডিটেকশন' সম্ভব নয় হাজারো মানুষের পক্ষে। সাহায্য নিতে হবে ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেমের।

বাংলাদেশ প্রস্তুতবনা, কোথায় যাব আমরা?

পুরো বই ধরে ডেটা এবং নতুন এক প্রযুক্তিকে কীভাবে আমাদের দেশের সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সব সার্ভিস ডেলিভারিকে দক্ষতার সঙ্গে

ইন্টিগ্রেশন করা যায়, সেগুলো নিয়ে আলাপ করব। এভাবে সামনের ২০ বছরের ডেভেলপমেন্ট কাজ ডেলিভারি করা যাবে সামনের ৩ (২০২২-২৪) বছরে। বইয়ের পৃষ্ঠার সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে শুধু ১. বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ২. ডেটা থেকে নীতিমালা তৈরি ৩. জুতসই শনাক্তকরণ সিস্টেম, ৪. দেশের নীতিনির্ধারণী ড্যাশবোর্ড, ৫. আগাম ধারণার প্রশাসন, ৬. সরকারি সার্ভিসগুলোকে সহজীকরণ, ৭. ভর্তুকির বণ্টনব্যবস্থা, ৮. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর সুবিধা বণ্টনব্যবস্থা ৯. বুদ্ধিমান আয়কর ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করব ভেতরে। সাইডলাইন হিসেবে সরকারের এজেন্সি স্পেসিফিক ড্যাশবোর্ড, ডেটা দিয়ে ‘আরবান’ প্ল্যানিং এবং টাকা খরচের ড্যাশবোর্ড নিয়ে আসব কিছু কিছু অংশে। ‘কী আশা করছি এই বই থেকে’ সেই অংশে ১০. ‘এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস’ অথবা ‘ডেটাহাব’ নিয়ে সংস্থাগুলোর ভেতরে আন্তঃসংযোগের কাজ করার ‘ইউনিফিকেশন’ করার জন্য দরকার প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ। ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ একটা দরকারি কম্পোনেন্ট হবে ‘ভবিষ্যৎ’ প্রেডিকশনে। নীতিমালা তৈরিতেও আসবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

আগামী বইয়ে আসব আমার প্রিয় তিনটি বিষয় নিয়ে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে (ক) বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিযোজিত শিক্ষাব্যবস্থা (খ) বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার সংস্কার, মানবিক বিচারব্যবস্থা এবং (গ) বাংলাদেশের স্বাস্থ্য (সবার জন্য স্বাস্থ্য) ব্যবস্থাপনা যুক্ত হবে ভবিষ্যৎ সিরিজে।

খেয়াল করুন

এই বইয়ে ব্যবহৃত সব তথ্য পাবলিক ডোমেইন থেকে নেওয়া। কোনো স্পর্শকাতর তথ্য নেই এখানে। নিজে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হিসেবে বর্তমান সিস্টেমের সমালোচনা না করে কীভাবে ডেটা থেকে ইনপুট নিয়ে একটা একীভূত সিস্টেম তৈরি করা যায়, সেটার আলাপ করছি এখানে। এখানে সরকার অর্থাৎ পৃথিবীর সামগ্রিক সরকারগুলোর সমস্যা নিয়েই আলাপ করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় বাংলাদেশ এসেছে একেকটা সিস্টেম ধরে।

‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ নিয়ে বাংলায় এ পর্যন্ত যা কাজ করেছে, সেটার একটা বুকমার্ক সাইট পাবেন এখানে, যা আসলে <https://aiwithr.github.io/>। এর পাশাপাশি, হাজারো প্রশ্নের উত্তর পাবেন এখানে। বইটার ব্যাপারে মতামত জানাতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ (+8801713095767) নম্বরে।

কৃতজ্ঞতা এবং বাড়তি রিডিং

বই, কোর্সওয়ার্ক, ফ্রেমওয়ার্ক এবং সহকর্মীদের ইনপুট

Books say: She did this because. Life says: She did this. Books are where things are explained to you; life is where things aren't. I'm not surprised some people prefer books.

—Julian Barnes

অসাধারণ কিছু রিসোর্স

সময় পেলেই প্রচুর বই পড়া হয় আমার। এই বই লিখতে গিয়ে নয় বরং ‘এ আই’ ফর সোশ্যাল গুড অর্থাৎ জনস্বার্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যাপারটা নিয়ে মোবাইল অপারেটরদের বেশ কিছু অসাধারণ প্রজেক্ট দেখে জিনিসটা নিয়ে পড়া শুরু করি কয়েক বছর আগে। মানুষের কল্যাণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে ব্যবহার করা যাবে, সেটা নিয়ে ভেতরে-ভেতরে অনেক গবেষণা হচ্ছে ‘এনলাইটেড’ ইকোনমিগুলোতে। আমার ধারণা, সামনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হবে সামাজিক অসংগতি থেকে বের হওয়ার একটা বিশাল টুল। এর মধ্যে চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই। সেজন্যই তো গবেষণা। এর অন্তর্দৃষ্টির জন্য আমি কৃতজ্ঞ ‘জিএসএম অ্যাসোসিয়েশন’র কাছে।

রিবুটিং ইন্ডিয়া, রিয়ালাইজিং এ বিলিয়ন অ্যাসপিরেশন্স

যে একটা বই পড়ে আমার মনে হয়েছে, একটা মানবিক রাষ্ট্র হবার জন্য ডেটার সুফল পেতে যুক্ত হতে হবে সব জায়গায়। সিস্টেমের ভেতরে আপনাকে চিনতে পারলে সরকারের সার্ভিস ডেলিভারি আমাদের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব। এই বইটা ৬ বছর আগে পড়তে দিয়েছিলেন

মুস্তাফা মাহমুদ হুসাইন। এই বইটা পড়তে গিয়ে অনেকবারই শরীরের রোম দাঁড়িয়ে গেছে উত্তেজনায়।

অক্সফোর্ডের একটা অনলাইন কোর্সওয়ার্ক

আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী দেখিয়েছিলেন তার অক্সফোর্ডের প্রেস্টিজিয়াস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রামের সব কোর্সওয়ার্কগুলোকে। আমার সঙ্গে শেয়ার করেছেন তার কিছু নোট। সেখান থেকেও ধারণা পেয়েছি কী ঘটছে পৃথিবীজুড়ে, বিশেষ করে সব শিক্ষার্থীদের থেকে— যারা এসেছেন পুরো পৃথিবী থেকে। বলেছেন কী ঘটছে তাদের দেশে। ধন্যবাদ শারুন চৌধুরীকে।

গত ১০ বছরে প্রায় ৫০০-এর বেশি ডকুমেন্ট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি এর মধ্যে। সেগুলোকে নিয়ে আসব একটা একটা করে। ধাপে ধাপে। পরের বইয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক নীতিমালা নিয়ে ইনপুট দিয়ে সাহায্য করেছেন জনাব কাজী জামান।

সিঙ্গাপুরের মডেল এআই গভর্ন্যান্স ফ্রেমওয়ার্ক

রেগুলেটরি গভর্ন্যান্স নিয়ে আমি একটা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম সিঙ্গাপুরের ইনফোকম ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাছে। সে কারণে ওদের এআই গভর্ন্যান্স ফ্রেমওয়ার্ক মডেল নিয়ে খুব আগ্রহী ছিলাম। তাদের ফ্রেমওয়ার্ক আমাকে সাহায্য করেছে নতুনভাবে চিন্তা করতে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা/ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্মের বন্ধুগণ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে থাকার সময় আইটিইউ/এপিটি/সিটিও/গুগল/ফেসবুক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বাংলাদেশ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে অনেক সাহায্য পেয়েছি দেশ চালানোর ‘অপটিমাল’ প্রসেস নিয়ে। সংস্থাগুলোর ইলেকট্রনিক লাইব্রেরিগুলোর হাজারো ডকুমেন্টেশন অ্যাক্সেস শিখিয়েছে অনেক কিছু।

মোবাইল অপারেটরদের গ্রুপের ডকুমেন্টেশন

‘এআই ফর সোশ্যাল গুড’ একটা ভালো স্টার্টিং পয়েন্ট। সমগ্র পৃথিবীর মোবাইল এবং ডেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাতে গিয়ে স্থানভিত্তিক হাজারো জ্ঞান আছে তাদের কাছে। তাদের ইনপুট ভালো কাজে লেগেছে ডিজিটাল ইকোনমির ব্যাপারে।

সরকারি/বেসরকারি অনেক সংস্থার সহকর্মীদের ইনপুট

তিনি ‘ডেটা ড্রিভেন’ সংস্থাতে কাজ করতে গিয়ে পরিচয় ঘটেছে অনেকের সঙ্গে, কাজের সুবাদে। সংস্থাগুলোর সঙ্গে ‘ইন্টারকানেকশন’ করতে গিয়ে শেখা হয়েছে অনেক। বিশেষ করে ‘এপিআই’ ডকুমেন্টেশন হালনাগাদ করতে গিয়ে। জাতীয় পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে পাসপোর্ট, বিআরটিএ, জন্মনিবন্ধন, শিক্ষা বোর্ড, এনবিআর থেকে শুরু করে অনেক সরকারি সংস্থার পাশাপাশি মোবাইল অপারেটর, বিকাশ (এমএফএস), আইএসপি, সাবমেরিন কোম্পানি, ব্রডব্যান্ড, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অপারেটর সবাই সাহায্য করেছেন ইনপুট দিয়ে। অসাধারণ একটা যাত্রা ছিল সেটা।

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অসংখ্য ডকুমেন্ট

‘সরকারি সেবা সহজীকরণ’ নিয়ে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনলাইন ডকুমেন্টেশন থেকে। এ ছাড়া এই কাজে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি সরকারি সব সংস্থা থেকে। এর ভেতরে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারে চাকরির লম্বা সময়টা। ডেটা সেন্ট্রিক কাজে।

কিছু রিসোর্স

- Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), Stuart Russell, Peter Norvig
- An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think? by Richard Ernest Bellman
- AI in the UK: ready, willing and able— UK Parliament (publications)
- AI readiness for government, Are you ready for AI? –Deloitte

Insights

- Crafting an AI strategy for government leaders, Does your agency have a holistic AI strategy? –Deloitte Insights
- Using AI to unleash the power of unstructured government data, Applications and examples of natural language processing (NLP) across government–
- How artificial intelligence could transform government, Cognitive technologies have the potential to revolutionize the public sector– and save billions of dollars
- AI-augmented government, Climbing the AI maturity curve
- Benefits of linking civil registration and vital statistics with identity management systems for measuring and achieving Sustainable Development Goal 3 indicators– US National Library of Medicine National Institutes of Health
- Legal identity: A proxy for inclusion: Aug 2020, Thales Group
- Artificial Intelligence– Entering the world of tax– Deloitte
- How tax is leveraging AI– Including machine learning– PwC
- Study: Artificial Intelligence within taxation– WTS Global
- Artificial intelligence in taxation, A case study on the use of AI in government, BCG
- How AI can help governments manage their money better, Ernst & Young Global Limited
- Driving impact at scale from automation and AI, McKinsey & Company
- Visualizations That Really Work, Scott Berinato, HBR
- Finding a more human government, Centre for Public Impact, BCG Foundation
- Where Artificial Intelligence Meets Urban Planning, University of Central Florida
- Is the Private Sector more Efficient?– UNDP
- How Do You Build Effective Public-Private Partnerships? Yale Insights
- What skills does a ‘smaller’ government need? The Conversation
- No longer science fiction, AI and robotics are transforming

healthcare, PwC network

- Four approaches to anticipatory climate governance: Different conceptions of the future and implications for the present, Wiley Online Library
- How much time and money can AI save government? Deloitte Insights
- Portugal – The World’s first National Participatory Budget, Politics Reinvented
- National Strategies and Policies for Digital Identity Management in OECD Countries– OECD Papers No. 177
- Federal Agencies Must Be ‘Better Connected, More Collaborative’, Government Executive
- Predictive policing, Wikipedia
- Crime Prediction and Prevention, Public Safety and Policing, IBM
- The Basics Of A Good Local Government Dashboard, ClearPoint Strategy
- Use of Dashboards in Government, Fostering Transparency and Democracy Series

Change by Design, Tim Brown

- Embracing Innovation in Government Global Trends, OECD Docket
- Artificial Intelligence—Entering the world of tax, Deloitte Insight
- Can AI Close the Learning Gap of Indian Education System?, August 20, All Things Talent
- AI-powered LMS (Learning Management System), Softengi
- Let’s Talk About Adaptive Learning, Smart Sparrow, Pty Ltd
- Tracking (education), Wikipedia
- Rewiring Education: How Technology Can Unlock Every Student’s Potential, John D. Couch

এবং আরও অনেক ডেটা।

কেন বইটা লিখতে চাইলাম?

কেন এলাম পৃথিবীতে?

The two most important days of your life are the day that you're born and the day that you find out why.

—Mark Twain

লিখছি দায়বদ্ধতা থেকে। এই রাষ্ট্র দিয়েছে অনেক আমাকে। চেষ্টা করেছি নীতিনির্ধারণীতে অনেক ইনপুট দিতে, ভেটা থেকে। যা থেকে ‘ইনফর্মড ডিসিশন’ নিতে পারে রাষ্ট্র। সেগুলোর অনেক ফলাফল আছে চোখের সামনে। তবে, সরকারি সিস্টেম থেকে বের হয়ে যাব এই বছর। সে কারণে এই লেখালেখি, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ, অসাধারণ একটা সময় কেটেছে এই ৩০ বছর। সৃষ্টিকর্তা চাইলে সামনে লিখব আরও।

চিন্তা করতে শেখা, রাস্তায় নামলেই হাজার চিন্তা

সমস্যাটার শুরু প্রায় তিন দশক আগে। ছোট্টাছুটির চাকরি। আজ এখানে তো কাল ওখানে। শেষমেশ ‘পিস কিপার’ হিসেবে পোস্টিং হলো কঙ্গোতে। এরপর আইভরি কোস্টে। ঘোরাঘুরিই বেশি। ঘূমের সময় ছাড়া বাকিটা হিসেব করলে— পুরোটাই রাস্তায়। নিজ দায়িত্বের এলাকা, যাকে বলে ‘এরিয়া অব রেসপনসিবিলিটি’— ইঞ্চি ইঞ্চি করে না জানলে বিপদ। মানুষের জীবন বলে কথা! পুরো এলাকা থাকতে হবে নিজের নখদর্পণে। কনস্ট্যান্ট ভিজিলান্স। পায়ে হাঁটা অথবা গাড়ি— পায়ের মাইলোমিটারে লাখ মাইল পার হয়েছে নিশ্চিত। হেলিকপ্টারে উঠতে উঠতে থিতু হয়ে

এসেছিল ওই জীবন। এক সময় হেলিকপ্টার এবং রাস্তায় নামা একই মনে হতো।

রাস্তায় নামলেই হাজার চিন্তা কিলবিল করে মাথায়। একটা এদিকে হলে আরেকটা ওদিকে। মাথা-মুড়ু ছাড়া চিন্তাভাবনা। দিন কয়েক পর বেস ক্যাম্পে ফিরলে বসতাম ‘ইউএন’-এর কচ্ছপ গতির ইন্টারনেট নিয়ে। সভ্যতার সঙ্গে একমাত্র ‘ব্যাণ্ডওয়ার্ড লিংকেজ’- ওই স্যাটেলাইট লিংক। একসময়, প্লট করতে শুরু করলাম চিন্তাগুলোকে। ‘চ্যানেলাইজ’ করতে তো হবে কোথাও। একেকটা চিন্তা একেকটা ডট। কানেক্টিং দ্য ডট’স ব্যাপারটা বুঝলাম অনেক পরে। চল্লিশের আগে নাকি ব্যাপারটা আসে না মাথায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেলিকমিউনিকেশন ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি

২০০১-০২ সালের কথা। গিয়েছিলাম ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি দিয়ে ঠাসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিগন্যাল স্কুলে। থাকতে হয়েছিল লম্বা সময়ের জন্য। প্রায় ৯০ বর্গমাইলের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেলিকমিউনিকেশন ট্রেনিং^৬ ফ্যাসিলিটি। অগাস্টা, জায়গাটাও জর্জিয়ার একটা অজপাড়াগাঁয়ে। সন্ধ্যার পর কুপি জ্বলার মতো অবস্থা। ‘ক্লাবিং’ পছন্দ না বলে স্কুল-লাইব্রেরি থেকে ফিরে কাজ না পেয়ে হাত দিলাম রান্নায়। কাঁহাতক আর খাওয়া যায় ফাস্ট ফুড! ‘পিএক্স’ (মিলিটারি কেনাকাটার জায়গা) থেকে এটা কিনি, ওটা কিনি। বাসায় এসে ভয়াবহ ধরনের ‘টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়াল’। অসুবিধা কী? গিনিপিগ তো নিজে। তবে, ক্ষান্ত দিলাম স্মোক ডিটেঙ্টরের পানির ঝাপটা খেয়ে। বারকয়েক। তবে, একেবারে ক্ষান্ত নয়, কমিয়ে দিলাম গতি। মনোযোগ সরালাম নতুন দিকে।

লেখার প্রেরণা, লিখতে হবে ১০ লাখ শব্দ

বিশাল লাইব্রেরি। হাজারও মাইক্রোফিস। এটা-ওটা ইস্যু করি, টাইম লিমিটও অসহনীয় লম্বা। পুরোনো পত্রিকা, দুস্প্রাপ্য বই সব মাইক্রোফিশে। একদম নতুন বই লাইব্রেরিতে না থাকলেও সেটা কিনে এনে চেকআউট করিয়ে রাখতেন লাইব্রেরিয়ান। আমাজনের বেসটসেলার লিস্ট দেখা

৬. অগাস্টা খুব নামকরা মেডিকেল সেন্টারগুলোর জন্য। পাশাপাশি বায়োটেকনোলজি এবং সাইবার সিকিউরিটির মক্কা। নতুন ‘ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারস’ হয়েছে এই অগাস্টাতে।

অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল ওই সময়ে। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম ‘বেস্টসেলার’গুলো লিখছেন আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষ। মানে, পেশাদার লেখক নন তারা। সাহস পেলাম। যা-ই লিখি, পাঠক পেতেই হবে বলেছে কে? মনের খোরাক মেটানোর জন্য লেখা। ওই বিরানব্বই থেকে। সেথ গোডিংয়ের গলা শুনি প্রায়ই। শিপ, বাড়ি! শিপ! লিখেছি লাখ লাখ শব্দ। এখন কানেন্ট করতে পারছি অনেক কিছুই। আসার সময় প্রচুর বই, ম্যাগাজিন দিয়ে দিয়েছিলেন লাইব্রেরিয়ান। ২০০ কেজি লিমিট কম নয়।

স্ট্যান্ডিং অন দ্য শোল্ডার’স অব জায়ান্ট

ওই বই পড়তে গিয়ে দেখা গেল সেই ‘বেস্টসেলার’দের কেউ ছিলেন স্টক এক্সচেঞ্জের হর্তাকর্তা, কেউ সিআইয়ের চিফ। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার। সরকারি কর্মকর্তা। নেভি সিল। ফুটবল কোচ। জিমন্যাস্ট। তারা লিখছেন পেছনের অনেক বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে। ব্যর্থতা থেকে সফলতার গল্প, যা আসলে সাহায্য করছে ওই পড়ুয়া মানুষদের। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে। বিতর্কিত জিনিস নিয়ে যে লেখা হয়নি তা নয়। লিখেছেন রেচেল মোরানের মতো পেশাজীবীরা। মানে, লেখা হয়েছে প্রায় সব বিষয় নিয়ে।

সেই লেখাগুলো থেকে বের হয়ে এসেছে অনেক সমস্যার কথা। সেই ভুল থেকেও শিখছে দেশ। সমালোচনা নিতে পারার মানসিকতার দেশগুলো ওপরে উঠছে দ্রুত। আবার লিখছেন জাতির পিতারা। আজকের ‘আধুনিক’ সিঙ্গাপুরের পেছনে যিনি ছিলেন তারও বই আছে কয়েকটা। নেলসন ম্যান্ডেলার বইটা পড়েছেন নিশ্চয়। ২৭ বছরের অবিচারের ঘণ্টাটা মুহূর্তে গিলে ফেলার ঘটনাটা অজানাই থাকত বইটা না পড়লে। পড়ছি সবই, বুঝতে পারছি ভালো-মন্দ। মন্দটা ফেলে ভালো নিয়ে এগোচ্ছি সবাই আমরা, সময়ের বিবর্তনে। অন্যের কাছ থেকে শিখে। পেছনে লেগে নয়।

শুরু হলো আমার লেখা, দায়বদ্ধতা থেকে। সেনাবাহিনী, বিটিআরসি এবং এনটিএমসির ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা মাথায় নিয়ে ঘোরার অন্তর্জালা থেকে মুক্তি পেতে এ ব্যবস্থা। নোটবই সেনাবাহিনীতে পোশাকের অঙ্গ হবার ফলে মিস করিনি খুব একটা। জিম রনের অমোঘ ‘নেভার ট্রাস্ট ইয়োর মেমরি’ বাণীটা খুব একটা বিচ্যুতি আনতে পারেনি ‘নোট টেকিং’য়ে।

এখন যুগ হচ্ছে ‘গুগল কিপ’ আর ‘এভারনোটের’। হাতির স্মৃতি বলে কথা- মাটিতে পড়ে না কিছুই। দেশ-বিদেশের ফোরাম, যেখানে গিয়েছি বা যাইনি- হাজির করেছি তথ্য। টুকেছি সময় পেলেই। ভরে যাচ্ছিল নোটবই। পয়েন্ট আকারে। প্রোগ্রামিংয়ের মতো পয়েন্টারগুলো লিংক করা ছিল মাথায়। ভুলে যাওয়ার আগেই বইগুলোর ব্যবস্থা। আমাদের কিছু সমস্যার সমাধান নিয়ে। সিস্টেমকে কঠাঙ্ক করে নয়। বরং সিস্টেমের মধ্যে থেকে। বিশেষ করে, কীভাবে আমরা শুধরাতে পারি অন্য দেশগুলো যেই ভুলগুলো করেছে শুরুতে। তখন নজর দিলাম কীভাবে শিখেছে উন্নত ইকোনমিগুলো? তাদের রহস্যগুলো জানতে চাইলাম বন্ধুদের কাছ থেকে।

কয়েকটা জেদি মানুষের কাজ

আরেকটা সমস্যা তড়িয়ে বেড়াচ্ছে আমাকে- ওই ছোটবেলা থেকে। কোনো জিনিস ধরলে সেটার শেষ না দেখলে ঘুম আসে না আমার। বিশাল বিপদ। আগে ভাবতাম সমস্যাটা আমার একার। ভুল ভাঙল দুনিয়া দেখতে দেখতে। ইন্ডাস্ট্রিতে একই অবস্থা। একেকটা রিসার্চ, সফল না হওয়া পর্যন্ত পড়ে আছে মাটি কামড়ে। মনে আছে, হেনরি ফোর্ডের ডি-৮ সিলিন্ডার তৈরির কথা? এই কৌশল ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি, অ্যারোস্পেস, নাসা, ওষুধ গবেষণাসহ প্রচুর স্পেশলাইজড প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার হচ্ছে।

গত দশকের এয়ারবাস এ-৩৮০, দোতলা উড়োজাহাজ এত সহজে আসেনি। উনিশ শ অষ্টাশির গবেষণার ফল পাওয়া গেছে এপ্রিল দুই হাজার পাঁচে, উড়োজাহাজটাকে উড়িয়ে। এরপরও আরও দুই বছরের বেশি হাজার হাজার ‘সেফটি টেস্ট’ আর অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রথম বাণিজ্যিক ফ্লাইট চালায় সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস। অন্য কিছু নয়, ওড়াতেই হবে- তাই উড়েছে উডুকুটা। কেউ জেদ ধরেছিল, আট দশ ফ্লাইটের তেল দিতে পারব না। এক ফ্লাইটেএর তেল নাও, নইলে অন্য ব্যবসা দেখো। বোয়িংয়ের ড্রিমলাইনারটাও তৈরি হয়েছে কয়েকটা জেদি মানুষের জন্য। আজকে ‘রি-ইউজবল’ রকেট এসেছে কয়েকটা মানুষের পাগলামিতে। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে উজাড় করে দিয়েছেন তার জ্ঞানকে। বাকিটা আমাদের পালা।

উদ্ভাবনা কী?

One new idea leads to another, that to a third and so on through a course of time, until someone, with whom no one of these ideas was original, combines all together, and produces what is justly called a new invention.

—Thomas Jefferson

রিসার্চ এবং রিসার্চ

আজকের ‘ইন্টারনেট’ (যা পৃথিবীকে পাল্টে দিচ্ছে)–এর আবিষ্কারের পেছনে একই কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। দেশ চেয়েছে ব্যয়বহুল সার্কিট সুইচিং থেকে বের হতে, ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি, সংক্ষেপে ‘ডারপা’ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ঢেলেছে অঢেল পয়সা, দিয়েছে অনেক সময়। প্রজেক্ট ‘ফেইল’ করেছে হাজারো বার, হাল ছাড়েনি তারা। ফলে তৈরি হয়েছিল আরপানেট, বর্তমান ইন্টারনেটের পূর্বসূরি। আজকের বিদ্যুৎ বাব্দ তৈরি করতে থমাস এডিসনকে চেষ্টা করতে হয়েছিল হাজারবারের বেশি। রিপোর্টার জানতে চেয়েছিলেন তার ‘হাজার বারের ব্যর্থতার অনুভূতির কথা’। এডিসনের জবাব, ফেইল করিনি তো হাজার বার। বরং, লাইট বাব্দটা তৈরি করতে লেগেছিল হাজারটা স্টেপ।

চাকরির ৩০ বছরে যতটুকু শিখেছি, সেটার বেশির ভাগ ধারণা এসে ‘সিন্ধেসাইজ’ হয়েছে এই গত কয়েক বছরে। বিশেষ করে করোনভাইরাস সময়কালে। এই সময়ে অনেক কিছুই চেষ্টা করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে, যা এখন উন্নত বিশ্বে চলছে। বিশেষ করে, একজন ‘কোভিড-১৯’ আক্রান্ত রোগীকে কীভাবে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ট্র্যাকিং করে ‘আইসোলেশন’ অর্থাৎ মূল জনসংখ্যা থেকে আলাদা করে ফেলতে হয়। সেই কাজটি করতে গিয়ে নিত্যনতুন প্রচুর নতুন প্রযুক্তি আমরা মহড়া দিয়েছি। এই মহড়ায় প্রচুর ‘নামহীন’ ডেটা ব্যবহার করতে গিয়ে যা চোখে পড়েছে, সেটাই আমার ধারণাকে নতুন করে পাল্টে দিয়েছে এই ডেটার ব্যবহারে। আমি বিশ্বাস করি, প্রশাসন যদি ডেটা ব্যবহার করে, তাহলে নাগরিকসুবিধা এবং সেবা সহজীকরণে, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলানো যাবে।

ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম

টেলিযোগাযোগ ব্যবসায় ভাসা-ভাসা জ্ঞান বা কাজের উপযোগিতা কম। রেগুলেশনেও একই অবস্থা। দেশ চালানো তো আরও ‘স্পেশালাইজড জব’। দরকার স্পেশালাইজেশন- মানুষের কথা বুঝতে। ঢুকতে হবে ভেতরে, অনেক ভেতরে। পুরোটাই অর্থনীতিবিদদের কাজ। ভবিষ্যৎ না দেখতে পারলে এ কাজে টিকে থাকা কঠিন। বানু রাজনীতিবিদদের মতো জাহাজ লোকেরাও মাঝেমধ্যে অত ভেতরে ঢুকতে পারেন না। স্পেশালাইজেশন বলে কথা! সেখানেই আসে ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং কোম্পানিগুলো।

ওদের কাজ একটাই, ‘আর অ্যান্ড ডি’, সারা বছর ধরে। আবার সেই কনসাল্টিং ফার্ম একই ধরনের কাজ করে বেড়াচ্ছে সব ‘এনলাইটেড’ দেশগুলোর জন্য। স্পেশালাইজড না হয়ে যাবেই-বা কেথায় তারা? আর সেই সল্যুশনের জন্য মিলিয়ন ডলারের নিচে কথা বলেন না কেউই। আর বলবেন নাই-বা কেন? এ ধরনের ‘আর অ্যান্ড ডি’র জন্য কম কষ্ট করতে হয় না তাদের। প্রচুর রিপোর্ট পড়েছি এই কনসাল্টিং ফার্মগুলোর। রিপোর্ট তো নয়, যেন হাতের রেখা পড়ছেন। ভবিষ্যৎ দেখা যায় রীতিমতো। মিলিয়ন ডলারের কনসাল্টিং বলে কথা! টাগেট দিন এক কোটি কর্মসংস্থানের। তৈরি করে দেবে প্রায়োগিক ফরমুলা। হতে বাধ্য। জানতে হয় ভবিষ্যৎ দেখতে। বিগ ডেটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারি খানিকটা।

তাই বলে সব কনসাল্টিং ফার্ম এক নয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলব, কনসাল্টিং ফার্মের দোষ না দেখে যিনি কাজ দিয়ে বুঝে নেবার কথা, তার কম্পিটেন্সিতে ঘাটতি থাকলে রিপোর্ট খারাপ হতেই পারে। আমি কিনছি রিপোর্ট, না বুঝে কিনলে কনসাল্টিং ফার্মের দোষ দিয়ে লাভ কী? গরিব দেশগুলোতে প্রচুর কনসালট্যান্সি হয় বটে, তবে সে দেশগুলো সেগুলো ঠিকমতো বুঝে নেবার সামর্থ্য বা জ্ঞান থাকে না বলেই ঝামেলা হয়। ডোনারদের টাকায় কনসালট্যান্সি হলে সেটার অবস্থা হয় অন্য রকম। রিপোর্ট নিজের মনে করে বুঝে নিতে পারলে সেটার দাম মিলিয়ন ডলারের বেশি। সে ধরনের রিপোর্ট বুঝে নিয়েছিলাম বেশ কয়েকটা। বিটিআরসি-এর হয়ে পোস্ট-ডক করা যাবে কয়েকটা।

দেশ কীভাবে চালাতে হয় সেটার অপটিমাইজেশন প্ল্যান

কাজ করতে গিয়ে পরিচয় হলো বিশ্বখ্যাত অনেক টেলিযোগাযোগ কনসালটিং ফার্মের সঙ্গে। এর সঙ্গে যোগ হলো ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ), কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশনের (সিটিও) এবং আরও অনেক ইনডিপেনডেন্ট কনসালট্যান্ট। ধারণা পেলাম তাদের কাজের। পড়তে থাকলাম আরও হাজারো রিপোর্ট। দামি সব রিপোর্ট, তবে তার দাম কোনো কোনো দেশ বা এজেন্সি দিয়ে দিয়েছে আগেই। পরিচয় হলো ওভাম, ডেলয়েট, অ্যাকসেনচার, কেপিএমজি, পিডাব্লিউসি^৩, নেরা আর ‘অ্যানালাইসিস ম্যাসনে’র মতো তুখোড় তুখোড় ফার্মের সঙ্গে। আবার নিজের প্রতিষ্ঠানেরই কাজ করতে পরিচয় হলো মার্কিন ফার্ম ‘টেলিকমিউনিকেশনস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ’ ইনকরপোরেশন (টিএমজি)-এর সঙ্গে। তাদের ধরনটাই বুঝতে সময় লেগেছিল বেশ। তলই পাচ্ছিলাম না প্রথমে। বিলিয়ন ডলারের কনসালটিং কোম্পানি বলে কথা! পরিচয় হলো অনেকের সঙ্গে। বন্ধুত্ব হলো আস্তে আস্তে। অনেকের সঙ্গে। হাত ধরে দেখিয়ে দিলেন বাংলাদেশের ‘ফল্ট-লাইন’গুলো। একটা জিনিস বুঝে গেলাম, দক্ষতার বিকল্প নেই।

রিপোর্ট বুঝে নেবার জ্ঞান

একসময় তল পেলাম এই ম্যানেজমেন্ট কনসালটিং ফার্মগুলোর কাজের ধারার। পৃথিবীজুড়ে কাজ করার ফলে কোথায় কী সমস্যা, সেটা তারা জানে ভালো। আর সেটা থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দেওয়া ওদের একমাত্র কাজ বলে ওটাও সে জানে ‘অসম্ভব’ ভালো। গরিব দেশগুলোতে হাজার কোটি টাকার ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্সি করে টাকা বানালেও সেটার ব্যর্থতার দায় দেওয়া যাবে না তাদের ওপর। ওই দেশের, যাদের ‘কনসালট্যান্সি’টা বুঝে নেবার কথা তারা ‘ছাড়’ দিলে কাজ হবে কীভাবে? উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে হলে লাগবে লোকালাইজড কনসালট্যান্সি, তবে সেটা পাই পাই করে বুঝে নেবার মতো

৭. আমার দেখা মতে, এই ম্যানেজমেন্ট কনসালটিং ফার্মগুলো সরকারি প্রশাসন ভালো বোঝে। যেকোনো সরকারকে কীভাবে বেসরকারি দক্ষতায় চালানো যায়, সেটা দেখেছি তাদের কাজে।

থাকতে হবে মানুষ। দু-চারটা বৈদেশিক ভ্রমণে ব্যাপারটা উপেক্ষিত হলে জ্ঞান আর প্রজ্ঞাটা হারায় দেশ।

রি-ইউজেবল জ্ঞান

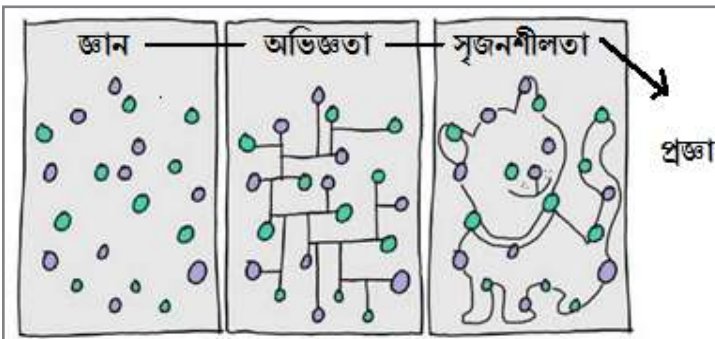
জ্ঞান কিন্তু রি-ইউজেবল। ব্রিটেনের লেগেছে প্রায় ২০০ বছর। শুধু শিখতেই। শিল্পবিপ্লব থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিখেছে ব্রিটেন থেকে। তাদের লোক পাঠিয়ে। নোটবই ভরে নিয়ে আসত তাদের অভিজ্ঞতার কথা। জাহাজে করে। সেটা কাজে লাগিয়ে ওই ব্রিটেনের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে অনেক কম সময়ে। ‘লিড টাইম’ কমিয়ে নিয়ে এসেছে প্রায় ১০০ বছর। এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওই শেখার চর্চাটা ধরে রেখেছে বলে তারা এখনো শীর্ষে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন শত বিপত্তির মধ্যে উদ্ভাবনা দিয়ে আছে টিকে। নিজেদের দেশে মানুষ কম বলে বাইরের বাজার দখলে ব্যস্ত তারা। এখন বোকারাই বলে যুদ্ধের কথা, বাজার দখলে কে কাকে বাজারে বানাতে পারে, সেটাই হচ্ছে বড় যুদ্ধ। রক্তপাত ছাড়াই ‘আউটবান্ড’ ক্যাশফো! তার কিছুটা আঁচ করা যাবে আমাদের দেশ থেকে রেমিট্যান্স/বাণিজ্য যাচ্ছে কোন দেশগুলোতে?

গরিব দেশ নাকি ম্যানেজমেন্টে সমস্যা?

There is no ‘poor’ country, they are ‘poorly’ managed.

—Slightly modified

জ্ঞানের ডিফিউশন



চিত্র ১: জ্ঞান তো হলো অনেক, অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে আসবে প্রজ্ঞা

এশিয়ান দেশগুলো আরও বুদ্ধিমান। ইউরোপ আর আমেরিকা থেকে শিখে সেটা কাজে লাগিয়েছে গত ৩০ বছরে। এখন টেক্স দিচ্ছে সবার সঙ্গে। হংকং, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর অন্যের ‘ঠেকে শেখা’র অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এগিয়েছে বেশি। পাশ্চাত্যে কোনটা কাজ করছে আর কোনটা করেনি, সেটা জানলেই তো হলো! তার সঙ্গে মেশাও ‘লোকাল কন্ডিশন’। আমি এটাকে বলি, ‘ঘুটা’, মানে জ্ঞানের ডিফিউশন। মেলাও হাজারো জ্ঞানের অভিজ্ঞতা। গরিব দেশ হলেও কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে তো মানা করা হয় না বৈদেশিক ভ্রমণে যেতে। অথচ করপোরেট হাউসে কৃচ্ছ সাধনে প্রায় সবই চলছে ভিডিও কনফারেন্সে। দেশের একটাই চাওয়া, শিখে আসা জ্ঞানটা কাজে লাগবে দেশের উন্নতিতে। প্রাথমিক জ্ঞানটা পাওয়ার পর বাকিটা শেখার বাহন হচ্ছে ইন্টারনেট। আর সে কারণে ইন্টারনেট নিয়ে লাগা। জ্ঞান ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়, দরকার তার প্রয়োগ।

‘বেস্ট প্র্যাকটিসেস’ তবে লোকালি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পেলেন জ্ঞান ‘ক’। এদিকে সিঙ্গাপুর দিল ‘খ’ জ্ঞান, ভিয়েতনাম থেকে নিয়ে এলেন ‘গ’। এখন আমাদের স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্ডিকেটরের সঙ্গে মিলিয়ে যেটা যখন কাজে লাগে, সেটাই ব্যবহার করবে বাংলাদেশ। অনেকে এটাকে বলে ‘বেস্ট প্র্যাকটিসেস’। মানে, যেটা কাজ করেছে অনেক জায়গায়। ‘ওয়েল টেস্টেড’। টেস্ট পেপার সলিউশনের মতো কিছুটা। দেখা গেছে, ওভাবে কাজটা করলে জিনিসটা মার যাওয়ার আশঙ্কা কম। টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়ালের পর ফুলপ্রুফ হয়েই নাম হয়েছে ‘বেস্ট প্র্যাকটিসেস’। দেশের ‘লোকাল কন্ডিশন’কে বেস্ট প্র্যাকটিসেসে ঘুটানোতেই রয়েছে মুন্সিয়ানা। ইন্টারনেটকে ছড়িয়ে দেবার ওই ধরনের ‘টেম্পলেট’ নিয়ে কাজ করেছে গত অনেকটা বছর।

জ্ঞানের লিপ-ফ্রগিং

মনে আছে বৈজ্ঞানিক নিউটনের কথা? ‘আমি যদি আজ বেশি দেখে থাকি অন্যদের চেয়ে, সেটা পেরেছি পূর্বপুরুষদের জ্ঞানের ভিত্তিতে’। উন্নত বিশ্বের আজকের যা উন্নতি তার সবটাই এসেছে ওই ‘স্ট্যান্ডিং অন দ্য সোল্ডার অব জায়ান্টস’ কথাটার ওপর ভিত্তি করে। আজ জানি, আমরা ট্রানজিস্টর কী এবং কীভাবে কোটি ট্রানজিস্টর থাকে একটা চিপসেটে। নতুন করে

ওই ট্রানজিস্টর উদ্ভাবন না করে বরং কোটি ট্রানজিস্টরের চিপসেট দিয়ে আর কী কী করা যায়, সেটাই ভাবার বিষয়। আর তাই আগের জ্ঞানের ‘ডিফিউশন’ দিয়ে নতুন উদ্ভাবনা কাজে লাগিয়ে ওপরে উঠছে নতুন ইমার্জিং দেশগুলো। এটাকে বলা হয়, লিপ-ফ্রগিং। এর পাশাপাশি সরকারের দরকার ডিসিশন সাপোর্টের ড্যাশবোর্ড। নীতিনির্ধারকদের জন্য। উনারা একনজর দিলেই বুঝবেন কোথায় সমস্যা, আর সেটার সমাধান কোথায়?

দেশ চালানোর বিজনেস প্ল্যান এবং ড্যাশবোর্ড

ব্যাপারটা অনেকটা বিজনেস প্ল্যান দিয়ে দেশ চালানোর মতো। বড় বড় বিজনেস মানে অনেক কমপ্লেক্স প্রসেস তার মধ্যে। সেজন্য কি থেমে গেছে কাজ? না, বরং প্রসেস অটোমেট করে নিয়েছেন সবাই। সেটাকে ঠিকমতো চালাতে দরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভালো ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমের জন্য। আর যা-ই হোক, সিদ্ধান্ত যাতে কম ভুল হয়। সেখানে দরকার হচ্ছে না এত মানুষ।

সমস্যা হয় যখন সেটা হয় ‘সরকারি’ মানে জনগণের পয়সায়। এ কারণে উন্নত দেশগুলো ছোট করে নিয়ে আসছে তাদের সরকারগুলোকে। যা-ই হয় তা হয় পার্টনারশিপে। যারাই থাইল্যান্ড গিয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন তারা- বিশাল বিশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখে। বেশির ভাগ ইনফ্রাস্ট্রাকচারই কিন্তু পিপিপির মডেলে করা। সরকারের অত পয়সা থাকে না কোথাও। পিপিপি হচ্ছে গিয়ে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। পয়সা জোগান দেবে বেসরকারি কোম্পানি- কাজ দেবে সরকার, আইনগত ভিত্তিসহ। ‘উইন’ ‘উইন’ ব্যাপার। পয়সা লাগল না সরকারের। কর্মসংস্থানও হলো। আমাদের পিপিপি নীতিমালার সাফল্য আসেনি সে-রকম।

‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড’

উন্নত দেশগুলোতে অনেক বড় বড় কাজে সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকে না জনগণ। কারণ এই পিপিপি। যেকোনো দেশের উন্নতির ইনডিকেটর বোঝা যায় ওদেশের পাবলিক ট্রানজিট সিস্টেম দেখে। মানে জনগণ কত সহজে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পারছেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। ঢাকা শহরে সেটার অবস্থা আফ্রিকার অনেক দেশ থেকেও খারাপ। অথচ ব্যবসাবান্ধব পিপিপি নীতিমালা থাকলে প্রাইভেট অ্যাসেস্ট

ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো প্রস্তাব দিতে পারত সরকারের কাছে। তৈরি করত ‘ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড’। ভাগ করে ফেলত পুরো শহর চার-পাঁচ ভাগে। একেকটা ভাগের রুট নিয়ে দেনদরবার করত কনসেশন পিরিয়ডটা নিয়ে। এই রুটটা দাও আমাদের ৫০ বছরের জন্য। তৈরি করব স্কাই ট্রেন। মূল্যস্ফীতির হিসেব ধরে ভাড়ার একটা চার্ট জমা দিত সরকারকে।

প্রজেক্ট ‘ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেম’-এর সন্ধানে

ধরুন, একটা ছোট দেশের কথা। তাদের জমি কেনা থেকে শুরু করে মূল দলিল বের করতে ১ সপ্তাহ লাগলে আমাদের অনেক বেশি সময় লাগে। সেই সময়কে কমিয়ে আনতে আমাদের কাজ করতে হবে স্কেলে। অনেক বড় লেভেলে। ১৬ কোটি মানুষকে সার্ভিস দিতে যেভাবে প্রসেস অটোমেট করতে হবে, সেখানে সনাতন সফটওয়্যার এ মুহূর্তে কাজ করলেও সেটা পিছিয়ে পড়বে সামনে। আমার কথা একটাই, সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেম হাত লাগাক সমাজের অসংগতি দূর করতে। ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেমগুলো সাহায্য করবে সরকারি সার্ভিস ডেলিভারিতে। সময় কমাতে। যেমন, একটা দরকারি ‘ইউনিফাইড’ হেলথকার্ড সরকারি-বেসরকারি ডাক্তারকে সাহায্য করবে সঠিক ডায়াগনস্টিকস এবং ভবিষ্য চিকিৎসা দিয়ে। মানুষের সাহায্যে। আমাদের দরকার ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেম, সব কাজে।

প্রজেক্ট ‘উৎকর্ষের সন্ধানে’— বাংলাদেশ সিরিজ

সফটওয়্যারের মানুষ হিসেবে শূন্য ভার্শন থেকে শুরুতে বিশ্বাসী আমি। শুরু করতে হবে কোথাও। নিউটনের কথায় ফিরে আসব আবার। স্ট্যান্ডিং অন দ্য শোল্ডার অব জায়ান্টস। আমাদেরও এগোতে হবে পূর্বসূরির অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে। গাছ রোপণ করার কথা ছিল ২০ বছর আগে। সেটা না হলে কি থাকব বসে? বরং লাগাব আজই। আমাদের কবে হবে না বলে আমরা শুরু করতে পারি এখনই।

আমি আশা করছি, এই বাংলাদেশ সিরিজে তিনটি বই থাকবে। এই বইগুলো হবে গবেষণাভিত্তিক, বাংলাদেশের একেকটা সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে। বাংলাদেশ সিরিজের দ্বিতীয় বইটিতে (ক) বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিযোজিত শিক্ষাব্যবস্থা (খ) বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার সংস্কার, মানবিক বিচারব্যবস্থা এবং (গ) বাংলাদেশের স্বাস্থ্য (সবার জন্য স্বাস্থ্য) ব্যবস্থাপনা যুক্ত হবে ভবিষ্যতে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বইটার ফিডব্যাকের ওপর ভিত্তি করে সিরিজের তিন নম্বর বই আসতে পারে।

প্রাথমিক ‘বিশ্টিং ব্লক’

অটোমেশন, বুদ্ধিমান সফটওয়্যার = কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সবাই সফটওয়্যার কোম্পানি

Software is also eating much of the value chain of industries that are widely viewed as primarily existing in the physical world.

—Marc Andreessen

সফটওয়্যার ইজ ইটিং দ্য ওয়ার্ল্ড

২০১১ সালের কথা। কথাটা বলেছিলেন নেটস্কেপের কো-ফাউন্ডার এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মার্ক অ্যান্ড্রিসেন। ‘সফটওয়্যার ইজ ইটিং দ্য ওয়ার্ল্ড’। কারণ, উনি বুঝেছিলেন একসময় সবকিছুই গিলে ফেলবে সফটওয়্যার। আর তাই উনি ইনভেস্টমেন্ট করেছিলেন পৃথিবীর সব বড় বড় ‘সফটওয়্যার’ কোম্পানিগুলোতে। উনি ধারণা করছিলেন, একটা বিরাট ‘শিফট’ হবে হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি থেকে ‘সফটওয়্যারে’। উনি দেখছিলেন ‘আইবিএম’ নয়, বরং সফটওয়্যার কোম্পানি হিসেবে মাইক্রোসফট চালাচ্ছিল পৃথিবী। ওই প্রজ্ঞার কারণে উনার একান্ত ব্যক্তিগত নেট আয় ১.৩ বিলিয়ন ডলার।

আমি নিজের সরকারি এবং আন্তর্জাতিক অনেক প্রজেক্টে দেখছি সফটওয়্যারের কারুকাজ। আজকে হার্ডওয়্যারের দাম সবাই জানে, কিন্তু সফটওয়্যারের দামই ‘ডিকটেট’ করে প্রজেক্টের পুরো দাম। সার্ভিস সেক্টরে কোনো প্রজেক্ট ২ হাজার কোটি টাকা হলে সেটার ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সফটওয়্যারে গেলে অবাধ হব না আমি। সেটাই মেধাস্বত্ব।

সফটওয়্যারের দামের কাছে হার্ডওয়্যারের দাম কিছু নয়। এখন কেউ হার্ডওয়্যার কেনে না, কেনে সল্যুশন।

আর বুদ্ধিমান দেশগুলো কেনে ক্লাউড সার্ভিস। হার্ডওয়্যার কেনার চিন্তাও আনে না মাথায়। কে ম্যানেজ করবে ওই হার্ডওয়্যার দিনের পর দিন? প্রজ্ঞাসম্পন্ন সরকারগুলো ডেটাসেন্টার ম্যানেজমেন্ট ছেড়ে দিয়েছে প্রাইভেট সেক্টরের কাছে। সরকারের দরকার ডেটা থেকে প্রজ্ঞা দেশ চালাতে, সেটা পেলে ছোট করে নিয়ে আসা যায় সরকারকে।

সবাই এখন সফটওয়্যার কোম্পানি

আসলেই তাই। পৃথিবীর বড় বড় কোম্পানি এবং সরকারি সার্ভিসগুলো চলে গেছে সফটওয়্যারে। সার্ভিস আর প্রোডাক্ট হয়ে গেছে ইন্টারনেটভিত্তিক। সনাতন ব্যাংকিংয়ের অনেকাংশ গিলে ফেলেছে ‘বিকাশ’। অবাধ হবেন না, বিকাশ কিন্তু একটা উঁচুদরের সফটওয়্যার কোম্পানি। ‘পেপ্যাল’ খেয়ে ফেলেছে পৃথিবীর কেনাকাটার মধ্যস্থত্বভোগীদের। ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানিগুলোকে খেয়ে ফেলবে ‘পাঠাও’ আর ‘উবার’। বহু আগেই ট্র্যাভেল এজেন্টদের খেয়ে ফেলেছে এক্সপেডিয়া, বুকিং.কম আর প্রাইসলাইন নামের সফটওয়্যার কোম্পানি। সফটওয়্যার কোম্পানি ‘এয়ারবিএনবি’ মারাত্মকভাবে কোপ মেরেছে হোটেল ব্যবসায়। নেটফ্লিক্স খেয়ে ফেলেছে সিনেমা ব্যবসা। দোকানপাট খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে অ্যামাজন। শোরুম, ইনভেন্টরি খরচকে নামিয়ে কম দামে (ইকোনমি অব স্কেলে) জিনিসপত্র দিতে পারছে ইভ্যালি, আলিবাবা। রেস্টুরেন্টের হিস্যা নিয়ে নিচ্ছে ফুডপান্ডা, হাংগি-নাকি। ঠিক ধরেছেন। সফটওয়্যার কোম্পানি এরা। ফেসবুক মেসেঞ্জার আর উইচ্যাটের মতো একীভূত সার্ভিস আবার খেয়ে ফেলতে চাচ্ছে বাকিদের। কী হবে সামনে?

২০১৮ সালে অ্যাপলের অ্যাপ-স্টোর আয় করেছিল ৪০ বিলিয়ন ডলার, এর জন্মের ১০ বছরের মধ্যে। মোবাইলের এই ছোট ছোট অ্যাপ, তাতেই কী অবস্থা! অনেক ফ্রি, বাকিগুলো শুরু মাত্র ৯৯ সেন্ট, সেখান থেকে এই আয়, ভাবা যায়? হোয়াটসঅ্যাপ সফটওয়্যারকে কিনতে ফেসবুককে খরচ করতে হয়েছিল বাংলাদেশের প্রায় বাজেটের সমান ওই সময়ে। অথচ, সেই সময়ে কোম্পানিটা চালাচ্ছিল মাত্র ৩০ জন জনবল দিয়ে। এর মানে হচ্ছে ‘সফটওয়্যার ইজ টেকিং ওভার’। এত হাজার মানুষ প্রয়োজন নেই

সরকারি ও বেসরকারি অফিসগুলো চালাতে। তাহলে এই কাজগুলো যাবে কোথায়? মানুষ যত না ‘গায়েগতরে’ খাটাখাটির চাকরি হারাবে, তার থেকে বেশি চাকরি জেনারেট করবে এই অটোমেশন, ক্রিয়েটিভ অংশে। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, কমিউনিকেশন, সোশ্যাল স্কিল, প্রোডাকটিভিটি নিয়ে নতুন কাজে মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না এ মুহূর্তে।

সফটওয়্যার এবং ব্যবস্থাপনা

Where we once managed software in the same way we ran our businesses, now we need to manage our businesses in the same way we manage our software.

—Jeff Gothelf and Josh Seiden, Sense and Respond

সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টরে প্রচুর কেনাকাটায় একটা বড় অংশ থাকে সফটওয়্যারে। সেখানে আমরা সফটওয়্যার না বুঝলে বাংলাদেশকে কিনতে হবে সফটওয়্যার, বাইরে থেকে। চড়া মূল্যে। আমি সেটা দেখছি নিজের চোখে। অনেক দেশ এখন চলছে পুরো সফটওয়্যারে। এন্ড টু এন্ড। আমাদের বুঝতে হবে সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্ট। এখন অনেক দেশের পুরো ব্যবস্থাপনা চলে গেছে সফটওয়্যারে। সেটা একটা দেশের বর্ডার কন্ট্রোল পার হলেই বুঝবেন। বাইরের দেশের নাগরিক হয়ে।

বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞাসা করুন আপনার ওই দেশি বন্ধুকে। সব সফটওয়্যারের খেলা, জনগণকে ভালো সার্ভিস ডেলিভারির জন্য। সরকারি সব সার্ভিস এখন পাওয়া যায় বাসায় বসে। পাশাপাশি বহু সরকারি অফিসের জায়গায় বসছে কিয়স্ক। যত কম মানুষের ইন্টার-অ্যাকশন, তত কম ব্যায়াস ও দুর্নীতি। তবে শুরুতে দরকার, একটা ভালো শনাক্তকরণ পদ্ধতি, প্রতিটা জনগণের জন্য। এটা ঠিক যে আমাদের একটা ভালো শনাক্তকরণ পদ্ধতি আছে, যাকে ব্যবহার করতে হবে সব জায়গায়, যেমন হেলথকার্ড হিসেবে।

বুদ্ধিমান সফটওয়্যার = কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কেমন হয় সফটওয়্যার যদি নিজেই তার প্যারামিটার ঠিক করে নেয়? সেটা কী সম্ভব? আর সে কারণে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আমি নিজেই চাই না মানুষ আরেক মানুষের ড্রাইভারগিরি করুক। সেলফ ড্রাইভিং কার নিজের কাঁধে নিয়ে নেবে এই অমানবিক কাজ। সেটাও কিন্তু সফটওয়্যার।

তবে, হার্ডকোডেড সফটওয়্যার নয়। আমরা শুধু প্রোগ্রাম করে একটা গাড়ি নামাতে পারব রাস্তায়? কী হবে যখন ধারণার বাইরের জিনিসপত্র হাজির হবে গাড়ির সামনে? গাড়ি কি বুঝতে পারবে কোনটাকে সামান্য আঘাত করা যাবে, আর কোনটাকে একেবারেই না? এক্সপ্লিসিট প্রোগ্রামিং দিয়ে যেভাবে সেক্ষেত্র ড্রাইভিং কার চালানো যাবে না, সেখানে রাস্তার ডেটা ‘ডিকটেক্ট’ করবে গাড়ি কীভাবে চলবে। রাস্তার ডেটাকে চেনাবে কে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

এখন আসি, আসল কথায়। ভয় পাবেন না। হাজারো বিজনেস খেয়ে ফেলা সফটওয়্যারকে খেয়ে ফেলবে কে? ঠিক ধরেছেন। ‘এআই’। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। যার শুরুটা ডেটা দিয়ে। অনেক ‘সাইন’ পাচ্ছি হাতেনাতে। আর মাত্র পাঁচ বছর। আসলেই তাই। কেন? আমাদের প্রচুর ‘এন্ড টু এন্ড’ সল্যুশন দেখতে হয় দেশ-বিদেশে। তিন বছর আগে ব্যাপারটা ‘বাজওয়ার্ড’ মনে হলেও এখন ব্যাপারটা আর ‘খেলো’ নেই। সবাই এই জিনিসটা থেকে হাতেনাতে ফলাফল পাচ্ছেন বলে এর অ্যাডপ্টেশন রেট অনেক ভালো।

সফটওয়্যারের কাঁচামাল কী?

ডেটা। এবং ডেটা।

ডেটা, ‘স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেট’ এবং ওপেন ডেটা ইনিশিয়েটিভ

নিজের ডেটার ব্যবহার

Companies across a wide range of industries are learning that the sophisticated use of information found within their own organizations is critical to achieving high performance.

—Accenture

ডেটাকে ‘ডিক্লেয়ার’ করতে হবে ‘স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেট’ হিসেবে

আমাদের হাতে এখন এত বেশি ডেটা, স্টোরেজের দাম কমে যাওয়া এবং কম্পিউটিং প্রসেসিং ক্ষমতার প্রাচুর্যতা মানব সভ্যতাকে দিচ্ছে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত। ডেটা এখন ‘স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেট’ হিসেবে পরিগণিত হাওয়ায় অনেক দেশ এবং কোম্পানিগুলোর একক আধিপত্য বিপদে ফেলছে আমাদের মতো দেশগুলোকে। জাতীয় অনেক সিদ্ধান্তকে

প্রভাবিত করছে, যেহেতু আমাদের অনেক ডেটা আছে তাদের কাছে। এখন আমরা বুঝতে না পারলেও কয়েক বছর পরে এটার প্রভাব পড়বে জাতীয় অর্থনৈতিক ‘থ্রোথে’।

ডেটা যেখানে একাধারে সম্ভাবনা দিচ্ছে, সেখানে ডেটাকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে না পারায় বিপদে ফেলছে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীকে। ডেটার ব্যাপারে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত বাঁচিয়ে দিতে পারে অনেক বাড়তি খরচ। আমাদের মতো দেশগুলোতে ডেটার ব্যবহার ঠিকমতো না হবার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে জাতীয় সংস্থাগুলো কীভাবে ডেটাকে জনস্বার্থে ব্যবহার করবে সে ব্যাপারে ধারণা না থাকা। সব ধরনের ডেটাকে ‘স্পর্শকাতর’ ডেটা হিসেবে ব্যবহার করলে এই ডেটা থেকে সুবিধা নেওয়া যাচ্ছে না। বিশাল ডেটাসেন্টার ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ইনভেস্টমেন্ট করেও তার থেকে সুফল হারাচ্ছে সরকার।

ডেটা এবং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন

Ultimately, data becomes the fuel that helps power multiple use cases or opportunities that the business may want to go after as part of [a digital] transformation.

—CEO of Informatica

অনেক সংস্থা মনে করছে, এই পাবলিক (জনগণের ব্যক্তিগত ডেটা বাদ দিয়ে) ডেটা আসলে তাদের সংস্থার ডেটা। ফলে ডেটা থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারছে না সরকার সামগ্রিকভাবে। ধরুন, একটা সংস্থা ভাবছে তাদের ডেটা দিয়ে অন্যের কী লাভ হবে? যেটা সেই সংস্থা বুঝতে পারছে না, যখন ডেটাগুলোকে ‘কানেক্টিং দ্যা ডটস’-এর মতো এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়, তখন অনেক অজানা তথ্য ভেসে ওঠে। ডেটাগুলোর মধ্যে ‘সম্পর্কিত’ মানে ‘রелеভেন্সি’ ব্যাপারগুলো আরও অন্য ডেটার ব্যাপারে ধারণা দেয়। এবং সেই ধারণা সামনের বছরগুলোতে সরকার কীভাবে চলবে, সেটার একটা বিশাল গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে। প্রচুর প্রেডিকশন আসবে সামনের সব সমস্যার সমাধানে।

ওপেন ডেটা ইনিশিয়েটিভ

সবাই যখন বুঝে গেছে বিশাল পরিমাণ ডেটাতে অ্যাক্সেসই বর্তমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চাবিকাঠি, সেখানে নলেজ ইকোনমিগুলো নীতিমালা

বানিয়েছি ‘ওপেন ডেটা অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভ নিয়ে, যাতে সরকারি ডেটাকে ব্যবহার করে দেশের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে উদ্ভাবনী কোম্পানি, অ্যাকাডেমিয়া, অথবা তাদের ‘স্পিন-অব’ ভেঞ্চারগুলো। সরকারের পাবলিক ডেটা (প্রাইভেট ডেটা নয়) এবং উদ্ভাবনী কোম্পানিগুলোর পার্টনারশিপ সমাধান করছে সরকারি সার্ভিস ডেলিভারির সমস্যাগুলোকে। তবে অনেক দেশের সরকার ব্যবহার করুক অথবা না করুক, ডেটার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে, যাদের অপারেশন রয়েছে পৃথিবীজুড়ে। সেখান থেকে শিখছে বাকি কোম্পানিগুলো। সরকারের কাছে ডেটা, তবে সেটা থেকে প্রজ্ঞা বের করে পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারিতে যুক্ত হতে পারে প্রাইভেট সেক্টর। ধরুন, ক্রাইম ডেটা, পাবলিকভাবে ‘ওপেন’ থাকলে প্রাইভেট সেক্টরের সাহায্য নিয়ে ভবিষ্যৎ অনেক ধারণা পেতে পারে একেকটা নিরাপত্তা এজেন্সি।

ডেটার ভালো ব্যবহার যেহেতু প্রাইভেট সেক্টরে বেশি, অনেক জায়গায় জনস্বার্থে ডেটার ‘ফেয়ার অ্যাক্সেস’, যেখানে কোম্পানিগুলো (সরকারের নীতিমালা মেনে) গ্রাহকের অনুমতিতেই দিতে পারে আরও ‘পার্সোনলাইজড’ সার্ভিস। বিশেষ করে, নাগরিকসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের কাছে কেন্দ্রীয়ভাবে জনগণের সঠিক প্রাপ্যতা/শনাক্তকরণ প্রসেস ঠিকমতো তৈরি হলে কমে যাবে সামাজিক অসংগতি। উন্নত দেশগুলোর ভিসা সার্ভিসগুলোকে প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দেওয়া সেরকম একটা ভালো উদাহরণ।

অনেক ক্ষেত্রে দেশগুলোর ডেটা নিয়ে সেরকম ধারণা না থাকার ফলে সুযোগ নিচ্ছে বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার/কনটেন্ট প্রোভাইডাররা। ফলে বিশাল পরিমাণে গ্রাহক/পাবলিক ডেটা নিয়ে তারা হয়ে যাচ্ছে মহিরুহ। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না সেই দেশগুলো। এক্ষেত্রে ডেটা প্রোটেকশন, ‘ডেটা পোর্টেবিলিটি’, ‘ডেটা ট্রাস্ট’ নীতিমালাগুলো ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে ডেটার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। প্রতিযোগিতা/বাজার সংস্থাও কাজ করেছে এখানে অনেক দেশে। এদিকে ডেটার সঠিক ব্যবহার (ডেটার প্রিজুডিস) নিশ্চিত করতে না পারলে সরকারেরও সমস্যা হয় বিভিন্ন স্পেসিফিক গোষ্ঠীর ওপর। নাগরিক সেবার অসমতা তৈরি হয় তখন। হয়তোবা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পায় কিছু জনগোষ্ঠী। সে কারণে নীতিমালার বাস্তবায়ন জরুরি।

৬ মাসে বর্তমান যেকোনো সরকারি সেবাকে অনলাইনে আনা

বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, বর্তমানে বাংলাদেশে যেকোনো সংস্থার সেবা সহজীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩ থেকে ৬ মাসের বেশি লাগার কারণ নেই। কারণ, সব সহযোগী প্রযুক্তিসহ সেবাগ্রহীতাকে শনাক্তকরণ, সেবার ‘এন্ড টু এন্ড’ ট্র্যাকিং, সেবার প্রতিটা পর্যায়ে সেবাগ্রহীতাদের জন্য তথ্য টিকিট জেনারেশন, ডিস্ট্রিবিউটেড লেজারের জন্য ব্লক-চেইন, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ই-নথি, সরকারি পোর্টাল সব উপস্থিত। সত্যিই তাই। বাকি থাকে ইন্ট্রিশন।

শুধু দরকার আসল মাইন্ডসেট। যেভাবে আমরা করেছিলাম বায়োমেট্রিক সিম রেজিস্ট্রেশন। নীতিনির্ধারণী কর্তব্যাক্তি বলেছিলেন, আমার চাই-ই, চাই। হয়েছেও তাই। প্রশাসন ৬ মাসের মধ্যে সেবাপ্রদানকারী সংস্থাগুলোকে সেবাগ্রহীতাদের সংস্থার অফিসে না এসে পূর্ণ সার্ভিস ডেলিভারির জন্য সেই সংস্থাকে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত করলে সামনের ১ বছরে সব সার্ভিস সম্পূর্ণ অনলাইন করা সম্ভব। সেটাই আলাপ করেছি সেবাসহজীকরণ অধ্যায়ে। সমস্যা প্রযুক্তিতে নয়, সমস্যা আমাদের মানসিকতায়। তবে, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সংস্থাপ্রধানের ওপরে।

প্রযুক্তির ‘লিপ-ফ্রগিং’

প্রযুক্তির লিপ-ফ্রগিং/সরকারি সার্ভিস ডেলিভারি

আমার ধারণা, উন্নত দেশগুলো থেকে বাংলাদেশেই আগে দরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তি। কারণ, প্রযুক্তির ‘লিপ-ফ্রগিং’। আমাদের মধ্যম প্রযুক্তি নেই বলে সরাসরি যাওয়া যাবে উন্নত প্রযুক্তিতে। ‘কানেক্টিং’ লিগেসি প্রযুক্তি নেই বলে দরকার পড়ছে না খরুচে ‘মাইগ্রেশন স্ট্রাটেজি’। বাংলাদেশের একেকটা সরকারি সার্ভিস ডেলিভারিতে—যেমন, পাসপোর্ট/নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) ডেলিভারি, পুলিশ ভেরিফিকেশন, ভূ-সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন, আদালত/আইনগতসেবা ইত্যাদির জন্য মানুষের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কমিয়ে আনা সম্ভব বর্তমান ডেলিভারি সময়।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সময় কম/কাজের অ্যাকুরেসি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ‘বায়াসে’র অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ আসবে কমে। দিনের শেষে সরকার পাবে একটা ড্যাশবোর্ড, যেটা আনবে ওয়ার্ক ফ্লো/প্রসেসের স্বচ্ছতা। প্রতিটা টাকার খরচের হিসেব। সম্ভব সবই। প্রায় তৈরি হয়ে আছে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার। ঠিক হয়ে আসছে জাতীয় ডেটাসেটগুলো। তাদের এপিআই

(অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস) ডকুমেন্টেশনগুলো দেখলে মন ভালো হতে থাকে। যোগসূত্র তৈরিতে একটু সময় লাগলেও সেটা ঠিক হয়ে আসবে সামনের বছরগুলোতে। এখন দরকার স্মার্ট লিডারশিপ, সঠিক মাইন্ডসেট এবং একটা ছোট কমিটেড টিম।

ক্লাউড কম্পিউটিং, ডেটা রেসিডেন্সি, তথ্যের নিরাপত্তা

ক্লাউড এবং নিরাপত্তা

It's a myth that moving to the cloud means compromising security. Gartner predicts that through 2020, public cloud infrastructure workloads will have 60% fewer security incidents than traditional data centers.

—Glenn Hicks, Why You Need To Adopt A Cloud First Strategy Now

সরকারের নিজের ডেটা সেন্টার তৈরি, ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা

একটা কথা ধ্রুব সত্য যে ডেটা এখন থেকে সব সময় বাড়বে, বরং কমবে না। বর্তমান সময়ের ট্রেন্ড বলছে, ডেটা ধীরে ধীরে আরও বাড়বে এবং সেই ডেটাকে প্রসেস করার মতো স্টোরেজ এবং কম্পিউটেশনাল ক্ষমতা প্রয়োজন হবে সরকারের। সেই প্রসেসিং ক্ষমতা এবং স্টোরেজ যদি সরকারকে কিনতে হয়, তবে সেটা ব্যয়বহুল হবে। যদি একটা শহরের সব সিসিটিভি ক্যামেরার ‘ফিড’ কোনো ডেটা সেন্টারে ঢোকানো হয়, তাহলে সেটার প্রসেসিং করতে যে স্টোরেজ এবং কম্পিউটেশনাল প্রসেসিং ক্ষমতা প্রয়োজন সেটা কিনতে কিনতে আরও ডেটা প্রসেসিংয়ের প্রয়োজন পড়বে। এই অবস্থায় সরকারের প্রতিটা সিসিটিভি থেকে আসল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ জ্ঞানটা পেলেই চলে যেত।

সরকারকে কেন ডেটা সেন্টার তৈরি অথবা সেই ডেটাকে প্রসেস করার সক্ষমতা নিতে হবে? এর ‘এন্ড টু একোসিস্টেম’ ব্যবস্থাপনা তৈরি এবং ‘মেনটেন্যান্স’ খরচ অনেক বেশি। কথা হচ্ছে, ডেটা ফিড দেবে সরকার—‘ইন্টেলিজেন্স’ নেবে সরকার। মার্বোর ‘স্টোরেজ’ এবং ডেটা ‘প্রসেসিং’ করবে চুক্তিভিত্তিক ক্লাউড কম্পিউটিং কোম্পানি। ফলে, সরকারকে প্রতিবছর দামি হার্ডওয়্যার (যা ব্যবহার করা যায় না ৩-৪ বছর পর), স্টোরেজ (যার ক্ষমতা শেষ হতে থাকে ২/৩ বছর পরপর) ‘এক্সপ্যানশন’—

এর ইনভেস্টমেন্ট থেকে বাঁচিয়ে দেবে একটা ১০-১২ বছরের চুক্তি। সরকার নেবে সার্ভিস, সার্ভিস দেবে টেন্ডারের সর্বনিম্ন দরদাতা। বরং, সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা থাকছে না কোনো ভৌত অবকাঠামো তৈরি এবং ব্যবস্থাপনার।

ডেটা দেবে সরকার, অ্যানালাইসিস করবে চুক্তিভিত্তিক কোম্পানি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ‘ক্লাউড ফাস্ট’ নীতিমালা অর্থাৎ সরকারি ডেটাগুলোকে কীভাবে কম খরচে নিরাপত্তার স্বার্থে ‘ক্লাউডে’ হোস্ট করা যায়, সেটা নিয়েই কাজ চলছে অনেকগুলো বছর। গত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এই ডেটাগুলোকে ঠিকমতো ব্যবহার এবং প্রসেসিং করার জন্য সরকারকে নিজস্ব ডেটা সেন্টার তৈরি করতে গেলে সেখানে পুরো ব্যাপারটার ‘রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট’ অনুপাত নেতিবাচক থাকে।

ক্লাউড অর্থ, সব সমস্যা মেটাবে সার্ভিস প্রোভাইডার

সরকারি অফিসের বিভিন্ন হার্ডওয়্যারের কারণে ডাউনটাইম, সফটওয়্যারের ভুল কনফিগারেশন, অফিসের সুরক্ষা লঙ্ঘন অর্থাৎ ‘সিকিউরিটি ব্রিচ’ এবং ডেটা লস অর্থাৎ ডেটা হারানো— এ ধরনের সমস্যাগুলো প্রতিনিয়ত বিপদে ফেলছে সরকারি অফিসগুলোকে। অথচ এ ধরনের সার্ভিসগুলোর ‘এন্ড টু এন্ড’ পুরো দায়িত্ব এবং মাথাব্যথা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে ক্লাউড কমপিউটিং সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে। যার কাজ তাকে করতে দেওয়া উচিত, এতে সবারই সুবিধা হয়। একটা সরকারি অফিস নেটওয়ার্কের বিভ্রাটে জনগণের সার্ভিস ব্যাহত হয়।

ডেপ্লয় করতে করতেই প্রোভাইডার ‘লাইফ-সাইকেল’ শেষ

সরকারের জাতীয় ডেটা সেন্টার এবং বিভিন্ন সংস্থার নিজ নিজ ডেটা সেন্টারের জন্য দরকারি নির্দিষ্ট সার্ভার এবং স্টোরেজের ডিজাইন করে সেগুলোকে ‘ডেপ্লয়’ করতে করতে সেই সার্ভার এবং স্টোরেজের ‘প্রোডাক্ট লাইফ’ সাইকেল শেষ হয়ে আসে। এ কারণে, সরকারের একেকটা বাৎসরিক মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট শেষ পর্যন্ত আর নতুন করে অনুমোদিত হয় না। ফলে এ ধরনের প্রচুর প্রজেক্ট মুখ থুবড়ে পড়ে। এতে প্রচুর টাকা নষ্ট হয়।

সরকারের ‘এন্ড টু এন্ড’ সল্যুশন কেনার সক্ষমতা তৈরি

ডেটাভিত্তিক কোম্পানিগুলো ভালো করেই জানে কীভাবে ডেটাগুলোকে ‘টার্ন-কি’ সল্যুশনে একটা সময়ের সঙ্গে ঠিকমতো ‘স্টোর’ এবং ‘প্রসেস’ করতে হয়। বিশেষ করে, তাদের সল্যুশন স্পেসিফিক দরকারি কম্পিউটেশনাল ক্ষমতা দিয়ে। সরকারের ভেতরে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে আমরা যখন বিভিন্ন হার্ডওয়্যার নিয়ে মাথা খারাপ করে ফেলেছি, এর মধ্যে নতুন সফটওয়্যারের চাহিদা অনুযায়ী আরও দামি হার্ডওয়্যারের চাহিদা চলে এসেছে। এ ধরনের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের ইঁদুরদৌড়ে সরকারের পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না, একটি পুরো সার্ভিস ডেলিভারি ডিজাইন করতে। বরং, সরকারের প্রয়োজন কীভাবে ডেটাগুলো প্রজ্ঞা থেকে পেতে পারে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করে নয়।

সরকারের দরকার ফাইনাল প্রোডাক্ট, প্রসেসিং যাবে আউট সোর্সিংয়ে

সরকারের প্রয়োজন ‘ইন্টেলিজেন্স’ অর্থাৎ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা— ডেটা থেকে। সেই ডেটাকে কীভাবে ‘স্টোর’ করতে হবে অথবা ‘প্রসেস’ করতে হবে, সে ধরনের ধারণা থেকে সরকারগুলো যত তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে, ততই দেশগুলোর টাকা কম নষ্ট হবে। আমাদের কী দরকার এবং সেই কাজটা সবচেয়ে ভালোভাবে যে করবে, তাকে দিয়ে দিলেই আমাদের অনেক মূল্যবান টাকা এবং সময় নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। আবারও বলছি, আমাদের দরকার ইন্টেলিজেন্স, অর্থাৎ প্রজ্ঞা, ডেটা থেকে, আমরা বরং সময় নষ্ট করছি ডেটাকে স্টোর এবং প্রসেস করতে গিয়ে। এসব জায়গায় যেকোনো সরকার ডেটাভিত্তিক কোম্পানিগুলোর সমকক্ষ নয়। ডেটা ব্যবসায় যে ধরনের ‘অপটিমাইজেশনে’র প্রয়োজন, সেটা বেশ ভালো জানে ডেটাভিত্তিক কোম্পানিগুলো।

ডেটার অপব্যবহার রোধে ব্যবহারযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন

সরকারের মূল কাজ হচ্ছে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করা, সেটার জন্য ডেটাভিত্তিক যত জ্ঞান অথবা প্রজ্ঞা প্রয়োজন, সেটাকে স্টোর এবং প্রসেস করে দেবে চুক্তিভিত্তিক কোম্পানিগুলো। এখানে ডেটার অন্যায় ব্যবহারগুলোকে বন্ধ করা যাবে প্রয়োজনীয় নীতিমালা এবং শক্ত শর্তনামা

দিয়ে। ডেটার নিরাপত্তা নিয়ে এখন এবং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি এমন একটা পর্যায়ের চলে গিয়েছে, সেখানে সরকারকে ডেটা নিরাপত্তা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি না করে সরকারি নিজস্ব জনবলকে দিয়ে এই ধরনের ডেটা নিরাপত্তা দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

স্মার্ট গভর্ন্যান্স

A Government is smart, if it is focused on governance rather than the government itself.

Conventional view of the people towards government can undergo a big change when they see the government optimizing its functioning to serve citizens better. The government is seen to be taking the right steps in this direction by enabling 'Public Cloud Policy' and related policies around 'Data Privacy and Protection'.

—Why Is It Safe For Government Bodies To Keep Data On The Cloud? Ameya Paratkar

কী চাই, সেটা বের করতে হবে আগে?

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সার্ভিস ডেলিভারি 'আরএফপি' (রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল) ডকুমেন্টে দেখা যায় যে তারা সর্বশেষ ধাপে একটা সরকার কী কী চাইতে পারে সেটার ওপরে মনোযোগ দিয়েছে বেশি। আমাদের একই ধরনের ডকুমেন্টগুলোতে কী ধরনের হার্ডওয়্যার, কী ধরনের প্রসেসর, অথবা স্টোরেজ, অর্থাৎ হার্ডডিস্ক লাগবে, সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি বেশি। এগুলো ডিজাইন করবে সার্ভিস প্রোভাইডার। এগুলোর ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা বেশি।

পেন্টাগনের ক্লাউড কম্পিউটিং অভিজ্ঞতা, সেবা দিচ্ছে মাইক্রোসফট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খোদ পেন্টাগনের ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভিস দেবার জন্য মাইক্রোসফট, ওরাকল, অ্যামাজন, গুগল-এর যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মাইক্রোসফট জিতলেও এই ধারণাটা এখন পুরো পৃথিবীতে বিস্তৃত হচ্ছে। পেন্টাগনের সেই 'জয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিফেন্স এন্টারপ্রাইস' (জেডআই) কন্ট্রাক্ট-এর মূল্যমান ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। এখন পেন্টাগনের ইমেইল এবং কোলাবোরেশন সার্ভিসের জন্য কাজ চলে যাচ্ছে বিভিন্ন সার্ভিস

প্রোভাইডারের কাছে। পৃথিবীতে ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভিস কোম্পানিগুলোর বেশির ভাগ আয় আসে সরকারি সার্ভিস কন্ট্রাক্টগুলো থেকে।

সরকার এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে ১০ বছরের চুক্তি

সরকারের সঙ্গে একটা কোম্পানির চুক্তি মোতাবেক ১০ বছরের চুক্তিতে তাদের ডেটা স্টোরেজ, ক্লাউড কম্পিউটিং, ডেটা লোকালাইজেশন এবং ডেটা প্রসেসিংয়ের চুক্তি থাকে, তাহলে সর্বশেষ পর্যায়ে সরকারের ডেটা থেকে যে ‘ইন্টেলিজেন্স’ প্রয়োজন, সেটা সার্ভিস প্রোভাইডার ঠিকমতো দিতে পারলেই সব ধরনের চাহিদা মেটার কথা। আমার ধারণা, এখানে সরকারি সব কাজের জন্য ‘ক্লাউড কম্পিউটিং’ সার্ভিস পেতে ডেটাভিত্তিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ১০-১৫ বছরের জন্য টেন্ডারে গেলে যে খরচ হবে, তা বর্তমান খরচের দশ ভাগের এক ভাগ হতে পারে।

ক্লাউড কম্পিউটিং, অবজেক্ট স্টোরেজ, ডেটা নিরাপত্তা

বর্তমানে ক্লাউডে ডেটা রাখার ব্যাপারে অনেক ধরনের আইনি ধারণা এসেছে— যার মাধ্যমে কীভাবে একজন মানুষের ডেটা (তথ্য গোপনীয়তা) নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষণ করা যায়। এই ধারণাকে মাথায় রেখে অনেক রিসার্চ পেপার বাজারে এসেছে সরকার এবং ডেটা সার্ভিস প্রোভাইডারগুলোকে লক্ষ্য করে। ‘ডেটা রেসিডেন্সি’ অর্থাৎ কোন ডেটা কোন এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে (ডেটাগুলোকে ‘জিওলোকেশন’ ‘ট্যাগিং’ করা) অথবা কোন ডেটাগুলো দেশের বাইরে গেলে সমস্যা হবে না সেগুলো নিয়ে বিস্তর নীতিমালা হয়েছে অনেক দেশে।

ডেটার অবজেক্ট স্টোরেজ, আলাদা টোকেন, অবজেক্ট এন্ট্রিবিউট

ডেটা সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে থাকলেও বর্তমান অবজেক্ট স্টোরেজের প্রক্রিয়ায় প্রচুর সার্ভিস স্টোরেজে ভাগ ভাগ হয়ে থাকার ফলে সেই ডেটাকে এক জায়গায় নিয়ে এসে ‘ডি-ক্রিপ্ট’ করে দেখার সম্ভাবনা কমে গেছে অনেক আগেই। ‘ডেটা লোকালাইজেশন’ অর্থাৎ ‘ডেটা রেসিডেন্সি’ এবং ‘ডেটা সোভারেন্টি’ আইনি প্রক্রিয়ায় ডেটাগুলোকে সরকারি নিয়ম মেনে সার্ভিস প্রোভাইডারের ক্লাউডে রাখলে সেই ডেটা থেকে সরকার ছাড়া অন্যদের ‘ইন্টেলিজেন্স’ বের করা প্রায় অসম্ভব বটে। এমনকি একই ক্লাউডের দশটি সরকারি সংস্থার মধ্যে ভার্সুয়ালি ডেটা ‘আইসোলেশন’

করা এখন খুবই সাধারণ ব্যাপার। অর্থাৎ চাইলেই কেউ অন্যের ডেটা দেখতে পারবে না।

‘এট্রিবিউট বেইজড এক্সেস কন্ট্রোল’, বিভিন্ন ধরনের টোকেনাইজেশন বর্তমানে ডেটার জন্য বিভিন্ন ধরনের ‘টোকেনাইজেশন’, অর্থাৎ সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সরকারি ডেটা থাকলেও সেটার বিভিন্ন টোকেনাইজেশন পদ্ধতি— বিশেষ করে একজন গ্রাহকের ডেটার কোন কোন অংশ সরকারি কোন কোন এজেন্সির কাছে কীভাবে আলাদাভাবে দেখানো যাবে সে ধরনের ‘থ্যানুলার’ ধারণাও চলে এসেছে বর্তমান ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচারে। এখানে ডেটার রেফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির জন্য অনেক ধরনের পদ্ধতি আছে, যেগুলো ব্যবহার করছে বিভিন্ন ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার। সরকারের শর্তমালা মেনে।

আমার মতামত হচ্ছে, সরকারের নিজের পক্ষে ডেটা সিকিউরিটি শর্তমালা তৈরি এবং ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি এর সংস্থাভিত্তিক নিরাপত্তা প্রদান একটা বড় খরুচে ব্যাপার। সে হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহারের জন্য সরকারি নীতিমালাগুলো দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে, ইউরোপের ‘জেনারেল ডেটা প্রটেকশন রেগুলেশন’ (জিডিপিআর) একটা বিশাল ধারণা দিচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর জনগণের ডেটার প্রটেকশন এবং তার প্রাইভেসি নিশ্চিতকরণে। ‘জিডিপিআর’ আমার দেখামতে, সর্বসেরা ‘জনগণের জন্য’ ডেটা প্রটেকশন এবং ব্যক্তিগত তথ্য গোপনীয়তার নীতিমালা।

কিছু ডেটা সবার, তবে সব ডেটা সবার জন্য নয়

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কিছু ডেটা সবার জন্য হলেও সেটা সংস্থাভিত্তিক সবার জন্য না হবার সম্ভাবনা বেশি। সরকারি কিছু ডেটা, বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও শনাক্তকরণ পদ্ধতি একই থাকবে, যেমন ‘জাতীয় পরিচয়পত্র’ এখানে আসল ভূমিকা পালন করলেও সেটা ‘মাস্কিং’ অর্থাৎ সেটাকে টোকেন হিসেবে দেখাবে আরেকটা সংস্থার কাছে। তবে এতে, ডেটার শুধু ইন্টিগ্রিটি নয়, গোপনীয়তা রক্ষা হবে। স্ট্রাকচার্ড এবং নন-স্ট্রাকচার্ড ডেটার জন্য এভাবে কাজ করা যাবে। কোন সংস্থার কাছে ‘জাতীয় পরিচয়পত্র’, কোন সংস্থার কাছে তার

ব্যাংকের হিসেব, কারও কাছে ইমেইল অ্যাড্রেস, অথবা বাসার ঠিকানা টোকেনাইজ করা থাকবে, যাতে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ না হয়। তাই বলে কাজ হবে না সেটা নয়। এর পেছনের ডেটা ওই মুহূর্তের কাজের জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে কিছু টোকেন তৈরি করে দেবে, যাতে তার আসল তথ্য দরকার না হয়। সে যে ওই ব্যক্তি সেটা প্রমাণের জন্য ওই স্পর্শকাতর তথ্যের দরকার পড়বে না, সিস্টেমই তাকে শনাক্ত করে দিচ্ছে।

এআই: শুরুর ধারণা

কীভাবে এখানে এলাম?

তিনটা মজার গল্প।

লেগে থাকা

It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer.

—Albert Einstein

ক্যাডেট কলেজ লাইব্রেরি, ম্যান মেশিন

১৯৮৩ সালের কথা। ক্যাডেট কলেজে গিয়ে শুরুতে মন কিছুটা খারাপ হলেও পরে বিশাল একটা লাইব্রেরি দেখে মন ভালো হয়ে গেল। লাইব্রেরি ক্লাসের পাশাপাশি সময় পেলেই ছুটতাম বই ইস্যু করতে। অনেক বই একসঙ্গে ইস্যু করার ধারণাটা পেয়েছিলাম আদমজী স্কুলে পড়ার থেকে। মজার কথা হচ্ছে, লাইব্রেরির একটা বিশাল অংশজুড়ে ছিল ইংরেজি বইয়ের সংগ্রহ। এর মধ্যে প্রযুক্তি-বিষয়ক বইগুলো দেখছিলাম, হয় সেগুলো ‘এমআইটি প্রেস’ অথবা ‘ম্যাকগ্র হিলসের’। সেখানেই পেলাম একই সিরিজের তিনটা বই। ‘ম্যান মেশিন’। মানে মানুষ কীভাবে মেশিনের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ শুরু করেছিল সেটার কিছু স্ন্যাপশট দেখছিলাম ওই বইগুলোতে।

একটা মুভি, পাল্টে দিল সবকিছু

আগের বইয়ে কিছুটা লিখেছিলাম ব্যাপারটা নিয়ে। ছোটবেলার একটা মুভি ভয়ংকরভাবে দাগ কেটেছিল মনে। এর রেশ টেনে বেড়াচ্ছি এখনো।

মুভিটার প্রোটোগনিস্ট ছিল ‘হ্যাল’, একটা সেন্টিনেন্ট কম্পিউটার। ঠিক ধরেছেন, মুভিটার নাম ছিল ‘২০০১: আ স্পেস ওডেসি’। মানুষ আর ‘চিন্তা করতে পারা’ যন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন আমরা দেখেছি ওই মুভিটায়।

শত বছর ধরে ইন্টেলিজেন্ট মেশিনের খোঁজে মানুষের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা দেখছি অনেক কিছু। আয়রনম্যানের জার্নিস, টার্মিনেটর, নাইট রাইডারের ‘কিট’ পার্সোনালিটিগুলোর প্রতি আমাদের ব্যাকুলতা অথবা উৎসুক ভাব একটা পাওয়ারফুল আইডিয়া। যন্ত্র মানুষের মতো চিন্তা করতে পারছে কি, পারছে না অথবা চিন্তা করতে পারার মতো যন্ত্র তৈরি হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে মানুষ হাল ছাড়ছে না এই আইডিয়া থেকে।

উইলিয়াম গিবসনের ‘নিউরোমাসার’

২০ বছর আগের কথা। নিউইয়র্কে নেমেই চলে গেলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ‘ইউজড’ বুক স্টোর, স্ট্র্যান্ডে। তখনকার ব্র্যান্ডিং ছিল— তাদের কাছে যত বই আছে সবগুলো বই পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলে ৮ মাইল লম্বা বইয়ের সারি হবে। ‘এইট মাইলস অব বুকস’, এখন ২৫ মাইলে দাঁড়ালেও ডাউনটাউনের ব্রডওয়েতে এই বইয়ের দোকান এখনো মাথা খারাপ করার মতো। প্রথম দিনে ২২টা মতো বই নিয়ে এলেও পরের দিন সেই বইয়ের সংখ্যা এসে দাঁড়াল ৩৫-এ। সেদিন এক ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া উচ্ছল একটা মেয়ে (স্ট্র্যান্ডের কর্মচারী) এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল কোনো সাহায্য লাগবে কি না? সচরাচরের মতো মুখে স্মিত হাসি টেনে তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলাম। থ্যাক্স ইউ, আই অ্যাম গুড (থ্রুট নয়)। শূনে চলে গেল আরেক কাস্টমারের সাপোর্টে। আমিও ডুবে গেলাম বই পড়তে। শেষ করতে হবে কয়েকটা বই। সেদিনই। ওখানে বসে।

আসল কথা হচ্ছে, অনেক বই যেহেতু কিনতে পারব না, মানে বাংলাদেশে টেনে আনা সমস্যা বলে ওখানেই তিন-চার দিন বসে বেশ কিছু বই পড়ে ফেলতাম প্রতিদিন— ‘এলআইআর’ ধরে লং আইল্যান্ডে বন্ধুর বাসায় ফেরার আগে। দুই ঘণ্টা পর ওই মেয়ে এসে হাজির আবারও। কাহিনি কী? ‘এই বইটা তুমি দেখতে পারো, আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে।’ বইটা হাতে নিলাম। উইলিয়াম গিবসনের ‘নিউরোমাসার’।

সাইবারনেটিকস নিয়ে। সেই মেয়েটার সঙ্গে প্রায় কিছুদিন যোগাযোগ ছিল পরে, বিশেষ করে ওই বইটা নিয়ে, তবে সময়ের অভাবে যোগাযোগ রাখা হয়নি শেষে। আজকে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ নিয়ে যতটুকু আমার ধারণা হয়েছে, তার একটা ভালো স্টেপিংস্টোন ছিল সেই বইটা। একটা মাথা খারাপ করার মতো বই বটে।

বই বলে কথা

জাপান আমার পছন্দের একটা জায়গা, এই বইটার জন্য।

বুদ্ধ বাবার প্রশ্নের হাসি

প্রচুর কাজ হয়েছে দেশে, তবে সেটার গতি হয়তোবা আরেকটু বাড়ানো যেত। যতটুকুই কাজ করেছি সরকারি গণমুখী অংশে, আমার মনে হয়েছে আমাদের আরও অনেক কিছু দেবার ছিল, এই ৫০ বছরে। বাবার পাশে বসে যখন দেশের কিছু সাফল্যের কথা বলি, উনি প্রশ্নের হাসি হাসেন। আগে কিছু বলতেন, এখন খুব একটা বলেন না, মাথা নাড়ান। আমার তখন মনে হয়, উনার যে সুবিধাগুলো দরকার ছিল দেশ থেকে, সেগুলো দিতে পারিনি আমরা। এখন আর কিছু বলেন না, তখন মনে হয় উনার জীবদ্দশায় হবে তো ব্যাপারগুলো? সামাজিক নিরাপত্তার বৃদ্ধিভাতা, চিকিৎসা সেবা, বাসায় বসে বায়োমেট্রিক মোবাইল পেনশন, যা করে দিতে পারিনি উনাকে। সামান্য পেনশন পেতেই যে কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে উনাকে। ৫০ বৎসরে আমাদের প্রাপ্তি যা হবার কথা ছিল, সেটা হয়নি এখনো। সে কারণে এই নীতিনির্ধারণী আলাপ। আমাদের সমস্যাকে সমাধান করতে হবে আমাদের।

প্রবাসীদের সাহায্যের হাতছানি

দেশের বাইরে গেলেই খুঁজে বের করতাম বাংলাদেশিদের, জানতে চাইতাম কী করছেন জন্মভূমির জন্য। যারা প্রবাসে পড়ে আছেন, প্রতিমুহূর্তে উনাদের মন কাঁদে, ‘যদি কিছু করতে পারতাম দেশের জন্য’। তাদের অনেকেই বাইরে সাফল্য পেয়েছেন তবে— সেটার একটা বড়ভাগ দিয়ে দিতে চান দেশকে। প্রতিবছর উনারা দেশে আসেন, যদি আমরা তাদেরকে যোগ করে নিই আমাদের অর্থযাত্রায়? সেটা কি হয় সব সময়? আমরা কি নিতে পারছি উনাদের এক্সপার্টিজ?

কেন প্রয়োজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?

ঘিরে ফেলছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আমাদের অজান্তেই

যে একটা প্রযুক্তি অনেকটাই আমাদের অজান্তে সবাইকে ঘিরে ফেলছে, সেটা হচ্ছে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’। এককথায় বলা যেতে পারে, ‘প্রযুক্তি’কে শেখানো হচ্ছে একদম মানুষের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে। মানুষের দরকারে। যেমন, হেলথকেয়ার সিস্টেমে রোগীদের ঠিকমতো স্বাস্থ্যসেবা দেবার জন্য, মানুষের ভুল ‘ডায়াগনোসিস’ কমানোর জন্য। পাশাপাশি কোন স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টটা তাদের কাজে লাগছে, সেই ওষুধ রোগীর ওপর ব্যবহার না করে সিমুলেশনে ‘ড্রাগ ডিসকভারি’তে ব্যবহার হচ্ছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আজকে ‘কোভিড-১৯’-এর ড্রাগ ডিসকভারির পেছনে এই প্রযুক্তির সাপোর্ট অজানা নয়। সেটা না হলে এর সময় লাগত আরও অনেক বেশি। মহামারি নিয়ন্ত্রণে অনেক দেশই ব্যবহার করছে এই প্রযুক্তি।

দেশের প্ল্যানিং টুল

উন্নত দেশের সরকারগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে আরবান প্ল্যানিং, মাস ট্রানজিট সিস্টেম, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, বন্যার আর্লি ডিটেকশন, সরকারি রিসোর্সের সঠিক ডিস্ট্রিবিউশন এবং ব্যবহার, সামনের বছরগুলোতে পেনশনারদের কত টাকা দিতে হতে পারে (উদাহরণস্বরূপ), ক্রাইম প্রেডিকশন, শহরজুড়ে ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট- এর রকম হাজারো জিনিসে ব্যবহার হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ওয়ার গেমিংয়ে এর ব্যবহারের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীতে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের একটা ধারণা এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ২০১৪ সালে ‘তৃতীয় অফসেট স্ট্রাটেজি’ হিসেবে। ২০১৮ সালে পেন্টাগন ২ বিলিয়ন ডলার খরচ করার একটা প্ল্যান দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে।

ডেটা এবং উদ্ভাবনা

Using data in a new and collaborative manner will drive ideas, spur innovation, and solve important problems.

—Pradeep Belur, SBA Official

বাদ পড়ছে না কোনো সেক্টর

ব্যাপারটা এমন, আমরা হয়তোবা ধরতে পারছি না কীভাবে ঘটছে— তবে আমাদের আশপাশের সবকিছুই পাল্টে যাচ্ছে এই ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’র প্রভাবে। আমরা চাই বা না চাই, জিনিসটা ঢুকে গেছে সবকিছুর ভেতরে। সন্তর্পণে। যেভাবে আমরা দেখেছি, হেলথকেয়ার থেকে শুরু করে সরকারি কাজ, ট্রান্সপোর্টেশন ইন্ডাস্ট্রি, শিক্ষা— যারা যা করতে চাইছেন, তার সবকিছু সহজ করে দিচ্ছে এই জিনিস। এটা ঠিক যে অনেক বড় একটা ক্ষমতা আসছে মানুষের হাতে, সেটা বুঝতে পারছে খুব কম মানুষই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শুরুতে যেখানে মেশিনকে শেখাতে হয়, সেখানেই দরকার মেশিন লার্নিং। অন্য কথায় বললে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে অংশে যন্ত্রকে বুদ্ধিমত্তা শেখানোর প্রসেসই মেশিন লার্নিং।

সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল এবং এর সুষম ব্যবহার

বর্তমান প্রশাসন সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তাকৌশল নিয়ে কাজ করছেন। ওই কৌশলপত্রটি বিবেচনায় এনে এ সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের কীভাবে নিরাপত্তা প্রদান করা যায় সে নিয়ে অনেক কাজ শুরু হয়েছে। এখন একটা বড় সমস্যা হচ্ছে কীভাবে ওই সুবিধাবঞ্চিত মানুষটাকে খুঁজে আনা যায়, যার আসলেই সাহায্য প্রয়োজন? অনেক গবেষণা সংস্থার সঙ্গে কাজ করে বুঝতে পেরেছি এর জন্য প্রয়োজন ‘বায়াস’ ছাড়া অ্যালগরিদম। সেই ধারণায় আমরা প্রেডিক্ট করতে পারব— সামনে কার সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে।

‘এআই’ ফর সোশ্যাল গুড

পৃথিবীতে ‘এআই’ ফর সোশ্যাল গুড’ নিয়ে একটা বিশাল মুভমেন্ট চলছে ডেটাকে মানুষের কাজে ব্যবহারে। সেটার ব্যবহার নিয়ে এক্সটেনসিভ আলাপ হবে এই বইয়ে। মেশিন লার্নিং ব্যাপারটা জেনে রাখা ভালো। কারণ, এর ব্যবহার চলে আসছে প্রতিটা সেক্টরে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ স্কিলসেট।

‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ জিনিসটা কী?

যন্ত্রের শেখাটা বড় কথা

Intelligence is the efficiency with which you acquire new skills at tasks you didn't previously prepare for. Intelligence is not skill itself, it's not what you can do, it's how well and how efficiently you can learn new things.

—Francois Chollet

সাধারণ ধারণা, কিছু পয়েন্টার

প্রশ্ন হতে পারে, ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ জিনিসটা কী? এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলাম বেশ কয়েক দিন ধরে। আমার রিসার্চ বলে, এর ডেফিনেশনের ব্যাপ্তি অনেক বড়। একেক সেক্টর একেকভাবে বলছেন, এবং সবাই আবার নিজের জায়গায় ঠিক। সেদিক থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলি বরং।

ব্যাপারটা একটু কঠিন হলেও এর ধারণাটা বেশ সহজ। তার আগে আলাপ করা যেতে পারে বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন কীভাবে আমরা পাই? সরাসরি বলা যেতে পারে, যদি কারও ব্যবহারে আমরা বুঝতে পারি সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে আশপাশের ইনপুট থেকে, তাহলে আমরা বলতে পারি সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে। ছোটবেলায় পিঁপড়ার সামনে কোনো প্রতিবন্ধক রাখলে সে যখন সেটাকে পাশ কাটিয়ে যায় তখন আমরা বুঝতাম সে চোখ দিয়ে দেখে। অর্থাৎ আশপাশের (ডেটা) একটা ইনপুট থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। অর্থাৎ ডেটাকে সে ইন্টারপ্রেট করতে পারছে।

যন্ত্রের নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা

একটা যন্ত্রের নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হলে আমরা সেটাকে বুদ্ধিমত্তার একটা চিহ্ন হিসেবে বলতে পারি। একটা বুদ্ধির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। যেহেতু বুদ্ধিমত্তাটা কোনো জৈব বা ‘অর্গানিক’ মানে প্রাণী থেকে আসছে না, সে কারণে এটাকে সিন্থেটিক মানে ‘কৃত্রিম’ বুদ্ধিমত্তা বলা যেতে পারে। একটা অবস্ট্রাকল অ্যাভয়ডেন্স রোবটের সামনে একটা প্রতিবন্ধকতা দেওয়া হলে সেটাকে (নতুন ডেটা) দেখে নতুন করে সিদ্ধান্ত

নিয়ে গতিপথ পরিবর্তন করলে আমরা সেটাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলতে পারি।

ব্যাপারটা কি আসলেই সে রকম?

নিজেকেই প্রশ্ন করছি।

একটা যন্ত্র যখন তার আশপাশের ডেটা থেকে শিখে সেটা থেকে তার অ্যাকশন বা কাজকে ইন্টারপ্রেট করতে পারবে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কাজ বা সিদ্ধান্ত প্রেডিকশন করতে পারবে, তাহলে সেটাকে বুদ্ধিমত্তার একটা চিহ্ন বলতে পারি। ব্যাপারটা এমন যে সেই যন্ত্রকে সেই কাজটা করার জন্য আমরা ‘এক্সপ্লিসিট’ ভাবে প্রোগ্রাম করে দেইনি, বরং তাকে কিছু ডেটা দিয়েছি, সেই ডেটাকে সে পড়ে সেটা থেকে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বের করে নিয়েছে।

সনাতন প্রোগ্রামিংয়ের সঙ্গে কী পার্থক্য?

একটা সমস্যা নিয়ে আলাপ করি। পয়েন্ট ‘ক’ থেকে পয়েন্ট ‘খ’-তে পাঠাব আমাদের রোবটকে। সনাতন প্রোগ্রামিংয়ে আমরা যন্ত্রের প্রতিটা স্টেপ ডিফাইন করে দিতাম, যাতে সে শুরুর পয়েন্ট থেকে শেষ পয়েন্টে যেতে পারে। কিন্তু রোবটকে সেই পয়েন্টগুলোকে পাঠে দিলে তাকে নতুন করে প্রোগ্রামিং করে দিতে হতো নতুন রুলসেট দিয়ে। এর অর্থ হচ্ছে, যন্ত্র কিছু শিখছে না। আমরা যেভাবে রুলসেট ডিফাইন করছি, সে সেভাবে কাজ করছে।

মেশিন লার্নিং

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটা বড় অংশ হচ্ছে মেশিন লার্নিং, যন্ত্রের শেখার প্রসেস এবং যন্ত্র যা শিখছে, যেখানে যন্ত্রকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ডেটা, যেটাকে সে ইন্টারপ্রেট করে তার মতো করে কর্মপন্থা প্রেডিকশন করে নিচ্ছে। যন্ত্রের জন্য প্রোগ্রামিং হচ্ছে এই ডেটা, যা পাল্টাচ্ছে সময়ের সঙ্গে। পাল্টাচ্ছে ভেতরের রুলসেট। ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ হচ্ছে আমরা যা চাইছি যন্ত্র থেকে, আর মেশিন লার্নিং হচ্ছে এর একদম সেন্টার পিস, এটাকে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে।

সনাতন প্রোগ্রামিংয়ের সঙ্গে মেশিন লার্নিং একদম উল্টো কেন?

সনাতন প্রোগ্রামিংয়ে আমরা কী করি? আবারও ধরা যাক, আমাদের আগের রোবটকে পয়েন্ট ‘ক’ থেকে পয়েন্ট ‘খ’-তে যাওয়ার ইনস্ট্রাকশন

দিচ্ছি। প্রথমে শুরুর পয়েন্টের থেকে ৪৫ ডিগ্রি ডানে ঘুরাব, ২০ স্টেপ সামনে আগাতে বলব, আবার ৩০ ডিগ্রি বামে ঘুরাব, এরপর ১০ স্টেপ হাঁটালেই ‘খ’ পয়েন্টে পৌঁছে যাবে। একইভাবে নতুন নতুন ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে, যখন আমরা নতুন ‘ক’ এবং ‘খ’ পয়েন্ট দেব। এটা এক্সপ্লিসিট প্রোগ্রামিং।

মেশিন লার্নিং কি ঘটবে তাহলে?

যন্ত্রকে যখন আমরা কিছু ডেটা দেব, যাতে সে অনেক পয়েন্ট থেকে নতুন অনেক পয়েন্টে যাওয়ার ধারণা পায়। পুরোনো ডেটা যেখানে আগে একেকটা রোবট কীভাবে শুরুর পয়েন্ট থেকে শেষ পয়েন্টে গিয়েছিল। সেখানে সে ডেটা অ্যানালাইসিস করে বুঝতে পারবে প্রতিটা ডেটাতো, যেই পয়েন্ট থেকে নতুন কোনো পয়েন্টে যাক না কেন, প্রতিটা ক্ষেত্রে রোবট ডানে-বামে যেদিকেই যাক না কেন, তার শেষ পয়েন্ট থেকে শুরুর পয়েন্টের সব সময় দূরত্ব কমতে থাকবে।

এটা একটা প্যাটার্ন। তখন সে রোবটকে বিভিন্ন দিকে হাঁটিয়ে দেখবে কোথায় বা কোন দিকে গেলে তার দূরত্ব কমে আসে। এটাই তার আলটিমেট গোল। এরপর সেদিকে হাঁটতে থাকবে। মাঝখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা পড়লে তার জন্য নতুন ইনপুট সিস্টেমের প্রয়োজন পড়বে। মোদা কথা হচ্ছে, একই ডেটা নতুন একই ধরনের সমস্যার জন্য কাজ করবে, সনাতন প্রোগ্রামিংয়ের মতো প্রতিটা নতুন নতুন সিচুয়েশনের জন্য নতুন করে রুলসেট তৈরি করে দিতে হবে না।

মানে মেশিন শিখে গেল। কিছুটা ‘টিচিং হিম হাউ টু ফিস’। হয়তোবা সনাতন প্রোগ্রামিংয়ের মতো প্রতিটা সিচুয়েশনে যেভাবে কাজগুলো যত তাড়াতাড়ি বা ‘অ্যাকুরেট’ হবে, এখানে সেরকম তাড়াতাড়ি বা ‘অ্যাকুরেট’ না হলেও সে আস্তে আস্তে শিখে যাবে তার আসল কাজ। এরপর তাকে মঙ্গল গ্রহে পাঠালেও সে ঠিক ঠিক রাস্তা ধরে চলে আসবে।

এখন কয়েকটা প্রশ্ন এসেছে মাথায়। লিখতে লিখতেই মাথায় এল, বলি?

১. একটা বাচ্চা এবং যন্ত্রের শেখার মধ্যে পার্থক্য আছে কী?
২. এই শেখার মধ্যে গাইডেন্স দেবার সুযোগ কী আছে?
৩. ভুল শিখলে শোধরানোর উপায় আছে কী?

পেছনের ড্রাইভিং ফ্যাক্টরগুলো কী কী?

বিশ্বাস

A year spent in artificial intelligence is enough to make one believe in God.

—Alan Perlis

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পেছনে এত এক্সাইটমেন্ট, আকাশচুম্বী উচ্চাশা, বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট, এগুলোর পেছনে কী কী ফ্যাক্টর কাজ করছে? এটা বলে নেওয়া ভালো যে এই একই ধরনের ‘হাইপ’ তৈরি হয়েছিল ১৯৫০ এবং ১৯৭০-৯০ সালের দিকে। একটা ‘হাইপে’র পরে যখন ব্যাপারটা ঠিকমতো কাজ করে না, অর্থাৎ এই খাতে ইনভেস্টমেন্টগুলো যখন তার সুফল পায় না; সেটাকে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আমলে বলা হয় ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উইন্টার’, অর্থাৎ প্রচুর ‘হাইপ’ তৈরি হয়েছিল। তবে সেটা ঠিকমতো কাজ করেনি। এবারের ব্যাপারটা ভিন্ন। কেন?

প্রথমত, প্রচুর ডেটা

আমাদের হাতে এখন এত ডেটা, সেটা এক যুগ আগেও চিন্তা করতে পারিনি আমরা। আমাদের প্রতিটা ডিভাইস প্রতি সেকেন্ডে এত লগ জেনারেট করছে, এখন এগুলোই এখন আমাদের জন্য ট্রেনিং ডেটা। আজকে নতুন প্রযুক্তির ‘গুগল ট্রেন্ডিং’ জানার জন্য আইটেম হিসেবে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ এবং ‘মেশিন লার্নিং’ থাকলেও গত ১০ বছরে জয়জয়কার আইটেম ছিল ‘বিগ ডেটা’। এর অর্থ হচ্ছে, আমরা গত দশক ধরে প্রচুর ডেটা জমিয়েছি ভবিষ্যতের জন্য। কিছুটা বুঝে অথবা না বুঝে হোক, এই বিগডেটা কাজে লাগছে এখন। এর পাশাপাশি এই মুহূর্তে আরও প্রচুর ডেটা যোগ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এখন তো ক্লাউডের জয়জয়কার।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, যখন আমাদের হাতে প্রচুর ডেটা আসে, তখন সেটাকে কিছুটা ‘সেলফ লেবেলড’ ডেটা বলে মেশিন লার্নিং মডেলকে ট্রেন করতে পারি। ব্যাপারটা এমন যে এত এত ডেটা, মেশিন লার্নিং মডেল বিভিন্ন ধরনের ডেটাকে ক্লাস্টারিং করে— কোন ডেটা কিসের জন্য প্রয়োজ্য সেটাও বলে দিতে পারছি এখন। মেশিন লার্নিং মডেল আগেও ১৯৫০-৬০ সালের দিকে ছিল, তবে সেগুলো ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি ডেটার অভাবে।

এখন একটা সাধারণ অ্যালগরিদম অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখাতে পারছে শুধু প্রচুর ডেটার কারণে। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় মানে নিজের চোখে দেখছি ভালো প্রসেসর অথবা এর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড অ্যালগরিদম যতটা পারফরম্যান্স দেখাতে পারছে, তার থেকে অনেক বেশি অবিস্বাস্য আউটকাম দেখাচ্ছে যখন যোগ করছি প্রচুর ডেটা।

ডেটা স্টোরেজের সহজলভ্যতা

ডেটার পাশাপাশি প্রচুর ডেটা স্টোর করার ডিভাইসগুলোর দাম কমেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। পানির দামে সবাই কিনতে পারছে স্টোরেজ, তৈরি হচ্ছে বিশাল বিশাল স্টোরেজ এরিয়া নেটওয়ার্ক। আমার বাসায় কয়েকটা ‘নেটওয়ার্ক অ্যাটাচড স্টোরেজ’ বলে দেয় এর সহজলভ্যতা। মানে বাসায় আমরা তৈরি করতে পারছি নিজস্ব ক্লাউড। RAM-এর সহজলভ্যতাও আরেকটা দিক। পোর্টেবল স্টোরেজের দাম এবং এর ক্যাপাসিটি যথাক্রমে যেভাবে আনুপাতিকভাবে কমেছে এবং বাড়ছে, সেটা কিছু প্রমাণ করে এই ট্রেন্ডকে। এর পাশাপাশি ক্লাউড স্টোরেজের সহজলভ্যতা মানুষকে তার সব ডেটা ‘লোকাল’ হিসেবে না রেখে ক্লাউডে রাখার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে স্টোরেজের প্রসার।

ডেটাকে প্রসেস করার জন্য ‘স্পেশালাইজড’ প্রসেসর

গত কয়েক দশকে ‘মুরস ল’ ভেঙে সনাতন আর্কিটেকচার এতটাই পাল্টে গেছে, সেখানে প্রসেসিং স্পিড এখন পৌঁছে গেছে অন্য লেভেলে। প্রসেসিং স্পিড বাড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন কোর, মানে একটা প্রসেসরের মধ্যে অনেকগুলো আলাদা আলাদা কোর প্রসেসিংকে নিয়ে গেছে নতুন উচ্চতায়। আগে মেইনফ্রেম কম্পিউটার যেভাবে কাজ করত তার থেকে ভালো কাজ করতে পারছে অনেক সস্তা পার্সোনাল কম্পিউটার মিলে একেকটা ক্লাস্টার।

তবে আসল অ্যাডভান্সমেন্ট এসেছে বিশেষ করে ‘ডিপ লার্নিং’-এর ক্ষেত্রে, যেখানে আমরা হাইজ্যাক করেছি গেমিং ইন্ডাস্ট্রি। ডিপ লার্নিংয়ের জন্য যে ধরনের অংক দরকার, বিশেষ করে ‘ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন’-এ গ্রাফিক্যাল প্রসেসরের পারফরম্যান্স আমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। ভিডিও গেমসের জন্য শুরুতে এই গ্রাফিক্যাল প্রসেসর বা

‘জিপিইউ’ যেভাবে ব্যবহার হতো, সেখানে এই প্রসেসরগুলো ডিপ লার্নিংয়ের ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে।

কীভাবে সম্ভব?

Interest in AI boomed again in the 21st century as advances in fields such as deep learning, underpinned by faster computers and more data, convinced investors and researchers that it was practical—and profitable—to put AI to work.

—Driving impact at scale from automation and AI, McKinsey & Company

অ্যালগরিদমের কিছু বাড়তি ফিচার

আমরা মেশিন লার্নিং শিখতে প্রথমে যে জিনিসটা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি, সেটা হচ্ছে ‘অ্যালগরিদম’। সত্যি বলতে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য যে অ্যালগরিদমগুলো ব্যবহার করি তার খুব একটা পরিবর্তন আসেনি গত কয়েক দশকে। পৃথিবীতে বেসিক মানে আসল মেশিন লার্নিং/ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম এখনো হাতে গোনা যায়। তবে এর মধ্যে আমরা সেগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু চমৎকার ফিচার যোগ করেছি, যা সেই অ্যালগরিদমগুলোকে আলাদা মাইলেজ দিয়েছে। সেটার উদাহরণ হিসেবে ‘বাকপ্রপাগেশন’ নিয়ে আলাপ করলে বোঝা যায় এই ব্যাপারটা কতটুকু এগিয়ে দিয়েছে আমাদের ডিপ লার্নিংয়ের শেখাতে। ‘এরর কারেকশন’র জন্য এই ফিডব্যাক মেকানিজম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে এগিয়ে দিয়েছে অনেকখানি।

ফাইনালি আরেকটা বড় ব্যাপার কাজ করেছে, যেটাকে আমরা বলছি ‘ক্লাউড কমপিউটিং প্ল্যাটফর্ম’।

ক্লাউড কমপিউটিং প্ল্যাটফর্ম

আজকে ক্লাউড কমপিউটিং প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার এতই বেড়েছে যে যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো ব্যবহারকারী তার পছন্দমতো প্ল্যাটফর্ম (লিনাক্স, উইন্ডোজ, ইউনিক্স) ব্যবহার করে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ক্লাউড কমপিউটিং এনভারনমেন্ট তৈরি করতে পারে নিজের জন্য। একেবারে সব লাইব্রেরি ইনস্টলেশনসহ। এই সুবিধা ছিল না গত ১০ বছর আগেও। ফলে প্রচুর ডেটা এবং স্টোরেজের পাশাপাশি এ ধরনের ক্লাউড কমপিউটিং

প্ল্যাটফর্ম এত সুবিধা দিয়েছে, ফলে একজন রিসার্চার তার বাসায় বসে শুধু একটা ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তৈরি করতে পারছেন নিজস্ব এনভায়রনমেন্ট। এই একই কাজের জন্য তাকে আগে যেতে হতো বিশাল ল্যাবে।

ক্লাউড কমপিউটিং প্ল্যাটফর্ম বলতে অ্যামাজন, মাইক্রোসফট এবং আলিবাবা যেভাবে খুব সহজেই নিজস্ব ক্লাউড কমপিউটিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে দিচ্ছে সবাইকে, সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বেড়েছে হাজার গুণ। এত সহজে ক্লাউডে মেশিন কনফিগার না করা গেলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার হতো না। আগে জিপিইউসহ মেশিন তৈরি করব— না মেশিন লার্নিং মডেলের পেছনে সময় দেব? একেকটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে এত সময় নিলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পেছনে সময় দেব কখন? সময় একটা বড় ফ্যাক্টর যেকোনো কাজে।

এর পাশাপাশি ক্লাউড কমপিউটিং প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে হোস্টিং সাইটগুলোর সুপার ফাস্ট কানেকটিভিটি থাকায় আগে যেই ডেটাসেটগুলো নিজস্ব মেশিনে নামাতেই সময় লাগত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সেখানে গিটহাব থেকে আমার ক্লাউড কমপিউটিং মেশিনে ডাউনলোড করতে লাগে কয়েক সেকেন্ডের কম সময়। ডেটাসেট হোস্টিং এবং ক্লাউড কমপিউটিং প্ল্যাটফর্ম এই দুটোই ‘সুপার ফাস্ট নেটওয়ার্ক দিয়ে কানেক্টেড থাকায়, আমাদের ‘সুপার স্লো’ ইন্টারনেট এবং পিসিতে বসে এখন কাজ হচ্ছে শুধু কয়েক কিলোবাইটের কমান্ড পাঠিয়ে দেওয়া। ‘হোয়াট আ টাইম টু বি অ্যালাইভ!’

আমার নিজের ল্যাপটপে যেই মেশিন লার্নিং মডেলকে ‘ট্রেনিং’ করতে সময় নিতাম ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা, এর সঙ্গে ডেটাসেট ডাউনলোড করতে কয়েক দিন, সেই একই মডেল গিটহাব থেকে মিনিটে নামিয়ে মেশিন লার্নিং মডেল বানাতে লাগে আধা ঘণ্টারও কম। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এখানে খরচ অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম। আর তাই, মানুষ ক্লাউড কমপিউটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করবে না কেন? আর কেনই—বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়বে না?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুটো ‘অ্যাপ্রোচ’

কবে হবে?

Artificial intelligence will reach human levels by around 2029. Follow that out further to, say, 2045, we will have multiplied the intelligence, the human biological machine intelligence of our civilization a billion-fold.

—Ray Kurzweil

আচ্ছা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে এগোচ্ছে এই মুহূর্তে?

সত্যি বলতে, বুদ্ধিমত্তা জিনিসটাকে খালি চোখে দেখা যায় না— এই ব্যাপারটাকে বুঝাব কীভাবে?

আমাদের আশপাশের পশুপাখি থেকে মারো মারো বেশ কিছু ‘বুদ্ধিমত্তা’র আচরণ পাই। ব্যাপারটা এমন যে যেহেতু সেই পশুপাখিটা মানুষের স্কেলে অর্থাৎ মানুষের মতো করে কোনো জিনিসকে ‘মিমিক’ করছে, সে কারণে আমরা তাকে বুদ্ধিমান প্রাণী বলছি। জিনিসটা এ রকম যে সে মানুষের মতো করে আচরণ করছে, কিন্তু সে যদি তার মতো করে (সেই প্রাণীর গোত্রের মতো) কোনো কাজ করে, সেটা তার স্কেলে বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রথম বইয়ে বেশ কিছু আলাপ করেছিলাম।

কোনো কিছুর মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা আছে, সেটা তার কাজের আউটকাম অথবা তার ব্যবহারে (বিহেভিয়ার প্যাটার্নে) সেটা ফুটে ওঠে। তবে এই বুদ্ধিমত্তা যেখান থেকে বের হচ্ছে, সেটার উৎপত্তিস্থল আমাদের বা পশুপাখিদের মাথায়। আমাদের মাথায় এই বুদ্ধিমত্তাগুলো কীভাবে তৈরি হচ্ছে অথবা এর কাজ করার প্রসেসগুলো আমরা যেহেতু সরাসরি দেখতে পারছি না, সে কারণে এই বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কাজ করছে, সেটার ব্যাপারে আমরা এখনো অনেক কিছুই জানি না। আমরা জানি, মাথার নিউরনের ভেতর ইলেকট্রনিক পালস দিয়ে ব্যাপারগুলো ঘটে, তবে এর ‘ইন্টারনাল’ গল্পগুলো আমাদের কাছে এখনো অজানা।

এটা একটা বড় সমস্যা। তাহলে একজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রিসার্চার কীভাবে একটা ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেম তৈরি করবেন, যার আউটকাম আমাদের বা পশুপাখির সেই কাজের মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে? এ ব্যাপারে পড়ছিলাম

মাইক উলরিজের একটা লেখা। বিশেষ করে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’র কয়েকটা রাস্তা নিয়ে। লেখাটা আমার পছন্দ হয়েছে। কারণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বর্তমান ট্রেন্ডের বেশ কিছু ধারণা এখানে এসেছে। উনি যে দুটো রাস্তা নিয়ে আলাপ করেছেন, তার মধ্যে একটার উত্থান আমার চোখের সামনে হচ্ছে প্রতিদিন। কাজের রেজাল্ট অসাধারণ। উত্থানটা বেশ ভয়ানক।

উদাহরণ দিলে জিনিসটা পরিষ্কার হবে ভালো। মনে আছে মেশিন ট্রান্সলেশনের কথা? ধরুন, আমরা একটা প্রোগ্রাম তৈরি করব, যেটা বাক্যগুলোকে ইংরেজি থেকে বাংলায় ট্রান্সলেট করবে। এই কাজগুলো আগেও করেছে মানুষ, তবে সেগুলোর আউটপুট শুধু ধীরগতির ছিল না, বরং সেই আউটপুট নিয়ে আমরা এখনো মাঝেমাঝে মজা করি। অক্ষর থেকে অক্ষরে ট্রান্সলেশন অনেকটাই ঠিক থাকে, তবে যখন সেটা বাক্যে রূপান্তর হয়, তখন সেটার ভেতরের অর্থ বা ভাব মাঝেমাঝে পাটে যায়।

মেশিন ট্রান্সলেশন

এই মেশিন ট্রান্সলেশন এই দশকের একটা বিশাল আবিষ্কার, যেটাকে আমরা একটা মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করি। তাহলে এই ‘মডেল বেইজড অ্যাপ্রোচটা কী হতে পারে? আমাদের ফাইনাল আউটকাম মানে এই মেশিন ট্রান্সলেশন থেকে যেই ধরনের ব্যবহার অথবা তার উত্তর পেতে চাইছি, সেই মডেলটাকে তৈরি করে আমরা দিয়ে দিই যন্ত্রকে, যাতে সে সরাসরি সেটাকে ব্যবহার করতে পারে। আমরা যদি এখানে ইংরেজি থেকে বাংলায় ট্রান্সলেশনের কথা বলি, তাহলে এখানে যে মডেলগুলো ব্যবহার হবে তা ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার আলাদা আলাদা করে মডেল দুটো ব্যবহার করবে।

কীভাবে ট্রান্সলেশন করছে মেশিন?

ব্যাপারটা না বোঝারই কথা। আরেকটু খোলাসা করি। আমাদের বাক্যের স্ট্রাকচার, যেটাকে আমরা সিনট্যাক্স বলছি, সেটার মধ্যে ইংরেজি ও বাংলার ব্যাকরণগত ধারণা আগে থেকে তৈরি করা থাকে। ইংরেজির জন্য এখানে একধরনের সিনট্যাক্স এবং বাংলার জন্য সেটা অন্য ধরনের হবে, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা এই সিনট্যাক্স ব্যবহার করে একটা বাক্যের (যেটাকে আমরা ট্রান্সলেশন করছি) তার স্ট্রাকচারটা বের করার চেষ্টা করব আগে। ফলে সেই স্ট্রাকচার থেকে আমরা ওই বাক্যের একটা ভাবার্থ পেয়ে যাব, যেটাকে আমরা ‘সিমান্টিকস’ বলি। এটা অর্থের লিঙ্গুইস্টিকস এবং লজিকের একটা সমন্বিত ভাব। আমরা যখন ভেতরের

ভাবার্থ অর্থাৎ ‘ইনার মিনিং’ পেয়ে যাচ্ছি, তখন আমরা সেই টার্গেট ল্যাংগুয়েজ (ধরুন বাংলা) মডেলে ফিরে গিয়ে নতুন করে কাছাকাছি একটা বাক্য তৈরি করব, যার অর্থ ইংরেজির প্রায় কাছাকাছি হবে।

বিশাল সমস্যা তাই না? এক লাইনে বলতে গেলে, আমরা শুরুতে একটা মডেল তৈরি করব, যেই কাজটা আমরা আউটকাম (ইংরেজি থেকে বাংলা ট্রান্সলেশন) হিসেবে পেতে চাই। এরপর সেই মডেলটাকে পাঠিয়ে দেব যন্ত্রের কাছে, যাতে সে নতুন ভাষার ব্যাকরণের নীতি বুঝে মোটামুটি কাজটা বের করে দিতে পারে।

মাইক উলরিজ ব্যাপারটাকে এমন চমৎকারভাবেই বর্ণনা করেছেন। কারণ, আমি যখন উনার এই অংশটুকু পড়ছি তখন একই জিনিস ‘রেজোন্যান্স’ হচ্ছে আমার মনের ভেতরে। কারণ, এই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং যেমন বৈজ্ঞানিক, সেভাবে অনেকখানি হেঁয়ালি বটে। আমরা যখন যন্ত্রকে একটা ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব, তখন তার মধ্যে মানুষের হেঁয়ালি বা অনেক ধরনের ‘অস্পষ্ট’ ‘ঝাপসা’ অর্থের জিনিসপত্র দিতে পারব না।

মানুষের হেঁয়ালি

আমি যন্ত্রকে যাই প্রশ্ন করি না কেন, সে হয়তোবা কখনোই আমাকে ‘আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই/আই অ্যাম নট সিউর’ ধরনের উত্তর দেবে না। এগুলো মানুষই করতে পারে। যন্ত্র হাজারটা নাটক পড়ে আরেকটা শেক্সপিয়ারের মতো নাটক লিখলেও সেটাকে মানুষের মতো হেঁয়ালি লেভেলে নেওয়ার আশঙ্কা বেশ কম। আমরা অনেক ধরনের শব্দের ব্যবহার করি, যেটার শাব্দিক কোনো অর্থ নেই, সে ধরনের শব্দগুলো যন্ত্র চাইবে না ব্যবহার করতে। মজা করার জন্য হলে হয়তোবা ঠিক আছে।

ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের আগের ঘটনা

আগের ধারণায় ‘ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং’ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের ব্যাকরণের যে নীতিমালা আছে, সেই নীতিমালা অনুযায়ী আমাদের বাক্য থেকে একটা অর্থের স্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে শুরুতে। এর পাশাপাশি সেই আগের অর্থ দিয়ে কীভাবে একটা বাক্য ‘জেনারেট’ করতে হবে, সেই রুলসেট বা নীতিমালাগুলোকে শেখাতে হবে মডেলকে। গত দশকে রিসার্চাররা এই রুলসেট নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কীভাবে একটা বাক্যের স্ট্রাকচার এবং এর সঙ্গে তার ভাবার্থ ‘ইনার মিনিং’ ‘ইন্টারনালি’ ম্যাপিং করা যায়।

এটার আউটকাম আমরা দেখেছি, যা অনেকটাই কার্যকরী, তবে ‘ট্রান্সলেটেড’ একটা প্যারাডক্স পড়লে মনে হয় এটা কোনো মানুষ লেখেনি। হয়তোবা এই স্টাইলে মানুষের মতো করে অ্যাকুরেসি আনা বেশ কঠিন হবে। আমি মানুষ হয়েই অনেক সময় কবিতার ভেতরের অর্থ বুঝতে পারি না, সেখানে যন্ত্রের জন্য ব্যাপারটা কঠিনই বটে। উচ্চমার্গের কবিতা এবং গল্পগুলো এত প্যাঁচানো থাকে, যেখান থেকে তার ভেতরের অর্থ বের করা কঠিনই এই রুলসেটের ব্যাকরণের স্ট্রাকচার দিয়ে।

স্ট্যাটিসটিক্যাল মেশিন ট্রান্সলেশন

তবে ব্যাপারটা একটা বিশাল নাটকীয় মোড় নেয় যখন ‘স্ট্যাটিসটিক্যাল মেশিন ট্রান্সলেশন’ কনসেপ্টটা রিসার্চারদের কাছে চলে আসে। এই রাস্তার মজা হচ্ছে এখানে ভাষার ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের ভেতরে ঢুকতে হচ্ছে না কাউকে। বরং, আমরা এখানে হাজারো/কোটি বাক্যের উদাহরণ পাঠিয়ে দেব যেই বাক্যগুলোকে আমরা ‘ট্রান্সলেট’ করার চেষ্টা করছি। বুঝতেই পারছেন, আমরা এখানে ‘প্রোবাবিলিটি’ মানে কোনটা বেশি ব্যবহার হয়েছে, সেগুলোকে ব্যবহার করব সেই স্ট্যাটিসটিক্যাল মডেল থেকে, যেখানে সেই স্পেসিফিক ট্রান্সলেশনে এই ধরনের বাক্যগুলোকে অন্যান্য সময় কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

ঝামেলা মনে হচ্ছে? এর পেছনের গল্পটা খুবই সোজা। কারণ, আমরা যখন হাজার, লাখ অথবা কোটি উদাহরণ ব্যবহার করব এই ব্যাপারটাতে, তখন সেই বাক্যের স্ট্রাকচারটা অন্যান্যবার কীভাবে ব্যবহার করেছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে কোন কোন শব্দগুলোকে কোনটার আগে পরে লাগালে তার প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া শব্দগুলোকেই এই ‘স্ট্যাটিসটিক্যাল মেশিন ট্রান্সলেশন’ ব্যবহার করবে বেশি।

বাচ্চাদের ভাষা শেখা

একটা উদাহরণ দিই বরং। আমাদের বাচ্চাগুলো কোন ধরনের ব্যাকরণ জানা ছাড়াই [মানে স্কুলে না গিয়ে] পুরো বাক্য বলতে পারত। কীভাবে? জন্মের পর থেকে বাবা, মা, আত্মীয়দের থেকে হাজারও শব্দ শুনে সেটার একটা ধারণা তৈরি করে নেয় নিজে নিজে। কোন শব্দের পর কোন শব্দ বসবে, সেটা নিয়ে মাথায় জোড়া লাগাতে থাকে আস্তে আস্তে। একপর্যায়ে

কী বললে বাবা-মা খুশি হয়, সেটাও বের করে ফেলে সে। এই কাজটাই স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন।

স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন

এটা ঠিক যে এই কাজে প্রচুর ডেটা এবং কম্পিউটিং ক্ষমতা লাগছে বিশেষ করে এ ধরনের ‘স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন’ তৈরি করার জন্য। যেহেতু ‘ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং’ নিয়ে কাজ করছি (একটা বই লিখেছি এর মধ্যে), সেখানে দেখছি ‘ওপেন এআই’-এর জিপিটি-৩ এর ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এ মুহূর্তে প্রায় ১৭৫ বিলিয়ন প্যারামিটার ব্যবহার করছে। এ ধরনের ‘স্ট্যাটিসটিক্যাল মেশিন ট্রান্সলেশন’ রিসার্চের নতুন একটা অংশে বিশাল একটা ধারণা দিচ্ছে, যার কারণে এই একই ধারণা চলে যাচ্ছে অন্যান্য এরিয়াতে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অন্য লার্নিংগুলোর মধ্যে ‘ডিপ লার্নিং’য়ে এই কাজটা অসাধারণভাবে রেজাল্ট দিচ্ছে। ‘ডিপ লার্নিং’ নিয়ে আমার লেখা আরেকটা বইয়ে এ ব্যাপারে অনেক উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই দুটো রাস্তার মধ্যে এই মুহূর্তে ছোটখাটো কাজের জন্য প্রথম অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে। আমি বলব, এটা অনেকটাই ‘ট্রান্সপারেন্ট’। কারণ, আমরা জানি মডেলের ভেতরে কী হচ্ছে। তবে পৃথিবী যেভাবে কমপ্লেক্স হচ্ছে এবং একই সমস্যা যখন বিভিন্ন ডাইমেনশনে পাড়ি দিচ্ছে, তখন এই কমপ্লেক্স ধরনের কাজগুলো এত সহজে করা সম্ভব হয় না।

কোটি উদাহরণ থেকে মডেলের শেখা

আর সে কারণেই আমরা ব্যবহার করব দ্বিতীয় অ্যাপ্রোচ, যেখানে আগের মডেলের কোনো বালাই নেই, বরং কোটি কোটি উদাহরণ থেকে মডেল শিখে নেবে তাকে কী করতে হবে। সিচুয়েশন ডিপেনডেন্ট। এ ব্যাপারে প্রচুর কাজ চলছে তবে এর সবচেয়ে বড় লিমিটেশন হচ্ছে ডেটার ওপর বেশি নির্ভরতা মানে ডেটার নয়জ তার অনাকাঙ্ক্ষিত ‘বায়াস’ তৈরি হতে পারে। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, এই মডেল মানুষের চেয়ে ভালো কাজ করবে। তবে এটা থেকে জানার উপায় নেই কীভাবে সে এই কাজগুলো করছে ভেতরে-ভেতরে। মডেলের ভেতরে কোটি কোটি ‘সংখ্যা’র খেলা দেখে মানুষের বোঝার উপায় নেই মডেলটা কীভাবে ‘ইন্টারনালি’ কাজ করছে।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি মডেল কীভাবে কাজ করছে, সেটা জানতে চাই, নাকি মডেলের অসাধারণ পারফরম্যান্স আউটকাম নিয়ে খুশি থাকব? পরের প্রশ্ন, দুটো জিনিস কি একসঙ্গে পাওয়া সম্ভব? বোধ হয় না। তবে, এই অজানা ব্যাপারগুলো নিয়ে আসব সামনে।

টেস্টবুকের কিছু ডেফিনিশন

সঠিকতা এবং আদর্শ-র‍্যাশনালিটি, যৌক্তিকতা

A system is rational if it does the right thing.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ঠিকমতো এন্ড টু এন্ড ‘ডিফাইন’ করতে গেলে এর একটা সিঙ্গেল ডেফিনিশন পাওয়া অসম্ভব। বরং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আরও অন্যান্য ফ্যাক্টর এবং অনেক অনেক ডেফিনিশন দেখে একটা বড় ডেফিনিশন বের করার চেষ্টা করা যায়। শুরুতে পুরো জিনিসটাকে দুই ডাইমেনশনে নিয়ে আসা যায়। নিচের টেবিলটা দেখুন। ওপরের দিকে যা পুরো জিনিসটাকে চালাচ্ছে, সেটার একটা হচ্ছে আমাদের চিন্তা করার প্রসেস, যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ‘থট প্রসেস’ এবং যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া, ইংরেজিতে ‘রিজনিং’ বললে আরও পরিষ্কার হতে পারে।

সেদিক থেকে নিচের দিকে আমরা যেকোন জিনিসের ‘আচরণ’ এবং মানুষের সেই কাজের আউটপুট মেলাই তাহলে কোন কাজটা ‘সঠিক’ এবং কোনটা ‘আদর্শ’ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, সেটার একটা সংযোগস্থল হতে পারে ‘র‍্যাশনালিটি’ মানে সেই ব্যাপারটার ‘যৌক্তিকতা’। মানুষ যা করে সেটাকে আমরা যেভাবে সঠিকভাবে ধরে নিই না, সেখানে একজন মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে তার আউটপুট কী হতে পারে, সেটার একটা ধারণার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। মানুষের কাছ থেকে আমরা যৌক্তিকতা আশা করি, তবে সেখানে একটা টেনশন কাজ করে। সব মানুষ কি যৌক্তিক, সঠিক বা আদর্শ সিদ্ধান্ত নিতে পারে? তাহলে তো সবাই একই ধরনের সাফল্য পেত। এর পাশাপাশি মানসিক বিকারগ্রন্থদের কী বলা যেতে পারে? ব্যাপারটাকে একটা ফ্রেমওয়ার্কে ফেলে দেখি।

মানুষের মতো	যৌক্তিকভাবে যেটা হতে পারে
যন্ত্র/সিস্টেম যেটা মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে,	যন্ত্র যেটা যৌক্তিকভাবে চিন্তা করতে পারে
যন্ত্র যা মানুষের মতো কাজ করতে পারে	যন্ত্র, যেটা যৌক্তিকভাবে কাজ করতে পারে

আপনার পয়েন্টটা নিয়েছি। যন্ত্রের মানুষের মতো চিন্তা করতে পারা এবং যন্ত্রের যৌক্তিকভাবে চিন্তা করতে পারাটার মধ্যে ফারাকটা কোথায়? মানুষের চিন্তা অর্থাৎ রিজনিংয়ের মধ্যে কিছু সিস্টেমেটিক ভুল থাকতে পারে, তবে সেটা ‘আদর্শ’গত বুদ্ধিমত্তা থেকে কত দূরে? সেজন্যই এই ব্যবস্থা। তবে এটাকে ঠিকমতো ডিফাইন করতে আরও একটু কাজ করে নিচের ছবিটা দেখতে পারি চারটা ডাইমেনশনে। এটার গল্পটা আসছে স্টেপ বাই স্টেপ।



চিত্র ২: চার ডাইমেনশনে, আর্ট ডেফিনেশন

চার ডাইমেনশনে, আট ডেফিনেশন

যে যাই বলুক, আমার সবচেয়ে পছন্দের ডেফিনেশন দিয়েছেন ‘রাসেল ও নরভিগ’^৮ সেই ২০১৬ সালে। ভালোভাবে বলতে গেলে এটা আটটা ডেফিনেশনকেই নিয়ে আসা হয়েছে চারটা ডাইমেনশনে। কমপ্লেক্স লাগছে? শুরুতে দেখি চারটা ডাইমেনশনে কী দেখাচ্ছে?

চারটা ডাইমেনশন

১. মানুষের মতো চিন্তা করতে পারা
২. যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করতে পারা
৩. মানুষের মতো কাজ করতে পারা
৪. যুক্তিযুক্তভাবে কাজ করতে পারা

মানুষের মতো চিন্তা করতে পারা

প্রথম চার ভাগের শুরুর অংশে, যেটাকে আমরা বলছি ‘মানুষের মতো চিন্তা করতে পারার’ ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে যন্ত্র কীভাবে চিন্তা করতে পারে। যন্ত্রের চিন্তাধারার আকার কী ধরনের হতে পারে? এরপরের অংশে ব্যাপারটাকে এমনভাবে ভাগ করেছি, যাতে যন্ত্র মানুষের মতো করে চিন্তা করতে পারছে কি না সেটা দেখার চেষ্টা করব। মানুষের চিন্তা করার কিছু আউটকাম দেখলে বোঝা যাবে যন্ত্র সেটা পারছে কি না।

মানুষ কীভাবে চিন্তা করে?

চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, সমস্যার সমাধান

[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning... (Bellman, 1978).

মানুষের চিন্তা করতে পারার ধারণার পাশাপাশি মানুষ কীভাবে সমস্যার সমাধান করে, তার থেকে বড় জিনিস হচ্ছে মানুষ কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় সেই ব্যাপারগুলোকে যন্ত্রতে আমরা পাঠাতে পারছি কিনা। ব্যাপারটা কনফিউজিং হয়ে গেল? এখন আমরা বলতে পারি, ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

৮. দেখতে পারেন এখানে, <https://www.amazon.com/Artificial-Intelligence-A-Modern-Approach/dp/01346>

প্রাথম কীভাবে মানুষের মতো করে চিন্তা করতে পারে’, সেটা বের করতে গেলে আমাদের আগে জানতে হবে কীভাবে মানুষ চিন্তা করে? সেই চিন্তা করার প্রসেস ফ্লো কীভাবে কাজ করে?

সেটা বের করতে গেলে মানুষের চিন্তাধারণার ব্যাকগ্রাউন্ডে কী চলছে, এর পাশাপাশি বাস্তবে কী হচ্ছে এবং সেই পুরো ঘটনাকে আমাদের মস্তিষ্ক কীভাবে সামনে-পেছনে করে ইমেজিং করছে, সেটা জানলে এই ব্যাপারটাকে ডিফাইন করা অনেক সহজ হবে। তবে এই ক্যাটাগরিটা পুরোটাই জ্ঞানভিত্তিক কগনিটিভ মডেলিং অ্যাথ্রোচ। আমার দেখা সেরা ডেফিনেশন এই ক্যাটাগরিতে দিয়েছেন ‘রাসেল ও নরভিগ’, সেটাকে তুলে দিচ্ছি কোটেশনে।

ইনপুট থেকে আউটপুটের আচরণের পার্থক্য

If the program’s input/output behavior matches corresponding human behavior, that is evidence that some of the program’s mechanisms could also be operating in humans.

যন্ত্রের ইনপুট এবং আউটপুটের প্যাটার্ন যদি মানুষের আচরণের মতো হয়, তাহলে ওই যন্ত্রের ভেতরের কিছু মেকানিজম মানুষের মতো চলছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এর মানে কী? সহজ কথায়, মানুষের আচরণকে ম্যাপ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে যেকোনো অ্যালগরিদমের দক্ষতা নিরূপণে।

যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করতে পারা

মানুষের চিন্তাভাবনা কী সব সময় একদম যৌক্তিক হবে? যখন যৌক্তিক হবে সেটা আইডিয়াল মানে ‘আদর্শ’ পজিশন থেকে কত দূরে হতে পারে? এই একই জিনিস মানে যন্ত্রের কাছে যৌক্তিকতা আশা করা যায়? আমার ধারণা পাওয়া যাবে। কারণ, ঠিকমতো প্রাথম করলে যন্ত্রের ‘বায়াস’ কমে আসবে। আমাদের সেটাই চাওয়া।

এই ক্যাটাগরির ডেফিনেশন নিয়ে আলাপ করতে গেলে যন্ত্রের যৌক্তিকতা অর্থাৎ যন্ত্রের ‘র‍্যাশনাল’ চিন্তাভাবনা নির্ভর করবে যন্ত্র কীভাবে একটা তথ্যকে ‘পারসিভ’ মানে উপলব্ধি করে সেটার ওপরে জাজমেন্ট/সিদ্ধান্ত দেবে, সেটা দেখতে হবে আগে। এর পাশাপাশি জিনিসটার ‘রিজনিং’ অংশ, যাকে আমরা বলছি কেন সে এই সিদ্ধান্ত নিল অথবা বাকি সিদ্ধান্তগুলো

নিল না, সেটা বুঝে নিতে হবে তখন। কারণ, সেটার রেজাল্ট দিয়ে যন্ত্র করবে কাজ। পুরো জিনিসটা ‘এন্ড টু এন্ড কানেক্টেড’।

ধরতে পারা, রিজনিং, কাজ করা

The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act’ (Winston, 1992).

অ্যারিস্টোটেলের বিখ্যাত ‘ধারণার নীতিমালা’ (ল’স অব থটস)

এখন বড় একটা প্রশ্ন হতে পারে, মানুষ কীভাবে যৌক্তিকতার ভেতর থেকে মানুষের রিজনিং বের করতে পারে? এখানে আমরা দার্শনিক অ্যারিস্টোটেলের বিখ্যাত ‘ধারণার’ কিছু নীতিমালা নিয়ে আলাপ করতে পারি।

উনি আসলে মানুষের চিন্তাভাবনার প্রসেসকে একটা ওয়ার্ক-ফ্লোতে ফেলতে চেয়েছেন। এই নীতিমালাগুলো বহু বছর ধরে দর্শন এবং লজিকের সূত্র হিসেবে চলে আসছে। সাধারণত এই নীতিমালাগুলোকে প্রতিটা মানুষের চিন্তাধারার পাশাপাশি তার আলাপ-আলোচনা, অথবা কী ধরনের চিন্তার ফলাফল হিসেবে তার কাজের আউটপুট আসছে এবং সেগুলোর মধ্যে একটা কানেকশন/সম্পর্ক, সেটাকে ঠিকমতো ডেলিভারি করতে পারলেই এই লজিকগুলো মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে যাবে।

১৯৯৯ সালের ‘কেমব্রিজ ডিকশনারি অব ফিলোসফি’ বলছে, চিন্তাধারার এই নীতিমালা অনুযায়ী ঠিক ধারণাগুলোকে সামনে নিয়ে যদি সেগুলোর অনুমানকে ন্যায্যতা মানে ঠিক বলে মতবাদ দেয়, তাহলে সব ধারণা একে অপরের সঙ্গে কানেক্টেড। এই চিন্তার নীতিমালাগুলো এমন নিয়ম, যা কোনো ওই কানেক্টেড বিষয় সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ধারণা ছাড়াই কাজ করতে পারে; তখন কখনো কখনো এই নীতিমালাগুলোকে যুক্তির ‘অবজেক্ট’ বলা হয়। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? আমারও তা-ই। একটা উদাহরণ দিই বরং।

অ্যারিস্টোটেল একজন মানুষ, প্রতিটা মানুষ মরণশীল; এর মানে, অ্যারিস্টোটেল অবশ্যই মরণশীল।

অ্যারিস্টোটলের এই আইডিয়াগুলোর পাশাপাশি আরও অনেক ধারণা আছে, যেগুলো কাজ করছে রোডম্যাপ হিসেবে— বিশেষ করে মানুষের মন কীভাবে কাজ করে, সেটা বুঝতে। বুঝতেই পারছেন এই সবকিছুকে আমরা ‘লজিক’ বলি। আমরা যদি এখন এই ধরনের লজিকগুলো ব্যবহার করে যন্ত্র তৈরি করি, যা আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবে, তাহলে এই ডেফিনেশন অনুযায়ী যন্ত্রগুলোকে বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে।

মানুষের মতো কাজ করতে পারা

মানুষের মতো কাজ

The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people.

—Kurzweil, 1990

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই সংজ্ঞায় আমরা দেখব যন্ত্র কীভাবে মানুষের মতো করে কাজ করতে পারে। এখানেই চলে আসবে ‘টুরিং টেস্ট’, যা এরপরের চ্যাপ্টারে আলাপ করা হয়েছে। ‘টুরিং টেস্ট’ এর অর্থ হচ্ছে মানুষ ও যন্ত্রকে পাশাপাশি রেখে তাদের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদান করা যায়— তাহলে সেই মানুষ ও যন্ত্রের উত্তরে ফারাক না পাওয়া গেলে সেই যন্ত্রকে মানুষের মতো বুদ্ধিমান হিসেবে ধরে নেওয়া হবে।

‘রাসেল ও নরভিগ’ (২০১৬:২) বলছেন, যদি কোনো যন্ত্র ‘টুরিং টেস্ট’ পাস করে থাকে, তাহলে সেই যন্ত্রের নিচের চারটা মানবিক ক্ষমতা থাকতে হবে:

চার মানবিক ক্ষমতা

১. ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং: এতে যন্ত্র মানুষের ভাষায় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। আমাদের আশপাশের অনেক ধরনের যন্ত্র এই কাজগুলো শুরু করেছে, যেমন সিরি, এলেক্সা অথবা ‘ওকে গুগল’ ইত্যাদি।
২. জ্ঞানকে ঠিকমতো রিপ্রেজেন্ট করতে পারা: এই ক্ষমতা যে কোনো যন্ত্রকে তার আগের সক্ষমতা মনে রাখতে পারবে এবং তাকে নতুন তথ্য দেওয়া হলে সেটাকে সে তাৎক্ষণিকভাবে প্রসেস করতে পারবে।
৩. স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া: এই পদ্ধতিতে একটা যন্ত্র তার ভেতরের তথ্যপ্রবাহ অনুযায়ী নিজে থেকেই সিদ্ধান্তে আসতে

পারবে। যেমন, সেলফ ড্রাইভিং কার, এই অ্যালগরিদম রাস্তায় নেমে কোথায় কীভাবে যেতে হবে তার কাছে জমা তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৪. মেশিন লার্নিং: এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা মেশিন নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং সেই প্যাটার্ন থেকে নতুন কাজের ধারা বুঝতে পারে। পরিস্থিতি বুঝে কাজ করবে সে।

মানবিক ক্ষমতা: যুক্তিযুক্তভাবে কাজ করতে পারা

যুক্তিযুক্ত কাজ

Computational intelligence is the study of the design of intelligent agents.

—Poole, Mackworth & Goebel, 1998

এই শেষ সংজ্ঞাতে যন্ত্রের কাছ থেকে যুক্তিযুক্ত ব্যবহার আশা করা হচ্ছে। একটা যুক্তিযুক্ত এজেন্ট সব সময় চেষ্টা করবে তার আশপাশের তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে ভালো ফলাফল কীভাবে নিয়ে আসা যায়? একটা ‘সেলফ ড্রাইভিং’ কার যদি সামনে হঠাৎ করে দুই ধরনের অবজেক্ট পায়, তাহলে সে কী করতে পারে? আমরা ধরে নিচ্ছি, সামনের দুটো অবজেক্টের মধ্যে একটা গাছ এবং আরেকটা প্রাণী। সেই মুহূর্তে এই ‘অটোনমাস’ গাড়িটা কি সিদ্ধান্ত নেবে? এখানে যুক্তিযুক্ত হিসেবে ওই সময়ের আশপাশের তথ্যের ভিত্তিতে যা করা উচিত, যন্ত্রকে সেটা করতে পারতে হবে।

অ্যালান টুরিং টেস্ট

যন্ত্র কি চিন্তা করতে পারে?

I propose to consider the question, ‘Can machines think?’

—A. M. Turing

যন্ত্র কি বুদ্ধিমান আচরণ করতে পারে?

সায়েন্টিস্টদের মধ্যে প্রথম ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ অর্থাৎ মেশিন চিন্তা করতে পারে কি না, সেই ব্যাপারটা নিয়ে তোলপাড় শুরু করেছিলেন যে কয়েকজন, তাদের মধ্যে অ্যালান টুরিং অন্যতম। ‘ইমিটেশন গেম’ মুভিটা

দেখলেই বোঝা যাবে এই গল্পের পেছনে কী হয়েছিল আসলে। এই ব্রিটিশ সায়েন্টিস্ট যখন কম্পিউটারের মতো একটা (বড় বড় রোটেটিং হুইল নিয়ে) জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন ১৯৩০ সালের দিকে, তখন উনি হয়তোবা চিন্তা করছিলেন, কম্পিউটার কি কখনো বুদ্ধিমান হতে পারবে?

এরপরের ধাপ দেখলাম ১৯৫০ সালের দিকে। উনি একটা জার্নাল^৯ পাবলিশ করলেন, কিছুটা সংশয় নিয়ে, যার মূল প্রশ্ন হচ্ছে মেশিন আসলে চিন্তা করতে পারে কি না? পেপারটার নাম হচ্ছে ‘কমপিউটিং মেশিনারি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স’। গুগল করে দেখতে পারেন। ওই ব্যাপারে একটা আউটলাইন তুলে ধরেন তিনি, কম্পিউটারকে কীভাবে বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে। মজার কথা হচ্ছে, পেপারটার প্রথম প্যারার নামই হচ্ছে ‘দ্য ইমিটেশন গেম’। তিনি আসলে কয়েকটা গেম তত্ত্বের ধারণা দেন প্রশ্ন দিয়ে।

ফিরে আসি অ্যালান টুরিংয়ের প্রশ্নে। খুবই সহজ প্রশ্ন উনার। কম্পিউটার কি মানুষের মতো কথা বলতে পারে? পরের দিকে এই প্রশ্নটাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটা ‘মেজারমেন্ট টুল’ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়, যাকে আজ আমরা বলছি ‘টুরিং টেস্ট’। আপনি যদি কম্পিউটার কিবোর্ড দিয়ে পর্দার পেছনে থাকা একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং সত্যিকারে মানুষের সঙ্গে লিখে লিখে প্রশ্নের উত্তর পান, আর সেখানে একটা সময় পরে আপনি যদি সেই কম্পিউটারটাকে পাশের মানুষের সঙ্গে আলাদা করতে না পারেন, তাহলে সেই কম্পিউটার প্রোগ্রামটাকে ‘বুদ্ধিমান’ বলা যাবে।

টুরিং ব্যাখ্যা করছিলেন, যদি প্রশ্নকারী (যিনি মানুষ) তার লিখিত প্রশ্নের সব উত্তরের মধ্যে সেই কম্পিউটারকে সত্যিকারের মানুষ থেকে আলাদা করতে না পারলে সেই প্রোগ্রামটাকে ‘বুদ্ধিমান’ বলা যেতে পারে। উনার পয়েন্ট হচ্ছে যদি কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম এই টেস্ট পাস করে থাকে, তাহলে সেটা মানুষের আচরণকে কিছুটা রপ্ত করতে পেরেছে। একজন মানুষ পরীক্ষককে যদি একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজেকে মানুষের মতো করে বোঝাতে পারে, তাহলে তো তার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়।

৯. পেপারটা দেখতে পারেন এখানে, <https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238>। আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে।

বর্তমান চিন্তাধারণা, যন্ত্রের চিন্তা নিয়ে

আমি কিন্তু ১৯৫০ সালের পেপার থেকে বলছি। অবশ্যই আমাদের যুগে সেই টুরিং টেস্টের লিমিটেশন আছে। তবে প্রাথমিক একটা পেপার হিসেবে সবাই এটাকে ব্যবহার করে থাকে। আচ্ছা, ‘এলাইজা’ প্রোগ্রামটার কথা মনে আছে? অথবা এখনকার হাজারও চ্যাটবট? এটা তো অবশ্যই বলা যেতে পারে যে— টুরিং টেস্টে যেই লিমিটেশনগুলো আছে, সেগুলো কিছু ভালো পন্থা ব্যবহার করলে একজন প্রশ্নদাতাকে কনফিউজ করা যেতে পারে। যেমন, আমি একটা প্রশ্ন করলাম, আপনার চ্যাটবট বেশ কিছু আধ্যাত্মিক মানে ‘সাইকোলজিক্যাল’ উত্তর দিল, যেখানে একজন প্রশ্নকর্তা তাকে খুব ভালো আধ্যাত্মিক গোত্রের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে।

আমরা ইন্টারনেটে এখন প্রচুর চ্যাটবট দেখছি, যাদের চিন্তাভাবনা অনেকাংশেই মানুষের থেকে ওপরে। তবে সেগুলো কোটি মানুষের আলাপ-আলোচনাকে বিচার করেই তৈরি করা হয়েছে, যা আসলেই একদম মানুষের মতো উত্তর দিতে পারে। এগুলো অনেকটাই স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যানালাইসিস থেকে প্রেডিকশন করে নেওয়া। নিউরাল নেটওয়ার্ক মানে ডিপ লার্নিংয়ের খেলা। আর সে কারণে এখনকার রিসার্চাররা এ ধরনের ‘আধ্যাত্মিক ধরনের’ চ্যাটবটকে ঠিকমতো ধরার জন্য আরও নতুন নতুন পন্থা রিফাইন করে এনেছেন।

যন্ত্রের উপলব্ধি বোধ, চাইনিজ-রুম যুক্তি

যন্ত্রের কী মন আছে?

The point of the argument is this: if the man in the room does not understand Chinese on the basis of implementing the appropriate program for understanding Chinese then neither does any other digital computer solely on that basis because no computer, qua computer, has anything the man does not have.

—John Searle

টুরিং টেস্টের ধারণা থেকে আমাদের মনে কয়েকটা প্রশ্ন আসতে পারে। আচ্ছা কম্পিউটারের কি আসলে মন আছে? কম্পিউটার কি চিন্তা করতে

পারে? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কম্পিউটারের কি নিজস্ব উপলব্ধি বোধ আছে? আচ্ছা, প্রশ্ন কি বেশি কঠিন হয়ে গেল? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমরা জানতে চাচ্ছিলাম কম্পিউটারের কি নিজস্ব আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে কোনো ব্যাপারে? সে কি সচেতনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

‘চাইনিজ-রুম’ যুক্তি

এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার আগে ‘চাইনিজ-রুম’ আর্গুমেন্ট নিয়ে কথা বলে আসি। এই ধারণাটা প্রথমেই নিয়ে আসেন দার্শনিক জন সার্ল, তার ‘মাইন্ড, ব্রেইন অ্যান্ড প্রোগ্রামস’ পেপারে, ১৯৮০ সালে। ‘চাইনিজ-রুম’ আর্গুমেন্ট বলছে, একটা কম্পিউটারের প্রোগ্রামে কোনোভাবে তার মন অথবা উপলব্ধিবোধ, অথবা ভেতরে-ভেতরে যেকোনো জিনিসের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকার কথা না যদিও সেই প্রোগ্রামটা মানুষের মতো আচরণ করছে। আসলেই তাই। মানুষ যেভাবে চিন্তা করে, তার আত্মসচেতনতা, পাশাপাশি তার উপলব্ধির যেকোনো জিনিসের ব্যাপারে, সেগুলো কি তুলনা করা যাবে একটা কম্পিউটারের মানসিকতার সঙ্গে?

চাইনিজ ভাষা না বুঝেও উত্তর তৈরি

এটার ব্যাপারে বিবিসির চমৎকার একটা ভিডিও আছে ইউটিউবে। ২০১৫ সালে তৈরি। ব্যাপারটা নিয়ে হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন উনারা। কল্পনা করুন, একটা রুমে একজন মানুষ বসে আছেন, যিনি এক বিন্দু চাইনিজ ভাষা জানেন বা বোঝেন না। তিনি অবশ্যই ইংরেজি বোঝেন। ওই ঘরের দরজার মধ্যে একটা চিঠি পাঠানোর মতো একটা স্লট আছে, যার হাত দিয়ে কিছু কাগজপত্র আদান-প্রদান করা যায়। ওই দরজার ফাঁক দিয়ে উনাকে প্রশ্ন পাঠানো হচ্ছে যা পুরোপুরি লেখা হচ্ছে চাইনিজ ভাষায়।

উনি যখন প্রশ্ন পাচ্ছেন, সেটার উত্তর লেখার জন্য ওই রুমের ভেতরে ইংরেজিতে ইনস্ট্রাকশন বই দেওয়া আছে, যা ব্যবহার করে সেটার উত্তর লিখছেন চাইনিজ ভাষায় লেখা কার্ডবোর্ড ব্যবহার করে। উত্তর লিখে উনি ফেরত দিচ্ছেন সেই দরজার স্লটের ফাঁক দিয়ে। দেখা গেছে, উনি ঠিকঠাকমতোই চাইনিজ ভাষায় সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছেন, চাইনিজ ভাষার এক বিন্দু না বুঝেও। চাইনিজ ভাষা না বুঝেও ইংরেজি

ভাষায় ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করে কোন প্রশ্নের জন্য কী ধরনের উত্তর দিতে হবে, সেটাই বেছে দিয়েছিলেন কার্ডবোর্ড ধরে ধরে।

না বুঝেই উত্তর দেওয়াটা কি ‘উপলব্ধি বোধ’ থাকা?

এখানে ওই রুমের ভেতরের মানুষটা আসলে একটা কম্পিউটারের মতো কাজ করেছেন। ইনফরমেশন প্রসেস করে দিয়েছেন। উনি চাইনিজ ভাষার কোনো কিছু না জেনেও শুধু ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করে উত্তরগুলো তৈরি করেছেন। বিশেষত, এর ভেতরের ভাব না জেনেই। ‘সার্ল’ বলছেন, এর ভেতরে চাইনিজ ভাষা বোঝাবুঝির ব্যাপার ছিল না। উনি নিজেও চাইনিজ ভাষা জানেন না এবং ইনস্ট্রাকশনগুলো চাইনিজ ভাষা বুঝতে কোনো সাহায্য করেনি। এর অর্থ হচ্ছে, এই প্রসেসে কোনো উপলব্ধি বোধ বা বোঝাবুঝির কিছু ছিল না।

এই ধারণা থেকেই এই চাইনিজ রুম আর্গুমেন্ট এসেছে, অর্থাৎ যন্ত্র যেকোনো সমস্যাকে উপলব্ধি অথবা এর ভেতরে না বুঝেই সমস্যা সমাধান করতে পারে। এই যুক্তিটা একটা ‘ফাংশন’-এর আউটপুট এবং কম্পিউটেশনাল প্রসেসিংয়ের দার্শনিক অবস্থানের উল্টো দিকে অবস্থান নিয়ে বসে আছে, যা ধারণা করে যে মন একটা ইনফরমেশন প্রসেসিং অর্থাৎ তথ্য-প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেম ছাড়া কিছু নয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এজন্য মানুষের মনের মতো একটা ‘সিমুলেশন’ অর্থাৎ মনের একটা অনুকরণ সিস্টেম হলেই যথেষ্ট। বিশেষত, যুক্তিটা আগের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে পাল্টানোর জন্য বলা হয়েছে, যেখানে ‘সার্ল’ বলছেন, বিশেষ করে স্ট্রিং এআই-এর অর্থ বলছেন: ‘যদি একটা কম্পিউটার প্রোগ্রামের ইনপুট থেকে আউটপুট ঠিক থাকে, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এই কম্পিউটার প্রোগ্রামের মধ্যে মানুষের মধ্যে মন বা উপলব্ধি বোধ আছে।’

আপনার কী মত?

মানুষ এবং যন্ত্র কীভাবে শেখে?

আচ্ছা, ‘টুরিং’ কী বলেছিলেন? যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে যদি তাকে মানুষ আর যন্ত্রের মধ্যে ফারাক বোঝা না যায়, তাহলে তার কাজের আউটকামকে ‘বুদ্ধিদীপ্ত’ বলে ধরা যাবে।

মুভিটা না দেখলেই নয়

‘ইমিটেশন গেম’ মুভিটা নেটফ্লিক্সে পাবেন, মিস করার নয়।

মানবিক ক্ষমতা: ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (এনএলপি)

শুরুতেই বলে নিচ্ছি, এ ব্যাপারে আপনাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট এক্সপার্ট অথবা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে বোদ্ধা হবার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাদের গাইড এই পুরো রাস্তায়। পুরো ব্যাপারটাকে ঠিকমতো কন্টেক্সটচুয়ালাইজেশন লেভেলে আনতে সাহায্য নিয়েছি আমার ‘এনএলপি’ বইটা থেকে। বিশেষ করে শুরুর দিকে।

ভালো করে লক্ষ করে দেখবেন যে একটা মেশিন এবং একটা বাচ্চার শেখার প্রসেস প্রায় একই। আমাদের (আমার এবং স্বাতীরা) বাচ্চাগুলোর উদাহরণ দিই। আমাদের বাচ্চাগুলো যখন কথা বলা শুরু করেছিল, তখন সে ভাষার কোনো ধরনের গ্রামার সম্বন্ধে জানা তো দূরের কথা, অক্ষরই জানত না। বিশেষ করে বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন সবার কাছ থেকে বিভিন্ন শব্দের স্যাম্পল শুনে শুনে কিছু একটা তৈরি করার চেষ্টা করত মাথার ভেতরে। তার মানে, ওরা শব্দগুলোকে ঠিকমতো ডিকোড অর্থাৎ কোন শব্দগুলো কী, অথবা শব্দগুলো কোন অক্ষরগুলো দিয়ে তৈরি, কোনটার সঙ্গে কোনটা লাগালে ভাব প্রকাশ হবে, সেটা না বুঝেই বিভিন্ন শব্দ জোড়া লাগিয়ে কথা বলার চেষ্টা করত। অনেক সময় সেই বাক্যগুলো মিনিংফুল হতো, আবার অনেক সময় হতো না।

এর অর্থ হচ্ছে, একটা বাক্যে কীভাবে শব্দগুলোকে জোড়া লাগিয়ে ‘বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ’ ইত্যাদি না জেনে এমন কিছু তৈরি করত, যা অনেক সময় মিলে যেত। যখন মিলত না তখন আমরা মানে মা-বাবা সেটাকে ঠিক করে দিতাম। এরপর কয়েক দিন সে ভুলভাল বলে আস্তে আস্তে ঠিক করে নিত তাদের শুরুর বাক্য তৈরির স্টাইল। আর সব কিছুই ওরা করত কোনো ধরনের অক্ষর বা গ্রামার সম্বন্ধে ন্যূনতম ধারণা না নিয়েই। এটাই লক্ষ্য করার জিনিস। এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে সে কারণে আমরা অক্ষর নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাই না। বরং শব্দগুলোর সিকোয়েন্স ম্যাটার করে বেশি। একই শব্দ আগে-পরে বসলে মানে পাট্টে যায়।

অক্ষরজ্ঞান অথবা ব্যাকরণ শিখিয়ে ‘এনএলপি’ হবে না

এতক্ষণ যা বললাম তার একটা সারমর্ম করি এখানে। একটা বাচ্চা পৃথিবীতে এল। তার আশপাশের সবাই কথা বলছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে। তাকে শেখানো হয়নি ভাষার রুলগুলোকে, বরং সে মাসের পর মাস দেখছে তার আশপাশের মানুষজন কীভাবে যেন যোগাযোগ বলছে। উপায়ন্তর না দেখে কোনো ধরনের রুলস না জেনে মানুষ কীভাবে কথা বলছে, সেই প্যাটার্নটা বের করে আশপাশের মানুষগুলোকে ‘মিমিক’ করে কথা বলা শুরু করেছে বাচ্চাটা। বাচ্চাটার মাথার নিউরাল নেটওয়ার্ক আশপাশের সব কিছু প্যাটার্ন ধরে ভাষার ব্যবহার শুরু করেছে কোনো নিয়মনীতি না জেনেই। নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে উদাহরণ দিয়ে বিস্তারিত লিখেছি ‘ডিপ লার্নিং ব্যাপারটা কী? চ্যাপ্টারে’। আমাদের মাথায় নিউরাল নেটওয়ার্ক ইনপুট থেকে অনেকগুলো লেয়ারে প্রসেস হয়ে আউটপুটে আসে। সেই আউটপুটই সিদ্ধান্ত। ৩ নম্বর ছবিটা দেখে নিন এক ফাঁকে।

মজার কথা হচ্ছে, যখন আমি মেশিন লার্নিং এবং নিউরাল নেটওয়ার্ক (আমাদের মাথার নিউরালনের মতো একটা জিনিস) নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম, তখন বাচ্চাদের পুরো ব্যাপারটা মনে হতে থাকল। বাচ্চাদের ছোটবেলার ব্যবহার আর নিউরাল নেটওয়ার্কের ব্যবহারের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না। বড় হয়েও আমি ক্যাডেট কলেজে বাংলা গ্রামারে কোনোরকমে পাস করে বের হতাম। আসলে ভাষা এমন একটা জিনিস, যার জন্য কোনো ধরনের কমপ্লিট ম্যানুয়াল তৈরি করা সম্ভব না, যেখানে আমরা বলতে পারি ভাষা এভাবেই হতে হবে, এর বাইরে হলে চলবে না। ভাষায় এটা হলে বারোটা বেজে যেত সাহিত্যের।

সে কারণে ছোটবেলায় আমাদের বাচ্চারা যেভাবে ভাষাকে তাদের কাজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করছিল, সেটার অ্যাকুরেসি বাড়ছিল দিন দিন আশপাশের ফিডব্যাকের ওপর ভিত্তি করে। তার মানে ওরা মাঝে মাঝে মুখস্থ করে, মাঝেমধ্যে গোঁজামিল দিয়ে, মাসের পর মাস এই একই ধরনের রিকার্সিভ প্রসেসে একটা মানসিক মডেল তৈরি করে ফেলত তার মাথার ভেতরে, বিশেষ করে ভাষার ব্যবহার নিয়ে।

বাচ্চাদের মাথা আশপাশের প্যাটার্ন ধরে বুঝে ফেলত কীভাবে একটা বাক্যে কোন শব্দের পরে কোন শব্দটা আসতে পারে। বিশেষ করে কোন

শব্দটা না বললেই নয়। ফলে কোনো ধরনের অক্ষর বা গ্রামার না শিখেও বাচ্চারা একধরনের জোড়াতালি দেওয়া বাক্য তৈরি করতে পারে, যা ইমপ্রভ করে স্কুলে ভর্তি হবার আগেই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সেটা কাজও করে বিশেষ করে আশপাশের মানুষগুলোর কাছে।

আর সেই কাজটাই আমি দেখছি কয়েক বছর ধরে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে। ডিপ লার্নিং মডেলকে কয়েকটা শেক্সপিয়ারের নাটক দিয়ে ট্রেনিং করিয়ে দিলে, সে শেক্সপিয়ারের মতো করে কাছাকাছি নাটক লিখে ফেলতে পারে। আমরা কি সেই ডিপ লার্নিং মডেলকে গ্রামার বা অক্ষর শিখিয়েছিলাম? অবশ্যই না। ডিপ লার্নিং মডেল শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো থেকে শব্দগুলোর একটা প্যাটার্ন মানে সিকোয়েন্স ধরে ধরে বের করে সেটাকেই ব্যবহার করে জোড়াতালি দিয়ে একটা নাটক লিখেছে— যা পড়লে বোঝা যায় অনেকখানি। আর এখন এতই বেশী বাক্য কম্পিউটার দেখছে, সেখানে কম্পিউটারের জন্য একটা ভালো ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং মডেল তৈরি করা খুব একটা কষ্টকর নয়। সেটা আরও ভালো বোঝা যায় যখন আমরা গুগল-সার্চে বসি। কোনোরকমে একটা বাক্যের প্রথম শব্দ লিখলেই হলো, সে হাজারও অপশন দেবে তার পরবর্তী শব্দটা কী হতে পারে। এটাই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের একটা কাজ। আর মাথা খারাপ করব না গল্প দিয়ে।

টোকেনাইজেশন: বাক্যকে মিনিংফুল ছোট ছোট শব্দে ভাগ

(এই তিনটি প্যারাগ্রাফ প্রযুক্তির সাথে থাকা পাঠকদের জন্য)

আচ্ছা বলুন তো কম্পিউটার কীভাবে আমাদের ভাষা প্রসেস করে? কম্পিউটার তো সংখ্যা ছাড়া কিছু বোঝেনা। সেখানে একটা বাক্যের ছোট ইউনিট হিসেবে শব্দগুলোকে বলা যায়, যা একেকটা অর্থ বহন করে। ভাষার একটা ছোট মিনিংফুল ইউনিট হচ্ছে শব্দগুলো। যেমন, আমরা যদি একটা বাক্য না বলে শুধু আম বলি, সেখানে একটা ধারণা পাওয়া যায় যে আমরা একটা ফলের নাম বলছি। আমরা সেই ফলটা খেতে চাইছি। অথবা, ফলটা আমার কাছে আছে। ভাব প্রকাশের জন্য একটা শব্দই অনেক সময় ভালো কাজ করে।

আমরা শব্দগুলোকে এমনভাবে প্রসেস করব, যাতে কম্পিউটার সেটাকে নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে প্রসেস করার জন্য পাঠাতে পারে। আমাদের

নিউরাল নেটওয়ার্কের কাজ হবে শব্দগুলো থেকে তার ভাবগুলোকে বের করে নেওয়া। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের প্রথম পার্ট হচ্ছে ভাষার ‘নরমালাইজেশন’ অর্থাৎ এর মানগুলোকে একটা স্কেলে ফেলা। এখানে আমাদের কাজ হবে বাক্যের মধ্যে শব্দগুলোর ঠিকমতো এনকোডিং করা। একে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের ভাষায় বলা হয়, টোকেনাইজেশন। যার অর্থ হচ্ছে, একটা বাক্যকে মিনিংফুল ছোট ছোট শব্দে ভাগ করে সেটাকে সংখ্যায় এনকোড করা, যা নিউরাল নেটওয়ার্ক বুঝতে পারে।

শুরুতে একটা বাচ্চা তো অক্ষরজ্ঞান নিয়ে ভাষা শেখে না। সে শেখে শব্দগুলো দিয়ে, শব্দগুলোর প্লেসমেন্ট নিয়ে, কোন শব্দ আগে-পরে গেলে শব্দের অর্থগুলো কী রকম হতে পারে, সেটাকে বের করার চেষ্টা করে। এই একই কাজ করবে নিউরাল নেটওয়ার্ক তার ভেতরের লেয়ার দিয়ে। এখন বলি কেন অক্ষর কাজ করবে না? কারণ, আমরা ছোটবেলায় অক্ষর শিখে কথা বলা শুরু করিনি। কথা বলা শুরু করেছি আশপাশের মানুষ থেকে শব্দ শিখে।

তবে ভাষার সবচেয়ে ছোট ইউনিট হচ্ছে একেকটা অক্ষর। কম্পিউটার সেই অক্ষরগুলো কীভাবে চেনে? অক্ষরগুলোকে একটা এনকোডিং স্কিমে ফেলে দেওয়া যায়, যার কাজ হচ্ছে অক্ষরকে সংখ্যায় পরিবর্তন করে নেওয়া। ইংরেজি শব্দের জন্য একটা পপুলার স্কিম হচ্ছে ‘আস্কি’, বাংলা এনকোডিংয়ের জন্য ‘ইউনিকোড’ খুব ভালো কাজ করে। কিন্তু অক্ষর দিয়ে একটা বাক্যের ভাব বোঝা যাবে? না।

৮০% বইটা মুখে লেখা, পেছনে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং

এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অসাধারণভাবে ভাষা বুঝতে পারে বলে এই পুরো বইটা লিখতে আমি ব্যবহার করেছি বাংলা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। এর অনেকটাই অংশ মুখে বলেছি বলে সেটাকে প্রোবাবিলিস্টিক ধারণায় সেই শব্দ তার কাছাকাছি কোনো শব্দের সঙ্গে মিলে যায় সেই শব্দ এবং বাক্যকে ব্যবহার করেছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। এর ভেতরের গল্প জানতে চাইলে পড়তে পারেন ‘হাতে কলমে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বইটি।

সিদ্ধান্তের ‘লুপ’ থেকে মানুষকে বের করে আনা

(হিউম্যান আউট অফ দ্যা লুপ)

সিদ্ধান্তের গাছপালা, ডিসিশন ট্রি

আচ্ছা বলুন তো, আমরা দিনে কয়টা সিদ্ধান্ত নিই? আমি যেহেতু সরকারি অফিসে কাজ করছি বেশ লম্বা সময় ধরে, আমার ধারণা, সমস্যার ‘ইউনিকনেস’ নিয়ে কথা বলা হলে প্রতিদিন ৫টার মতো সমস্যার কথা বলা যায়, যা আমরা ‘নতুন’ দেখছি। এর পাশাপাশি, প্রতিনিয়ত যে রুটিনমাসিক কাজ হচ্ছে, সেটার ভ্যারিয়েশন কখনোই ১৫০টার বাইরে যাবে না। আমি একটু বাড়িয়েই বলছি, প্রায় সব অফিসকে একসঙ্গে আনার জন্য।

এর অর্থ হচ্ছে, আমরা কোন বিষয়ের জন্য ‘কী কী’ ইনপুট হলে ‘ফাইনালি’ মন্ত্রী/সচিব মহোদয় কী সিদ্ধান্ত দিতে পারেন সেটা তৈরি করে ফেলেছি এর মধ্যে। এখন দরকার, পুরো ব্যাপারটাকে কোন ধরনের ডেটা ইনপুট (স্পেসিফিকভাবে দরকার নেই) হলে সেটার আউটকাম কী হবে সেটাকে একটা ‘প্রসেস ফ্লো’তে ফেলে দেওয়া। শুরুতে একটা রুল বেজড অ্যাপ্লিকেশন, যা ডেটার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান হবে। একটা পারমিট দেবার জন্য ৬টা ‘ক্রাইটেরিয়া’ লাগলে, সেটা করতে পারে যন্ত্র— মানুষের সাহায্য ছাড়াই। একটা বিমান যদি যাত্রাপথে কয়েক লক্ষ ইনপুটের ওপর ভিত্তি করে প্রতি সেকেন্ডে হাজারো সিদ্ধান্ত নিয়ে অটোপাইলট ব্যবহার করে এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে চলে যেতে পারে, তাহলে এই ১০-২০টা ‘ক্রাইটেরিয়া’ থেকে আবেদনকারীদের মধ্যে কে পারমিট পাবেন এবং পাবেন না, সেটা বের করা যন্ত্রের জন্য নসি।

আমি কখনোই এটাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পর্যায়ে অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে দেখব না, তবে শুরুতে এ ধরনের বেসিক ‘রুল বেজড’ অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। এতে মানুষের সিদ্ধান্ত দেবার ভীতিকর সমস্যাগুলোর পাশাপাশি বায়াসের ঝামেলা কমে আসবে। আমি ‘একে পছন্দ করি না’ অথবা ‘সে আমাকে জানায়নি’ এ ব্যাপারগুলো শূন্যের কোটায় আসতে বাধ্য।

ইফ দিস, দেন দ্যাট; এবং ফিন্যান্সিয়াল অ্যাপ্লিকেশন

যারা মানব মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়ালেখা করেছেন, তারা জানেন, মানুষ প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পান। আর সে কারণেই প্রতিনিয়ত যে ধরনের সিদ্ধান্তগুলো আমাদের নিতে হয়, সেগুলোকে আমরা ‘অটোমেশনে’ ফেলে দিই। অর্থাৎ যেসব কাজগুলোকে আমাদের বারবার অর্থাৎ প্রতিনিয়ত করতে হয়, সেগুলোকে আমি নিজেই নিয়ে এসেছি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে।

এ ধরনের অনেকগুলো ‘IFTTT’ ধরনের ‘অ্যাপ’ আছে, যেগুলোর মাধ্যমে ‘এটা হলে, ওটা হবে’ কাজগুলো ভালো কাজ করছে। সন্ধ্যার সময়ে আপনা-আপনি জানালার পর্দা নেমে যাবে, অথবা বিকেল ৬টায় গিজার চালু হয়ে যাবে ইত্যাদি চালু করা যাচ্ছে বাসায়। আবার ধরুন, ‘দারাজে’ আমার পছন্দের কয়েকটা জিনিস আগে থেকে ‘সেট’ করা দামের নিচে চলে এলে কিনে ফেলবে অ্যাপ। অর্থাৎ ‘ইজ দিস দেন দ্যাট’ ব্যাপারটা এখন বেশ ভালোভাবেই অনেক ক্ষেত্রে কাজ করছে। এই সিদ্ধান্তগুলোকে আমাকে নতুন করে দিতে হচ্ছে না।

দুটো বাচ্চার স্কুলের বেতন, বিভিন্ন ক্লাবের চাঁদা, মায়ের বাসার ইন্টারনেট বিল ইত্যাদি ফিন্যান্সিয়াল অ্যাপ্লিকেশনে ‘রুল’ হিসেবে ‘সেট’ করে দিলে প্রতিমাসের নির্দিষ্ট টাকা আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে ‘বিইএফটিএন’ হয়ে চলে যাবে বিভিন্ন জায়গায়। প্রতিটা সমস্যাকে ইনপুট হিসেবে ধরলে সেটার আউটপুট কী হবে সেই ব্যাপারগুলোকে একটা ওয়ার্ক-ফ্লো প্রসেসে ফেলে দিলে সেই একই ধরনের সিদ্ধান্ত মানুষকে নিতে হবে না বারবার। এ কারণেই, অনেকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কোন জামাটা পরবেন অথবা কোন খাবারটা খাবেন, সেগুলোকে নতুন করে সিদ্ধান্তের মধ্যে না ফেলে একই ধরনের জামা-কাপড় অথবা একই খাওয়াদাওয়া পদ্ধতিতে চলে যাচ্ছেন। বিশেষ করে, যারা অতিমাত্রায় ‘হাই-প্রোডাক্টিভিটি’ ধারণায় কাজ করেন।

‘রুল বেজড’ সিস্টেম

সরকারি সংস্থাগুলো চাইলে এ মুহূর্তে মানুষের স্পর্শ ছাড়াই সেবা দিতে পারে। এটা পরীক্ষিত। সামনে, সিঙ্গাপুরের উদাহরণ দেব। এর মানে এই নয় যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। অবশ্যই আছে। আমরা তৈরি। পাল্টাতে হবে আমাদের মানসিকতা। যেমন: ‘মানুষকে দিয়েই সার্ভিস দিতে হবে। অথবা যন্ত্র পারবে না। যন্ত্র মানুষের কাজ কেড়ে নেবে’। কথাগুলো সত্য নয়। মানুষের প্রচুর কাজ পড়ে আছে। আমাদেরকে রি-স্কিলিং করতে হবে। তবে, সেবা দেবার ব্যাপারে সেবা প্রদানকারী সংস্থার চাওয়া কাগজপত্রের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ‘অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস’-এর মাধ্যমে ভেরিফিকেশন হয়ে গেলে এখানে মানুষের কোনো স্পর্শ লাগছে না। সরকার এখনই অনেক সেবা সহজীকরণ নিয়ে

কাজ করছে। সেখানে এ মুহূর্তে মানুষকে লুপ থেকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ডেলিভারি সময় আসছে কমে।

সরকারকে ছোট করে নিয়ে আসার ধারণা

আমাদের বাবা-মা আজীবন হয়তোবা একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন, যা আমাদের এই সময়ে অনেকটাই অসম্ভব ব্যাপার। ধীরে ধীরে যেখানে দক্ষতার কারণে বিভিন্ন দেশ তাদের সরকারের কাজের পরিধি কমিয়ে আনছেন, যার সোজাসাপ্টা উত্তর হচ্ছে ‘সরকারকে ছোট করে নিয়ে আসা’র ধারণা। সেই হিসেবে বেসরকারি সেক্টর সব সময় প্রাণবন্ত থাকবে। সরকারকে ছোট করে নিয়ে আসার ব্যাপারটাকে এভাবে বলা যায়, কিছু কিছু বিষয়ে বেসরকারি সেক্টর ভালো, বিশেষ করে ব্যবসায়ী অর্থাৎ বিমান, রেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভর্তুকি না দিয়ে এগুলোকে ছেড়ে দেওয়া যায় বেসরকারি খাতে।

এতে বাজেটের বাড়তি খরচের ওভারহেডগুলোকে ছেঁটে কমিয়ে আনা যায়। সামনে আসবে, মানুষ সরকারের বিভিন্ন সেবাগুলোর জন্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ব্যবহার করবেন, যার অনেকটা আমরা দেখছি উন্নত দেশগুলোতে। আমরা যেভাবে কোনো মানুষের স্পর্শ ছাড়াই একটা অ্যাপ দিয়ে দারাজ, পাঠাওয়ার সার্ভিস নিশ্চিত করছি সেভাবে বিশ্বব্যাপী সরকারের একীভূত ইন্টারফেস সেদিকে এগোচ্ছে। শুরুতে সেই ইন্টারফেসের পেছনে কাজ করবে ‘রুল বেজড’ সিস্টেম।

ধরা যাক, কাগজপত্র যাচাইয়ের জন্য ট্রেড লাইসেন্সের মূল অথবা সত্যায়িত কপি, টিআইএনের কপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের অথবা পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি, সম্পর্কিত ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ সদস্যতা সনদের সত্যায়িত কপি ইত্যাদি অনলাইন আবেদনপত্রে লিংকিং করা ‘ট্রেড লাইসেন্স’, ‘পরিচয়পত্রের নম্বর’ অথবা ‘ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের প্রদত্ত নম্বর’ ইত্যাদি অনলাইন ফর্মে যোগ করে দিলেই সেবা প্রদানকারী সংস্থার ভেরিফিকেশন সিস্টেম বাকি সংস্থাগুলোর অনলাইন সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেরিফাই করে নিয়ে আসতে পারবে মুহূর্তের মধ্যে।

আমি নিজে ব্যাপারগুলো করেছি অনেক সরকারি ডেটাসেটে। অনেক বামেলা হয়েছে শুরুতে, তবে হয়েছে শেষে। সত্যি বলতে, আমরা মানি অথবা না মানি, সেবা দেবার ব্যাপারে আস্তে আস্তে মানুষ সরে যাবে লুপ থেকে। এখনই দেখুন, অনেক কিছুই চলে এসেছে অনলাইনে। আপনি ‘ইন্টার-অ্যাকশন’ করছেন মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের ফর্মের সঙ্গে। আমাদের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের অ্যাকাউন্ট খুলছি অ্যাপ দিয়ে। কারো সাথে কথা না বলে।

ডেটা কীভাবে কথা বলে?

তথ্য নিয়ে প্রশাসন চালানো

What is new about the use of data technologies in government? After all, to govern has always meant to gather and process data, with the technology available at the time.

—Predictive Analytics and AI in Governance: Data-driven government

ডেটা কীভাবে কথা বলে? ডেটা প্রসেসের শুরুটা কোথায়?

যেহেতু সামনে প্রশাসনের ডেটা ব্যবহার নিয়ে কথা বলছি, সেখানে ডেটা জোগাড় করা এবং সেটাকে প্রসেস করার ব্যাপার আজকের গল্প নয়। মনে আছে, ‘মেসোপোটেমিয়া’ বলে একটা গ্রিক শহরের কথা? সেই আদিকালের শহরের কর এবং শুল্কের খাতা দেখে আমরা এখন জানতে পারছি ডেটা প্রসেসের কথা। মানে ওই যুগে। সরকারগুলো ১৯ শতকের শুরুতে মেকানিক্যাল ক্যালকুলেটর দিয়ে শুরু করলে ১৯৬০ এবং ১৯৭০ দশকে শুরু হয় ডেটা প্রসেসিং মেইনফ্রেম কম্পিউটারে। আমাদের দেশে সেটা শুরু হয় ১৯৮০-৯০-এর দশকে।

বর্তমানে ডেটা কালেকশন এবং প্রসেসিং যেকোনো সরকারের বাজেট প্রস্তাবের প্রথম ধাপ। তবে এটা ঠিক যে, সরকারে যত ডেটা আছে, সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করলে অনেক প্রজ্ঞা পাওয়া যাবে। ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ডেটার ঘনত্ব অর্থাৎ ডেটার নিবিড়তা, ডেটাগুলো কত কম্প্যাক্ট থাকছে অর্থাৎ গ্রানুলারিটি, কতটুকু জুম (কতটুকু ভেতরে যাওয়া যাবে) করা যাবে ডেটাকে, ডেটাগুলো কীভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত বা লিংক করা আছে, এবং ডেটা অ্যানালাইসিস করলে তার মধ্যে প্যাটার্নের সংযোগগুলো ডেটাকে বুঝতে ভালো ধারণা দেয় আমাদেরকে।

ডেটাকে প্লট, একনজরে ধারণা

ডেটাকে দেখা

Decision making increasingly relies on data, which comes at us with such overwhelming velocity, and in such volume, that we

can't comprehend it without some layer of abstraction, such as a visual one.

—Visualizations That Really Work, Scott Berinato, HBR

ডেটা সায়েন্সের শুরুর কাজ হচ্ছে ডেটাকে কয়েকটা ডাইমেনশনে প্লট করতে পারা। এই প্লটে বোঝা যায় ডেটার সম্পর্ক। কোথায় যাচ্ছে নগদ, বিকাশের টাকার ট্রেইল, কোথায় ক্যাশ আউট হচ্ছে বেশি, ঈদের সময় কোন রাস্তাগুলোর বিকল্প রাস্তা কোনগুলো হতে পারে, সন্ধ্যার পর কোথায় ছিনতাই হয় বেশি, কোন এলাকার মানুষগুলো পানির কন্টে আছে, সেই সঙ্গে কি হবে সামনের বছরগুলোতে, রাস্তার কোন বাঁকগুলোতে দুর্ঘটনা হচ্ছে এবং সামনে হবে বেশি অথবা কাদের মানসিক অবস্থা বর্ডারলাইনে, সেটা দেখাতে পারে এই সামান্য প্লটিং। একবার একটা বাইরের ইউনিভার্সিটির সঙ্গে বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরের ডেটাতে দেখেছিলাম কীভাবে সাগরের কাছে সব হারিয়ে মানুষগুলো দেশের ভেতরে কোথায় হারিয়ে যায় জীবিকার খোঁজে।

ডেটার এ ধরনের নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যবহার করে প্রশাসন একধরনের ‘অ্যান্টিসিপেটরি গভর্নমেন্ট’ অর্থাৎ আগাম ধারণার প্রশাসন তৈরি করতে পারে। মানুষ কালকে অর্থাৎ সামনের মাসগুলোতে যেই সমস্যাগুলোতে পড়তে পারে, সেটা যদি আগেভাগে সমাধান করা যায় তাহলে কেমন হয়? সেই প্রশাসনকে মানুষ ভালো না বেসে যাবে কোথায়? ডেটাকে ঠিকভাবে অ্যানালাইসিস অর্থাৎ নিরীক্ষণ করলে সামনে কী ঘটতে পারে, সেটা নিয়ে কাজ করছে অনেক দেশের প্রশাসন। চলুন কথা বলি ডেটার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে, যা পাল্টে দিচ্ছে আজকের সরকারি প্রশাসন এবং বেসরকারি ব্যবস্যাগুলোকে।

ডেটার নিবিড়তা মানে ডেটাগুলো কত ‘ডেন্সড’

পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে যেভাবে ডেটা বাড়ছে, সেখানে ডেটার মধ্যে ঘনত্ব অথবা ডেটাগুলোর মধ্যে নিবিড়তা অর্থাৎ একটার সঙ্গে আরেকটা ডেটার ঘনত্ব কমছে প্রতিদিন। আগে যতটুকু জায়গায় ১ টেরাবাইট ডেটা রাখা যেত, সেখানে এখন নখের আগার অনেক কম জায়গায় এই ডেটা রাখা যায়। আপনার মোবাইলে যেই প্রসেসর আছে, সেই প্রসেসরের

অনেক কম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেসর দিয়ে মানুষ চাঁদে গিয়েছে। চালিয়েছে গাইডেন্স কম্পিউটার, মহাকাশে যেতে।

এখন বাসার অনেক ডিভাইস এত বেশি ‘লগ জেনারেট’ করে যে প্রতিটা ডিভাইস থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে আপনার কাজের আউটপুট আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাওয়া যায়। প্রাইভেসির কথা বাদ দিয়ে যদি একটা উদাহরণ টানি, আপনার অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে জানবে আপনি কোথায় আছেন? ধরুন, আপনি উবার ডেকেছেন, কীভাবে আপনাকে এবং গাড়িকে এক জায়গায় আনবে? অথবা, আপনি বিপদে পড়ে ৯৯৯ কল করেছেন, তবে কথা বলতে পারেননি, অথবা সুযোগ পাননি, পুলিশ কীভাবে আপনাকে ‘লোকেট’ করে উদ্ধার করবে?

ছোটবেলায় দেখেছি একটা বাসার ঠিকানা হচ্ছে একজন মানুষকে ঠিকমতো ‘লোকেট’ করার প্রযুক্তি। টেলিফোন আসার আগের কথা বলছি। এরপর এর সঙ্গে যোগ হলো তার ‘ল্যান্ডলাইন’ এখনকার ‘বিটিসিএল’, অর্থাৎ টেলিফোন লাইনের বিলিং অ্যাড্রেসে যে ঠিকানা দেওয়া আছে, সেখানে মানুষটাকে পাওয়ার কথা। এরপরে এল বাসায় ইন্টারনেট কানেকশন। সেখানেও বিলিং অ্যাড্রেস হিসেবে এল তার বাসার ঠিকানা। এখন ডিস অ্যানটেনা এবং ইন্টারনেট আসছে একসঙ্গে। সেখানেও আছে একটা বাসার ঠিকানা। ডেটার অ্যাট্রিবিউট বাড়ছে— একই বিষয়ে।

কয়েক মিটারের খেলা

There continues to be improvement, and you'll see indoor accuracy of better than 10 meters, but round-trip time (RTT) is the technology that will take us to the one-meter level.

—How to achieve 1-meter accuracy in Android, Frank van Diggelen, Roy Want and Wei Wang, Android Location, Google

প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় চলে এল মোবাইল ফোন। সেখানে একটা মোবাইল ফোন যেই বেজ স্টেশন টাওয়ারে কানেক্টেড, সেখান থেকে ওই মানুষটার লোকেশন পাওয়া যেত। কারণ, প্রতিটা বেজ স্টেশনের সঙ্গে ‘সিগন্যাল সিনক্রোনাইজ’ করার জন্য ‘জিপিএস’ টাইমিং ব্যবহার করা হয়। সেখান থেকে ওই টাওয়ারের স্পেসিফিক লোকেশন।

এরপরে এল ‘ট্রায়াপ্লেশন’, অর্থাৎ নেটওয়ার্কে আরও কিছু ‘টাইম অ্যাডভান্স’ সেলস ব্যবহার করে মোবাইল ফোনটা কোথায় আছে সেটা বের করার একটা প্রযুক্তি। সেই মোবাইল ফোনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হতো একটা ‘অ্যাসিস্টেড জিপিএস’, বিপদের সময় মানুষ ফোন করলে কলের সঙ্গে চলে যেত তার স্পেসিফিক ‘লোকেশন’— জরুরি সাহায্য কেন্দ্রের কাছে। একটা লুকায়িত ‘এসএমএস’ দিয়ে। মানুষটা ফোনে কথা না বলতে পারলেও সাহায্য চলে যেত ওই জায়গায়। প্রতিটা মানুষের জন্য রাষ্ট্রের সাহায্যের হাত।

এরপরে এল স্মার্ট ফোন এবং সঙ্গে বিল্টইন ‘জিপিএস রিসিভার’, যেটা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে স্যাটেলাইটের সঙ্গে— নিজের লোকেশন জানতে। আমার এই উদাহরণটা আনার উদ্দেশ্য হলো, এই মুহূর্তে এই একটা লোকেশন ডেটা পেতে যত ধরনের প্রযুক্তি বের হয়েছে, সেটাই প্রচুর ডেটার ঘনত্ব তৈরি করেছে। আগে ডেটা ছিল কম, সেখান থেকে সে ধরনের অ্যানালাইসিস আসত না মানুষের কাছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এখন আপনার মোবাইল ফোন ঠিক জানে আপনার উবার অথবা পাঠাও ‘রাইডটা’ কত দূরে আছে। অথবা যখন আপনি গুগল ম্যাপ ব্যবহার করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার সময় রাস্তা ভুল করে ফেললেও প্রতিমুহূর্তে আগের ডেটা থেকে নতুন করে ‘রি-রাউটিং’ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আবার নতুন রাস্তায় নিয়ে আসে।

এর কারণ একটাই। প্রচুর ডেটা ‘জেনারেট’ করছে হাজারো মোবাইল ফোন আপনার আশপাশে। আর সে কারণেই আপনি বুঝতে পারেন কোন রাস্তায় ‘বাম্পার টু বাম্পার’ গাড়ির জ্যাম, মানে পুরো রাস্তা ধরেই লাল সিগন্যাল। এই তথ্য পাচ্ছেন আপনার ফোনে, রিয়েল টাইমে। এর পাশাপাশি, এখন সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টেও দেওয়া যাচ্ছে জিও-লোকেশন ট্যাগ। বন্ধুরা জানতে পারছেন কোথায় আপনি এখন?

আমি যেহেতু কমিউনিকেশনের মানুষ, সে কারণে বলতে পারি, আগে যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড দিয়ে মাত্র কয়েকটা ডিভাইস চলত, সেখানে একই ফ্রিকোয়েন্সিতে চলে হাজারো ডিভাইস। যত ডিভাইস, তত বেশি কানেকশন, তত বেশি লগ জেনারেশন, তত বেশি ডেটার ডেনসিটি। এ ছাড়া ওপরের দিকে গিগাহার্টজ ব্যান্ডের ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করত না সে রকম ডিভাইস। এখন ওপরের দিকের ব্যান্ডগুলোতেও চলে আসছে

প্রচুর ডিভাইস যা ব্যবহার হচ্ছে ‘মেশ’ ধরনের কানেকশনে। অর্থাৎ একটা ডিভাইস যোগাযোগ করছে তার আশপাশে অনেক ডিভাইসের সঙ্গে। যেভাবে আপনার ইলেকট্রিক মিটার যোগাযোগ করছে তার সেন্ট্রাল সিস্টেমের সঙ্গে। অথবা নদীর পানি মাপতে ব্যবহার হচ্ছে ছোট ছোট অল্প দামের ‘ইন্টারনেট অব থিংস’ ডিভাইসগুলো।

এখন ইন্টারনেট যেভাবে তার প্রতিটা ইলেকট্রনিক যোগাযোগের ডেটা পাইপ দিচ্ছে ভার্সুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক দিয়ে, তার পাশাপাশি প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশন এবং তার প্রসেসের ভেতরে আলাদা আলাদা ‘ট্রানজাকশন’ এবং প্রসেস করা ডেটা সরকার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অসাধারণভাবে কাজে সাহায্য করছে। এর পাশাপাশি প্রচুর ‘সেন্সর নেটওয়ার্ক’ তৈরি করছে অনেক ‘লগ’, যা দিয়ে রিয়েল টাইম মনিটরিং অর্থাৎ নিরীক্ষণ সম্ভব। এটা সম্ভব হচ্ছে এ কারণেই, এখন ডেটা সোর্স অনেক বেশি। সে কারণে ডেটা ‘জেনারেট’ হচ্ছে প্রতিটা ডিভাইস হিসেবে আরও বেশি। ফলে এই বাড়তি ডেটা সরকার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করছে ভালো ‘অ্যানালাইটিকস’ ও প্রজ্ঞা দিতে। একটা দুটো ডেটা সোর্স ভুল তথ্য দিলেও সব ডেটা সোর্সকে একসঙ্গে মিলিয়ে অ্যানালাইসিস করলে নির্ভুল আউটকাম আসে।

ডেটার রেজল্যুশন অর্থাৎ ‘থ্যানুলারিটি’

শুরুর দিকে ডিজিটাল ক্যামেরার আউটপুট ছিল ‘ভিজিএ’। মাত্র ৬৪০ পিক্সেল। এখন সাধারণ মোবাইল ফোনের যে ক্যামেরাগুলো আসছে সেগুলোই অনেক বেশি রেজল্যুশনের। এর অর্থ হচ্ছে, আগের ছবি দিয়ে ‘এডিটিং’ করতে হলে ‘হেড রুম’ ছিল অনেক কম। এখনকার ছবিগুলোতে রেজল্যুশন অত্যধিক বেশি থাকতে এর জুমিং এত বেশি করা যায় যে সেই ছবি থেকে ছোট একটা আইটেমকে আলাদা করে একটা বড় ছবি বানানো যায়। ব্যাপারটা এ রকম যে, আপনার তথ্য সরকারের কাছে বিভিন্ন ডেটাসেটে থাকতে একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট অ্যাপ্লেস অর্থাৎ দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যানালাইসিস করা যায়।

একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাবেইসের যত ফিল্ড আছে, সেটাকে আরও ভালো ‘রেজল্যুশন’ দেয় ‘জন্মনিবন্ধন’ এবং ‘পাসপোর্ট’ ডেটাসেট। অর্থাৎ কিছু তথ্য একই থাকলে এর সঙ্গে বিভিন্ন

দৃষ্টিকোণ থেকে আরও অনেক তথ্য অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত ধারণা দেয়। এখন আপনি হজে যান অথবা বিভিন্ন কাজে বিদেশ ভ্রমণে যান, একই তথ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রসেস সহজ হয় বাড়তি ইনপুট ছাড়াই।

পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার চাহিদা ভিন্ন রকম। একজনের সঙ্গে আরেকজনের চাহিদা মিলবে না। শিক্ষাবোর্ড যে ডেটা চাইবে, ভূমি মন্ত্রণালয় সে ডেটা চাইবে না, অথচ কাজ হচ্ছে একই ব্যক্তির ওপরে। ডেটার ভালো রেজল্যুশন থাকলে সরকার যে কোন সার্ভিস গ্রহীতার কাছে নতুন কোনো তথ্য না নিয়েই সার্ভিস দিতে পারে। কারণ, সার্ভিস গ্রহীতা বলতেই পারেন— সব ডেটা আছে প্রশাসনের কাছে। সে কারণে, ডেটাসেটগুলোকে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতে হবে মানুষের প্রাইভেসি বজায় রেখে। সেই কাজটা হচ্ছে এখন।

ডেটার মধ্যে লিংকিং

মনে আছে আগের উদাহরণের কথা? দেশের একজন সাধারণ নাগরিকের ‘ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর’ অর্থাৎ ‘টিন’ আইডি যখন পাসপোর্ট ডেটার সঙ্গে যুক্ত হবে, এর সঙ্গে ‘ইমিগ্রেশন’ ডেটাবেইসের তথ্যকে অ্যানালাইসিস করলে তার প্রতিবছরের কর প্রদানের হিসেবের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করা যাবে। এর পাশাপাশি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং রাজউকের ডেটাবেইসের সঙ্গে কিছু তথ্য মিলিয়ে নিলে সেই ব্যাপারটাকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যাবে। একারণে একজন নাগরিকের কর প্রদানের তথ্যকে ঠিকমতো যাচাই করার জন্য বেশ কিছু দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাপারটাকে আহামরি মনে হবার কিছু করার নেই। কারণ, ডেটার মধ্যে লিংকিংয়ের ক্ষমতার শুরুরটা এখানে।

এর পাশাপাশি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের ডেটাবেইসে বাড়তি গাড়ির মালিকানার ব্যাপারে ব্যাপারগুলোকে আরও স্পষ্ট করে নিয়ে আসা যায়। এর অর্থ হচ্ছে যত ডেটাসেটগুলো একে অপরের সঙ্গে লিংক করা যাবে, তত ডেটাগুলোর ভেতরে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। এই গাড়ির ডেটাবেইসের সঙ্গে ইন্স্যুরেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং বিভিন্ন রাস্তা বা সেতু পার হবার সময় ‘টোল’ ডেটাবেইসে নতুন ধরনের ধারণা পাওয়া যাবে। এটা তখনই সম্ভব যখন একটা অবজেক্টকে (মানুষ, গাড়ি,

অর্থাৎ যার একটা আইডি আছে) বিভিন্ন ডেটাসেটে একটা ইউনিক শনাক্তকরণ নম্বর দিয়ে মেলানো যাবে। এক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর সব ডেটাসেটের মধ্যে সন্নিবেশিত (বোধাতামূলক একটা ফিল্ড হিসেবে) থাকলে ডেটার লিংকিং করা অনেক সহজ হয়। মনে আছে তো আপনাদের, ডেটাবেইসের ভেতরে যখন আমরা বিভিন্ন টেবিলকে একটার সঙ্গে আরেকটাকে লিংক করার জন্য ‘প্রাইমারি কি’ পদ্ধতি ব্যবহার করতাম?

লিংকিং এবং মিসিং ডেটা

For every big data set (with one billion columns and rows) fueling an AI or advanced analytics initiative, a typical large organization may have a thousand small data sets that go unused.

—Small Data Can Play a Big Role in AI, HBR

বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যতই প্রোফাইল খুলি না কেন এর পেছনে একটা ইউনিক শনাক্তকরণ পদ্ধতি থাকে, যা সব প্রোফাইলকে একীভূত করতে পারে। সেটা আপনার ই-মেইল, ব্যবহারকারীর হ্যান্ডেল অথবা ফোন নম্বর, যা সব প্রোফাইলে থাকার কথা। যত দিন যাবে ততই এই ডেটার মধ্যে লিংকিং বাড়তে থাকবে, ফলে যেকোনো মানুষের ‘পার্সোনলাইজড’ সার্ভিস পেতে সুবিধা হবে। এখনই আমরা অনলাইন ডিজিটাল সার্ভিসগুলোতে একটা একীভূত ‘অথোরাইজেশন’ সিস্টেম ব্যবহার করছি, যার ফলে সবকিছুকে লিংকিং করা যাচ্ছে সহজে। আপনার ফেসবুক বা গুগল আইডি (সনাক্তকরণ সার্ভিস) থাকলেই অনেক কিছু ব্যবহার করা যাচ্ছে এক ক্লিকে।

ডেটার মধ্যে প্যাটার্ন, মেশিন লার্নিং

ডেটার ভেতরে ঘনত্ব, রেজল্যুশন এবং লিংকিং থেকে যে ধরনের ধারণা আসে, তার একটা বড় অংশ হচ্ছে মেশিন লার্নিং। আমরা যখন সাধারণ পরিসংখ্যান পড়তাম, সেখানে ‘ইনফারেন্স’ বলে একটা ব্যাপার ছিল। অর্থাৎ ডেটা থেকে ‘ইনফার’ মানে অনুমান করা। একটা স্যাম্পল থেকে ডেটাকে বড় একটা পপুলেশনে প্রজেকশন করা যেত। কম ডেটা থাকলে যা হয় আর-কি।

তবে এখন যেহেতু ডেটার অনেক সোর্স, সে কারণে ডেটাগুলোকে অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যানালাইসিস করা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কম্পিউটিং প্রসেসিং ক্ষমতা এবং কিছু ‘স্পেশালাইজড’ প্রসেসর, যেগুলো ইমেজ ডেটাকে হ্যান্ডেল করতে পারে ভালো। বেশি ডেটাসেট হলে এর মধ্যে ভুলের সংখ্যা কমে যায়। আগে ডেটার ভেতরে মানুষের পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে ‘কো-রিলেশন’ অথবা আগের ধারণা থেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া— এই ব্যাপারগুলো থেকে বের হয়ে আসছে দেশগুলোর প্রশাসন।

সরকারি ডেটাসেট

সার্বিসগুলোকে জনগণের কাছে পাঠানোর কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রশাসন এবং বিশেষায়িত সংস্থাগুলো নিজ নিজ ডেটাসেট তৈরি করেছে গত কয়েক দশক ধরে। আমি যেহেতু নিজেই বেশ কয়েকটা প্রজেক্টের সঙ্গে ছিলাম সে কারণে বলতে পারি, যে ধরনের ফর্ম/ডকুমেন্টগুলো আগে ছিল কাগজে, সেগুলোকে আস্তে আস্তে ডিজিটাল ফরম্যাটে পরিবর্তন করার কাজ চলছে অনেক সংস্থাতে।

পৃথিবীজুড়ে অন্যান্য দেশের প্রশাসনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা যেমন জাতীয় পরিচয়পত্র, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কর কমিশনারের কার্যালয়, শিক্ষানবিশ/স্মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন, গাড়ি এবং চালকদের আলাদা ডেটাবেইস, জন্মনিবন্ধন, পাসপোর্ট এবং ইমিগ্রেশন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ডেটাবেইস, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ডেটাবেইস, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের ডেটাবেইস, আইন ও নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর অপরাধ এবং অপরাধীদের ডেটাবেইস, হেলথ কার্ড, ভূমিসংক্রান্ত ডেটাবেইস, আইনসংক্রান্ত ডেটাবেইসসহ বহু ডেটাবেইস তৈরি হয়ে গেছে এর মধ্যে।

ওপেন ডেটা

During recent years, the amount of data released on platforms by public administrations around the world have exploded. Open government data platforms are aimed at enhancing transparency and participation.

—Open data work: understanding open data usage from a practice lens, SAGE Journals

যেহেতু সরকারি কাজের প্রবাহ অর্থাৎ প্রসেসগুলো আস্তে আস্তে ‘ডিজিটাইজড’ হচ্ছে বলে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ডেটাবেইসগুলোর যোগাযোগ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। সরকারি সংস্থাগুলোর মাঝে ‘অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস’ অর্থাৎ এপিআইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থাগুলো তথ্য আদান-প্রদান করা শুরু হয়েছে নাগরিক সেবা প্রদান করতে। অল্প হলেও এগিয়েছে ভালোই। এই কাজের একটা বড় ভাগ দেখেছি আমার নিজের চোখে। সেদিক থেকে এগিয়ে আছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো।

এর পাশাপাশি সরকারি ডেটাবেইসগুলোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বেসরকারি এবং ব্যবসায়িক সংস্থাগুলো, যাতে নাগরিক সার্ভিস দেওয়া যায় খুব সহজেই। এ ব্যাপারে জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাবেইসের সঙ্গে যুক্ত আছে অসংখ্য বেসরকারি সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা প্রতিনিয়ত জনগণকে সেবা দিয়ে আসছেন। যেমন ‘সিম রেজিস্ট্রেশন’ অথবা ব্যাংকের এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের অ্যাকাউন্ট (কেওয়াইসি, নো ইওর কাস্টমার) তৈরি করতে জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে ভেরিফিকেশন অর্থাৎ নিরীক্ষণ চালু আছে রিয়েল টাইমের ভিত্তিতে। সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে শিক্ষা বিভাগের ডেটাবেইসের সংযোগ নিয়ে। পরীক্ষার আগে রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা পর্যন্ত সরকারি এই ডেটাবেইসের সার্ভিসগুলো ব্যবহার করছে প্রচুর সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। তবে সেগুলোর অনেকগুলো এখনো ওয়েবভিত্তিক। এপিআই লেভেলে আসেনি এখনো।

অনলাইনের সরকার

Named ‘the most advanced digital society in the world’ by Wired, Estonia has built an efficient, secure and transparent ecosystem where 99% of governmental services are online.

—We have built a digital society and we can show you how.
e-estonia

১৯৯০ সালে এস্টোনিয়ার সরকার চালু করে সার্ভিস বাস অর্থাৎ নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক হাব; একটা নতুন ব্যবসা খুলতে যত ডেটাসেটকে দরকার, ততগুলো ডেটাসহ আরও প্রয়োজনীয় (জাতীয় পরিচয়পত্র, কর, ব্যবসায়িক নিবন্ধন ডেটাবেইস, হেলথ কার্ড ইত্যাদি) সব ডেটাসেট নিয়ে

একটা লিংকড ডেটাবেইস হাব তৈরি করে। এই হাইওয়েতে উঠলেই হলো, ডেটা সমস্যা নয়। এর নাম দিয়েছে তারা ‘এক্স রোড’। সব ধরনের ওপেন প্রোটোকল দিয়ে তৈরি এই রাস্তায় উঠলে যেকোনো ধরনের ডেটাবেইসে সংযোগ পাওয়া সেকেন্ডের ব্যাপার। এই ডিজিটাল ‘ডেটা-হাব’ একটা ডিজিটাল এক্সচেঞ্জের মতো, যেখানে প্রতিটা প্রশাসনিক প্রসেস তাদের নিজের পছন্দমতো ডেটা এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারে।

এ ধরনের কয়েকটি ধারণা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে, যেখানে এটাকে ই-সার্ভিস বাস হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার এই একই পদ্ধতিতে কাজ করে। অর্থাৎ এই ওপেন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস দিয়ে একটা সংস্থা অথবা প্রশাসনিক দপ্তরগুলো সরাসরি যুক্ত হতে পারে কমন প্রোটোকলে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এ ধরনের কয়েকটি ইউনিভার্সাল ই-সার্ভিস বাস তৈরি হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, এতে বাংলাদেশেও একটা ব্যবসা খুলতে একটা ন্যূনতম সময় লাগবে।

সরকারি ডেটাসেটগুলোর মধ্যে আমার কাছে ‘স্ট্যাটিস্টিকস নেদারল্যান্ডস’কে অসাধারণ মনে হয়েছে। ডেটা কীভাবে একই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি জায়গায় একসঙ্গে ব্যবহার হয়, সেটা দেখতে চাইলে তাদের কাজগুলো অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাদের অঙ্গ সংস্থাগুলো এই সার্ভিস দিয়ে আসছে।

বেসরকারি খাতের ডেটা সোর্স

বাংলাদেশে ব্যবসা করার আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে প্রশাসন দেশের বেসরকারি সার্ভিস প্রোভাইডারগুলোর ডেটাসেটগুলোর যোগসূত্র ঘটিয়ে দেয় সরকারের সঙ্গে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার একটা বড় অংশ যেহেতু বেসরকারি সার্ভিস সেক্টরে, সে কারণে টেলিযোগাযোগ সার্ভিস প্রোভাইডাররা আইনগত সূত্রে ‘সাবস্ক্রাইবারদের ডেটাবেইসকে’ যুক্ত করতে হয় নিরাপত্তা প্রদানকারী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাদের সঙ্গে। সে কারণে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসসহ আরও অনেক কোম্পানিগুলো যুক্ত হয় এই ডেটাসেটের সার্ভিস বাসে।

এর পাশাপাশি, বিভিন্ন দেশের প্রশাসন সোশ্যাল মিডিয়া নিরীক্ষণ করে থাকে জনগণের মতামত পাওয়ার জন্য। এই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সামনে কী ঘটনা ঘটতে পারে এবং প্রতিটা ঘটনার সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততার ব্যাপারটা বোঝা যায় অন্য ডেটা সোর্সগুলোর ডেটা অ্যানালাইসিস থেকে। বর্তমানে মুক্ত ইন্টারনেট থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, সে ধরনের ‘ওপেনসোর্স ইন্টেলিজেন্স’ এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ‘সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস’ করে প্রশাসনগুলো তাদের সামনের কাজগুলো প্রেডিকশন করতে পারে। সত্যি কথা বলতে, সোশ্যাল মিডিয়া এ ধরনের ডেটা মাইনিংয়ের ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার তাদেরকে জনগণের আরও কাছে নিয়ে আসছে।

সেন্সর নেটওয়ার্ক এবং ‘ইন্টারনেট অব থিংস’-এর ডেটাসেট

ডেটা কালেকশন

As more Internet-connected devices are being deployed to automate and collect various data, the adoption of IoT efficiently boosts business life all over the world, which is further supported by breakthrough innovations. The latter are remarkable as they employ the IoT technologies to mitigate global warming, save water, increase yields in smart farming, provide a backbone for autonomous vehicles, and many more.

—The Internet of Things and Sensor Networks, IEEE Xplore

মানুষ হিসেবে আমাদের সবার পকেটে একটা করে মোবাইল ফোন সেন্সরের মতো কাজ করলেও বর্তমানে দেশজুড়ে অনেক জায়গায় তৈরি হতে যাচ্ছে সেন্সর নেটওয়ার্ক। আমাদের বিদ্যুৎ মিটার থেকে শুরু করে রাস্তার সরকারি বাস, ট্রেন ও ট্রাফিক সিস্টেম চালাতে সেন্সর নেটওয়ার্ক ছাড়া গতি নেই। এই ধরনের সেন্সরগুলো যে ধরনের ডেটা জেনারেট করে, সেটা প্রসেস করতে পারলে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক ধারণা পাওয়া সহজ হবে। প্রতিটা অবজেক্ট আস্তে আস্তে যুক্ত হচ্ছে সেন্সর নেটওয়ার্কে যাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সেই সার্ভিসটার ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায় সেন্ট্রাল সিস্টেমে।

নদীর পানি বাড়ল না কমল, সামনের মাসে বন্যা হবে কিনা এই ধরনের তথ্যের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে সেন্সর নেটওয়ার্কের ওপর। একটা শহরের তাপমাত্রা থেকে শুরু করে বাতাসের মান নিয়ে কাজ করতে গেলে দরকার এই সেন্সর নেটওয়ার্ক। শহরজুড়ে ট্রাফিক অপটিমাইজেশন ও ইন্টেলিজেন্ট লাইটিং সিস্টেম নির্ভর করে আছে এই সেন্সরভিত্তিক নেটওয়ার্কগুলোর ওপরে। আমার হিসেবে ঢাকা শহরে ট্রাফিক অপটিমাইজেশনে এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করলে নিদেনপক্ষে ২০% আগে মানুষ তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবে।

মেশিন লার্নিং কেন?

আচ্ছা, মেশিন লার্নিং কী?

‘শূন্য থেকে পাইথন মেশিন লার্নিং’ বই থেকে

উত্তর দেয়ার আগে দুটো জিনিস নিয়ে আলাপ করি।

ক. আমাদের ছোটবেলার কথা। ডাক্তারের কাছে গেলেই গুনে গুনে বেশ কিছু দেখতেন। শুরুর্তেই, ‘বারু, জিহবা দেখাও’। পাশাপাশি চোখের নিচ অথবা হাত ধরে হার্টবিট দেখতেন প্রায় সব সমস্যার জন্য। এখনকার মতো অত টেস্টিং ফ্যাসিলিটি ছিল না ওই সময়ে। তবুও কিন্তু বলতে পারতেন অনেক কিছু। নির্ভুলভাবে। যেমন, হিমোগ্লোবিন কম না বেশি। কীভাবে?

কীভাবে টেস্ট ছাড়াই প্রায় নির্ভুল ‘প্রেডিক্ট’ করতে পারতেন ডাক্তাররা? অভিজ্ঞতা। মানে, মনে রাখা আগের রোগীর ডেটা। যেমন, মুখ ফ্যাকাসে থাকলে অথবা চেহারায়া ক্লান্তভাবে হিমোগ্লোবিনের অভাবের সিম্পটম হিসেবে ধরা হয়। বয়স আর গড়ন অনুযায়ী ওজন কম মনে হলে ডাক্তার ধরতে পারতেন ওই সিম্পটম। সিম্পটমগুলো ছিল ভ্যারিয়েবল। কয়েকটা মিললেই বলতেন হিমোগ্লোবিন কম না বেশি। এই অভিজ্ঞতাটা যখন যন্ত্রকে শেখাব, তখন সেটা হবে মেশিন লার্নিং।

খ. ধরুন, আপনি একজন মোবাইল অপারেটরে কাজ করছেন। বিলিংয়ের জন্য আপনার কাছে বেশকিছু ডেটা আছে সাবস্ক্রাইবারদের সম্পর্কে। মানে, উনি কী ধরনের প্যাকেজ ব্যবহার করছেন, দিনে কত কথা বলছেন, গড় কত মিনিট করে কথা বলছেন, কখন কখন আপনার সিম খুলে ফেলছেন, ডেটা ব্যবহার কি বাড়ছে নাকি কমাচ্ছেন ইত্যাদি ধরনের বেসিক ডেটা। এ ছাড়া উনার মাসিক খরচ, উনি কত দিন ধরে আপনার কোম্পানির সঙ্গে আছেন, গত তিন মাস ধরে গড়ে কত মিনিট করে কথা বলছেন, কতটুকু করে ডেটা ব্যবহার হচ্ছে, বাড়তি ডেটা পরের মাসে রোলওভার হচ্ছে কি না, তার হ্যান্ডসেটের মডেল, তার দাম, ওই হ্যান্ডসেটটা কত দিন ধরে ব্যবহার করছেন, পোস্টপেইড না প্রিপেইড ইত্যাদি ইত্যাদি ডেটা আছে আপনার কাছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানে আপনাকে বের করতে হবে, কোন কোন ব্যবহারকারী সামনের মাসে আপনার কোম্পানি ছেড়ে চলে যাবেন? মোবাইল নেটওয়ার্কে একেকজন সাবস্ক্রাইবারকে নিজের নেটওয়ার্কে আনতে যে খরচ হয়, সেটা না উঠলে বেশি ক্ষতির মুখে পড়ে অপারেটরগুলো। সেজন্যই এই হিসেব-কিতাব করতে হয় প্রায়শ। মজার কথা, এর উত্তর আছে কিন্তু মোবাইল অপারেটরের কাছে রক্ষিত ডেটাতে। যে পদ্ধতিতে আপনি এর উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করছেন সেটাই মেশিন লার্নিং। মানে আপনার তথ্যের ভেতরে যেই কো-রিলেশন আছে, সেটা জানতে পারলেই কেবল ফতে।

আসলে মেশিন লার্নিং ব্যাপারটা হচ্ছে একটা ধারণা, যার মাধ্যমে কোনো প্রশ্নের উত্তর ডেটা থেকে দেওয়া যায়।

এখন সবকিছুতেই ‘এআই’ বলার ধারণা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে বিশ্বায়নের প্রভাবে অনেক কোম্পানি তাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের ব্যাপারে এই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা জানাচ্ছেন। বিশেষ করে, তাদের প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস বিক্রি করার সময়। দেখা গেছে, বিজ্ঞাপনের প্রায় ৪০ শতাংশ প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসগুলোতে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অথবা মেশিন লার্নিংয়ের ব্যবহারের উপযোগিতা নেই। এখানেই একটা বড় বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। কোথায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার হবে, সেটাই জানে না অনেকে। এমনকি, এই ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে। এ ব্যাপারে আমি কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির মেশিন লার্নিং ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান টম মিচেলের কথা বলতে পারি। তার ধারণাটা দেখুন নিচে।

কীভাবে একটা কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করব যে শিখবে?

উনি বলেছেন, মেশিন লার্নিংয়ের ব্যাপারে জানতে হলে প্রথমে একটা প্রশ্ন করতে হবে।

মিচেলের সেই বিখ্যাত প্রশ্ন

১. আমরা কীভাবে একটা কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করতে পারি, যা তার অভিজ্ঞতাকে আস্তে আস্তে কাজে লাগিয়ে আরও উন্নতি করতে পারবে?

২. এই অভিজ্ঞতার জন্য যন্ত্রের শেখার ব্যাপারে কী কী জিনিস কাজ করছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে টম মিচেল বলেছেন, ‘মেশিন লার্নিং হচ্ছে কম্পিউটার অ্যালগরিদমের সেই বিদ্যা, যেটা কম্পিউটার প্রোগ্রামকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নতি করবে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে।’

সত্যি বলতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ঠিকমতো কাজ করাতে গেলে অন্য সব কাজের মধ্যে মেশিন লার্নিং ও একটা ভালো রাস্তা। সেখানে মেশিন লার্নিং ছোট অথবা বড় ডেটাসেট থেকে বিভিন্ন প্যাটার্ন ও ধারণা, তার অভিজ্ঞতা হিসেবে পেয়ে থাকে। মানুষ যখন ছোটবেলা থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখে, কম্পিউটার প্রোগ্রামের জন্য এই একই পদ্ধতি আস্তে আস্তে বিভিন্ন ডেটাসেট ব্যবহার করে তার অভিজ্ঞতা বাড়ায়।

যেভাবে শুরুরতেই একটা সেলফ-ড্রাইভিং অ্যালগরিদম যেভাবে রাস্তায় চলতে পারবে না, সেভাবে ওই অ্যালগরিদম অনেক রাস্তা এবং ডেটাসেট দেখে ভালো ড্রাইভার হতে পারবে। একদম মানুষের মতো করে। মানুষ যেভাবে শুরুরতে আস্তে আস্তে হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে শেখে, সেখানে ভবিষ্যতে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ি ড্রাইভিংয়ে পরিপক্বতা লাভ করে। মোদাকথা, মানুষ যেভাবে শেখে, যন্ত্র অথবা অ্যালগরিদমকে সেই একই পদ্ধতিতে শিখতে হবে। সেটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা দিয়ে। যন্ত্রের জন্য অভিজ্ঞতা হচ্ছে পুরোনো ডেটা।

লেবেলিং মানে এই জিনিসের এই নাম

ধরা যাক, আমাদের কাছে অনেক মানুষের এক্সরে'র ডিজিটাল ইমেজ আছে, যার মধ্যে কারও কোন হাড় ভাঙা থাকলে সেটাকে বলে দেওয়া হয়েছে। একে 'লেবেলিং' বলা যায়। এখন যদি এই মডেলকে নতুন একটা এক্সরে ইমেজ দেওয়া হয় তাহলে সেই ইমেজের মধ্যে কারও হাড় ভাঙা আছে কী নেই, সেটার ওপর ভিত্তি করে সেই অ্যালগরিদম বলে দেবে। এর অর্থ হচ্ছে, আগের ছবিগুলোতে 'লেবেল' দেওয়া আছে। অর্থাৎ কোনটাতে হাড়ভাঙা আর কোনটাতে সেই হাড়ভাঙা নেই। এগুলো হচ্ছে ট্রেনিং ডেটা। যাকে আমরা যন্ত্রের অভিজ্ঞতা বলছি। এরপর, নতুন একটা এক্সরে ইমেজ দেওয়া হলো যার লেবেলিং করা নেই, অর্থাৎ যন্ত্র তার অভিজ্ঞতা থেকে বলবে এই ইমেজে হাড়ভাঙা ব্যাপারটা আছে কী নেই। এটাই মেশিন লার্নিং। মেশিন তার অভিজ্ঞতা থেকে বলছে।

ডিপ লার্নিং ব্যাপারটা কী?

সৃষ্টি এবং স্বত্তা

Some people worry that artificial intelligence will make us feel inferior, but then, anybody in his right mind should have an inferiority complex every time he looks at a flower.

—Alan Kay

সবকিছুর পেছনের দর্শনটা জানলে অনেক কিছুই বোঝা সহজ হয়।^{১০}

আমরা যাকে মেশিন লার্নিং বলি, সেটার একটু স্পেশালাইজড ভাগ হচ্ছে এই ডিপ লার্নিং। সবই মেশিন লার্নিং, তবে মানুষের চিন্তা করার প্রসেস, মাথার নিউরাল নেটওয়ার্ক যেভাবে কাজ করে, সেটার একটা সিমপ্লিফাইড ভার্সন হচ্ছে এই ডিপ লার্নিং। ভয় পাবেন না। ব্যাপারটাকে আরেকটু খোলাসা করছি।

অ্যাবস্ট্রাকশন, জট খোলা

ধরা যাক, আমরা মিউজিয়ামে বিশাল একটা কমপ্লেক্স ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ছবিটার আগা-মাথা না পেয়ে একটু পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওমা, আস্তে আস্তে জট খোলা শুরু করল। আচ্ছা, ওটা তো পা, তাই না? এখন মনে হচ্ছে, একটা মানুষ পতাকা ধরে আছে। তার পেছনে একটা পশুর আকৃতির মতো বোঝা যাচ্ছে। মানে, একটা ‘অ্যাবস্ট্রাক্ট’ ছবি বোঝা শুরু করলাম। কীভাবে? ভেতরের ‘প্যাটার্ন’ উদ্ধার করে।

স্পেন মিউজিয়ামের শহর। ছবি দেখতে গিয়ে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। শেষে এই ব্যবস্থা। স্টেপিং ব্যাক।

আর সেটাই-বা কীভাবে সম্ভব? বলছি।

ডিপ লার্নিংয়ের একটা শুরুর কনসেপ্ট হচ্ছে ‘অ্যাবস্ট্রাকশন’, জটিল বিষয়কে সহজভাবে বুঝতে ধাপে ধাপে, ‘লেয়ার বাই লেয়ার’ কীভাবে সমাধান করা যায়। ওই কমপ্লেক্স ছবি বোঝার মতো। ধরুন, যন্ত্রকে অনেক মানুষের মাথার ছবি দেওয়া হলো। বলা হলো, আপনার বন্ধুবান্ধবের ছবিগুলো থেকে

১০. এই অংশটার অংশবিশেষ নিয়েছি আমার নিজের ‘কোরা’রে পোস্টিং থেকে।

আপনাকে আলাদা করতে। যন্ত্রতো মানুষের মতো অতো বুদ্ধিমান না, কী করবে সে? হাঁটি হাঁটি পা পা করে?

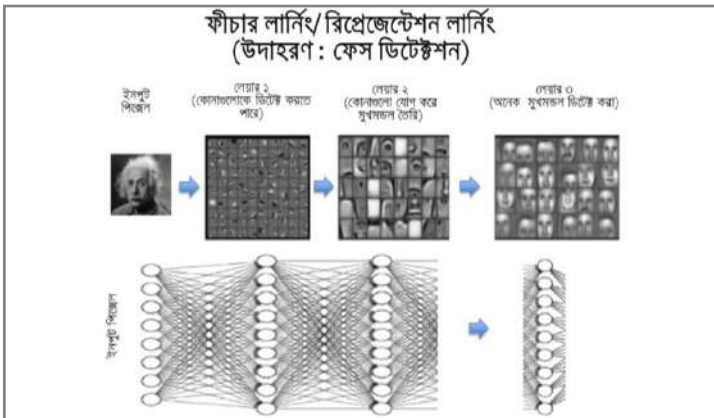
একটা সম্ভাব্য উপায় হতে পারে এ রকম: (১) প্রথমে ছবিতে গোল মাথাটা আগে বের করার চেষ্টা করবে, (২) এরপর ছবির পিক্সেলের ‘ইনটেনসিটি’ বুঝে মুখের বিভিন্ন ফিচার, যেমন চোখ, নাক, চিবুক, ভুরু, ইত্যাদিকে বিভিন্ন ভাগে ফেলবে, (৩) এরপর চোখের একটা ‘কোনা’কে আলাদা করে ফেলবে সে। অথবা নাকের একটা অংশ। ৩ নম্বর ছবিটা দেখুন।

লেয়ারের ধারণা, কীভাবে জট খোলে?

এর মানে কী? মানে ওই কমপ্লেক্স ছবি বোঝার মতো করে, একটা একটা করে ফিচার আমরা ‘অ্যাবস্ট্রাক্ট’ করার চেষ্টা করেছি। কীভাবে? একেকটা লেয়ারে। মানে, প্রথম লেয়ারে মাথার গোলাকার অংশ, পরের লেয়ারে চোখ, নাক, চিবুকের কোনা। এই অংশগুলোকে যখন জোড়া লাগাবে, তখন পরের কয়েকটা লেয়ারে একটা পুরো চোখ অথবা নাক সে বুঝতে পারবে। চোখ, নাক, কপাল, চিবুক এসব ঠিকমতো বুঝতে পারলে পরের কয়েকটা লেয়ারে পুরো মুখমণ্ডল সে বুঝতে পারার কথা।

বেশি গুলিয়ে ফেলেছি? না? হ্যাঁ?

একটা ছবি দেখা যায়। ‘আ পিকচার ওর্থ থাউজ্যান্ড ওয়ার্ডস’।



চিত্র ৩: একটা একটা করে ফিচার আমরা ‘অ্যাবস্ট্রাক্ট’ করার চেষ্টা

যদি ‘না’ হয়, তাহলে বলব, এই একই কাজ করে মানুষের মাথার নিউরাল নেটওয়ার্ক। লেয়ার ধরে। মানুষ এ পর্যন্ত যা-ই আবিষ্কার করেছে, তার সবকিছুই সে ধারণা নিয়েছে প্রকৃতি থেকে। বিমান, সাবমেরিন, এসেছে পাখি, আর মাছের ধারণা থেকে। মেশিন কীভাবে শিখবে, সেটার ধারণা নিয়েছে ‘মানুষ কীভাবে শেখে’। একই কনসেপ্ট। একেক ক্লাস একেক লেয়ার। হঠাৎ করে তো আমরা শিখিনি। শিখেছি লেয়ার ধরে, একেকটা ক্লাস পাড়ি দিয়ে। বয়সের সঙ্গে।

সে রকমভাবে মাথার নিউরালের মতো ডিপ লার্নিং মডেল একেকটা লেয়ার থেকে যত বেশি সামনের লেয়ারে এগোবে, ততই সে কমপ্লেক্স ফিচারগুলোকে ঠিকমতো আইডেনটিফাই করতে পারবে। এটা সে করতে পারে যেহেতু সে আগের লেয়ারে নিচের ফিচারগুলোকে একসঙ্গে ‘অ্যাগ্রিগেট’ এবং ‘কম্বাইন’ করে যোগ করতে পারছে ফিচারগুলোকে। এই একই কাজ করবে ‘অটোনোমাস’ গাড়ি রাস্তায় নেমে। রাস্তার ‘এজ’, শেষ অংশ বা স্পিডলিমিট, ট্রাফিক লাইট ধরে ধরে বুঝতে পারবে।

তাহলে কী বোঝা গেল?

লেয়ারে লেয়ারে বুঝে এগিয়ে যাওয়া

প্রথম লেয়ার হচ্ছে ইনপুট লেয়ার। ছবির সব পিক্সেল যাবে এখানে। আপনার পুরো মুখমণ্ডল বুঝে যাবে শেষ লেয়ারে, মানে যেখানে সে বলবে এই ছবিতে আপনি। এটা শেষ লেয়ার, অর্থাৎ আউটপুট লেয়ার। মাঝখানে আপনার চোখ, কান, নাক বুঝে গেল যারা, তারা হিডেন লেয়ার। সেই লেয়ার অনেক হতে পারে সমস্যার কমপ্লেক্সিটির ওপর ভিত্তি করে।

এখন আপনি শেখাতে পারবেন আমাকে। এখন বলুন এই যে বিভিন্ন লেয়ারে একেকটা কাজ হলো চোখ, নাক, চিবুকের কোনা চিনে চিনে জিনিস আলাদা করা, এটাকে ডিপ লার্নিংয়ের ভাষায় কী বলে? বিশেষ করে ফিচারকে আলাদা করার এই কনসেপ্ট?

ঠিক ধরেছেন! ‘ফিচার এক্সট্রাকশন’। এই যে বিভিন্ন লেয়ারে একেকটা ফিচার মানে চোখ, কান, নাক ধরে ধরে ‘আইডেনটিফাই’ করার এই আইডিয়াটার জন্য ডিপ লার্নিং! এটুকু বুঝলেই ‘ডিপ লার্নিং’ বোঝা অর্ধেক শেষ। সাধারণ মেশিন লার্নিংয়ে ফিচার এক্সট্রাক্ট করি আলাদাভাবে

‘ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং’ দিয়ে। ডিপ লার্নিংয়ে নিউরাল নেটওয়ার্কের এই ‘ফিচার এক্সট্রাকশন’ ব্যাপারটা কিছুটা অটোমেটিক। তাই বললে সব সময় যে ডিপ লার্নিং ভালো সেটাও নয়। মেশিন লার্নিং না বুঝে ডিপ লার্নিং বুঝতে গেলে পুরো জিনিসটাই ব্ল্যাক বক্স মনে হবে। ডিপ লার্নিংয়ের একটা অসাধারণ কনসেপ্ট হচ্ছে ব্যাক-প্রপাগেশন। আমাদের মডেলের ট্রেনিংয়ের সময় ভুলগুলোকে কমিয়ে আনতে এই জিনিসটার ধারণা এসেছিল সেই ১৯৬০ সালে।

ইতিহাস? আমরা প্রস্তর যুগের মানুষ বলে জানতে হয় অনেক ইতিহাস। সেটাও কাভার করছি সামনে। আমরা ভুল কমাই কীভাবে? বাচ্চারা একবার আগুনে হাত দিয়ে বোঝে, আর জীবনে যাওয়া যাবে না ওখানে। এটাই ‘এরর কারেকশন’। ডিপ লার্নিংয়ের ভাষায় ব্যাক-প্রপাগেশন।

অভিজ্ঞতা এবং মাথার নিউরাল নেটওয়ার্ক

আমার বিগ ডেটা (মিলিয়ন মিলিয়ন ডেটা রেকর্ড) নিয়ে কাজের ধারণা আসে ২০০৮-০৯ সালের দিকে। সব মোবাইল, ল্যান্ডলাইন ফোনের মিনিট প্রতি চার্জের সঙ্গে একেকটা অপারেটরের আন্তঃসংযোগের হিসেব এবং তার প্রজেকশন করতে গিয়ে। ডেটা যে কথা বলে, সেটা বুঝতে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি আর। ডেটা মিথ্যা বলে না। তখন কাজ করতাম স্টাটিসটিক্যাল প্যাকেজ নিয়ে। এখন সেটাকে আমরা রংচং লাগিয়ে বলছি মেশিন লার্নিং। একই জিনিস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটা মেশিন/ডিপ লার্নিং বুটক্যাম্পে গিয়ে বুঝলাম একটা সত্য কথা। দরকার কমনসেন্স। পাশাপাশি ক্রিটিক্যাল থিংকিং। নিজস্ব ডোমেইনে। যেমন হেলথকেয়ার প্রফেশনাল তার ডোমেইনে ভালো ডেটা সায়েন্টিস্ট হবে, এটাই সত্য। প্রোগ্রামিং সবাই পারে, কিন্তু ডেটার ভেতরের বায়াস, তার ফ্রিকোয়েন্সি, কী কী অ্যানামলি আছে, সেটা বুঝতে পড়ে থাকতে হবে ডেটা নিয়ে। ভালোবাসতে হবে ডেটাকে, পরিবারের সদস্যদের মতো করে। সবার বকাবকি শুনেও।

আমরা যতই এই ডিপ লার্নিং নিয়ে এখন লাফালাফি করি না কেন, এই কনসেপ্ট অনেক অনেক পুরোনো। ‘আরবের লোকেরা যখন মারামারি করত’ সেই সময়ের না হলেও বেশ পুরোনো। ডিপ লার্নিংয়ের ইতিহাস জানতে ফিরে যাব সেই ১৯৪৩ সালে, দুজন বিজ্ঞানী একটা কম্পিউটার

মডেল তৈরি করেছিলেন মানুষের মাথার নিউরাল নেটওয়ার্ককে ভিত্তি করে।

‘এআই’ উইন্টার, তারপর?

তারপরে কিছু কাজ হলেও সেটা তেমন সাফল্যের মুখ দেখেনি কয়েকটা কারণে। একটা ‘এআই উইন্টার’। মানে কিছুটা ডটকম বাবলের মতো। অনেক আশা নিয়ে প্রচুর ইনভেস্টমেন্টের পরও কাজ দেখাতে পারেনি এই জিনিস। আমরা যেহেতু প্রস্তর যুগের মানুষ, আমাদের দেখতে হয়েছে অনেক কিছু। এরপর এসেছিল দ্বিতীয় এআই উইন্টার। শেষ রক্ষা হয়নি।

তবে, এবারের ঘটনা ভিন্ন। একটা উদাহরণ দিই। বাংলা আমাদের ভাষা হলেও গুগল ভয়েস এপিআই (তার একটা প্রোডাক্ট জিবোর্ড, গুগল কিবোর্ড) ‘টেক্সট টু স্পিচ’ে যে অ্যাকুরেসি দেখাচ্ছে, সেটা সম্ভব হয়েছে সেই একই কারণে। অনেক অনেক ডেটা আছে গুগলের কাছে। মানে কোটি ভয়েস স্যাম্পল। আর পাশাপাশি আমরা ঠিক করে দিয়েছি যখন সে ভুল টাইপ করেছে। মোদা কথা একটাই। একসঙ্গে হাজার কোটি ডেটা হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা। কীভাবে সম্ভব হলো?

আগেই বলেছি, ১. হাজার কোটি ডেটা। ২. সেগুলোকে একসঙ্গে হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা। কারণ, বেড়েছে প্রসেসিং স্পিড। এখন আমাদের হাতের মোবাইলই তো চাঁদে ল্যান্ড করা অ্যাপোলো গাইডেন্স কম্পিউটার থেকে হাজার গুণ ফাস্ট! পাশাপাশি কমেছে স্টোরেজের দাম। আপনার হার্ডডিস্কের কথাই ধরুন। বেড়েছে মেমরির সক্ষমতা। ডিপ লার্নিং না হয়ে যাবে কোথায়? আর গেমারদের ‘জিপিইউ’ (গ্রাফিকস প্রসেসিং ইউনিট) হাইজ্যাক করে নিয়েছি আমরা। ওমা, শুধু তারাই খেলবে, আমরা খেলব না? এই জিপিইউ এখন আমাদের হাতিয়ার— দূতগতির ট্রেনিংয়ের জন্য।

ডিপ লার্নিংয়ের একটা বড় অংশ হচ্ছে ইমেজ, মানে ভিজুয়াল— যন্ত্রকে দেখে চিনতে হবে। মানুষের জন্য চোখ ও মাথার কো-অর্ডিনেশন যেমন, ছবিকে ঠিকমতো চিনতে ১৯৭৯ সালে জাপানিজ এক ভদ্রলোক একটা টেকনিক নিয়ে আসেন, যেটাকে আজকে আমরা বলি ‘কনভলুশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক’ (সিএনএন)। নিউরাল নেটওয়ার্কের মধ্যে এই অপটিমাইজেশন দেখলে মাথা খারাপ হবে আপনার। যারা ডিপ লার্নিং শিখবেন, তারা এই ‘সিএনএন’ ছাড়া এগোতে পারবেন না।

এখন আসি, আসল কথায়, কীভাবে শিখবেন ডিপ লার্নিং?

নো ‘ডিপ লার্নিং’ উইথআউট বেসিক ‘মেশিন লার্নিং’

আসল কথা, আমি যেভাবে এই মুহূর্তে শিখতে চাইতাম, সেটা বললে মন খারাপ হতে পারে। আমি শটকাট বলতে পারি, কিন্তু সেটা লংটার্মে কারও ভালো হবে না। মন খারাপ হলেও আমি বলছি, মেশিন লার্নিং না শিখে ডিপ লার্নিংয়ে যাওয়াটা অনেকটাই আত্মঘাতী। ইংরেজি গ্রামার ছাড়া ইংরেজি বলতে পারবেন, তবে সেটা কেমন শোনাবে সেটা আপনারা ভালো জানেন।

তাহলে কি ঠিক হলো? নো ‘ডিপ লার্নিং’ উইথআউট বেসিক ‘মেশিন লার্নিং’। এটা না মানলে বাকিটা পড়ার দরকার নেই।

এখন আসি সমস্যার জায়গায়।

ধরে নিচ্ছি, পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে। ১. নন-প্রোগ্রামার, ২. প্রোগ্রামার।

নন-প্রোগ্রামারদের রুটটা সোজা। মানে, তাদের শেখানো সোজা।

কেন বললেন এই কথা? আপনার প্রশ্ন। কারণ, তাদের ‘প্রেন্ড্‌ডিস’ থাকে না। মানে ‘আমি তো এটা জানি ওটা জানি’। ফলে তারা মনোযোগী হন না পুরো সময় ধরে। ফলে মিস করেন অনেক কানেক্টিং লিংক। এটা অনেক ইম্পরট্যান্ট। তবে ‘আসল’ ভালো প্রোগ্রামাররা সারাজীবন ওপেন মাইন্ডেড থাকেন নতুন কিছু শিখতে।

শেখার জন্য দরকার সঠিক মাইন্ডসেট

যারা নন-প্রোগ্রামার, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ আসেন এই মনোভাব নিয়ে— ‘আমি তো কিছুই জানি না’, আমাকে শিখতে হবে। ‘রেইন অর শাইন’। এটা তাদের জন্য জীবন-মরণ সমস্যা। তাই তারা অনেকটাই ওপেন মাইন্ডেড। তারা জানেন, এই জিনিস শিখতে তাদের যা যা শেখার দরকার, সেটা শিখতেই হবে।

আপনি কি জানেন মাইক্রোসফট এক্সেল দিয়েও ‘মেশিন লার্নিং’ শেখা সম্ভব? এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যে কয়েকটি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে মেশিন লার্নিংয়ে কাজ হয়, তার মধ্যে ‘আর’ এনভায়রনমেন্ট দিয়ে শেখা সোজা।

লার্নিং কার্ভ সে রকম ‘স্টিপ’ নয়। শুরুরটা একদম সোজা। স্ট্যাটিসটিকস এনভায়রমেন্ট থেকে এসেছে এই ‘আর’ প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট। এর অর্থ হচ্ছে ডেটাকে ঘিরে তৈরি তৈরি হয়েছিল এই ‘আর’ প্যাকেজ। একদম শুরু থেকে। আমি ‘এসপিএসএস’ও ব্যবহার করেছি, তবে ‘আর’ হচ্ছে সবকিছুর বেসিক।

আমাকে প্রশ্ন করলে বলব, ‘আর’ দিয়ে মেশিন লার্নিং শেখা অনেক সহজ। বিশেষ করে শুরুর দিকে। ডেটার ভেতরের পার্সপেকটিভ পেতে সুবিধা হয়। পাশাপাশি ‘পাইথন’ ইউনিভার্সাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে মেশিন লার্নিংয়ে ব্যবহার হচ্ছে। ডেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে ‘আর’-এর একটা কমান্ড সেই কাজটা করে দিতে পারে, সেটা পাইথনে লাগবে কমবেশি ৫ লাইনের কোড।

তবে, প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট নিয়ে বেশি বলব না। কারণ, এটার সঙ্গে পার্সোনাল প্রেফারেন্স সংযুক্ত। যার যেখানে সুবিধা, তাতে সমস্যা নেই। কথা হচ্ছে, যারা প্রোগ্রামিং জানেন না, তাদের জন্য ‘মেশিন লার্নিং’ শেখা বরং সহজ। অনেক কিছু ‘আন-লার্ন’ করতে হবে না। প্রথাগত প্রোগ্রামিংয়ের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করেই এসেছে মেশিন/ডিপ লার্নিং। প্রোগ্রামিং হচ্ছে একটা রুলসেটের ওপর ভিত্তি করে। মেশিন লার্নিংয়ের উল্টো। ডেটা বলে দেবে কী রুল হবে, যা পাল্টাবে ডেটার ওপর ভিত্তি করে।

তবে শুরুতে প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো। মেশিন লার্নিংয়ের পেছনের দর্শন জানলে শেখা খুব সহজ হয়। আপনি জানেন কোথা থেকে কোথায় যেতে হবে। এবং এখন কোথায় আছেন। যেহেতু আমার মেশিন লার্নিং বন্ধুরা আছেন পৃথিবীজুড়ে, তারা বলেন একটা কথা। যদি শিখতে চাও মেশিন লার্নিং, তাহলে শুরু করো ‘প্রজেক্ট টাইটানিক’ দিয়ে। ‘দিস ইস দ্য গেটওয়ে টু মেশিন লার্নিং’। পিরিয়ড। আপনি যদি সমস্যাটা ঠিকমতো বুঝতে পারেন, তাহলে সমাধান হাতের কাছেই।

কেন? তাহলে গল্পটা বলতে হবে। আছে তো সময়?

টাইটানিকের গল্প এবং বেঁচে যাওয়ার প্রেডিকশন

হিউম্যান ফ্যাক্টর

Sometimes when you are dealing the data sets like this, the human side of the story can get lost beneath the complicated math and statistical analysis. By examining passengers for whom our classification model was incorrect, we can begin to uncover some of the most fascinating, and sometimes tragic, stories of humans defying the odds.

—Would You Survive the Titanic? Patrick Triest

কাহিনির সাল ১৯১২। সত্য ঘটনা। ধন্যবাদ দিতে হয় জেমস ক্যামেরনকে।
উনি আমাদের বাঁচিয়েছেন নতুন করে গল্পটা ফাঁদতে। এই ‘আন-সিন্কেবল’
মানে ‘ডুববার নয়’ আরএমএস টাইটানিক’ ডুবে যায় আটলান্টিক পাড়ি
দেবার সময়। একদম প্রথম যাত্রায়। আইসবার্গে ধাক্কা লেগে। তখন রাত
১১:৪০। ধারণা করতে পারি, ২২২৪ জন যাত্রী আর ক্রুর মধ্যে প্রায় সবাই
ঘুমাতে গিয়েছিলেন নিজ নিজ কেবিন অথবা বাংকারে। পরের ঘটনা
সবার জানা।

১৫০২ জন মারা যান ওই যাত্রায়।

এই সত্যি ঘটনাকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে এই কালজয়ী সমস্যা। এখানে
আমাদের দেওয়া হয়েছে দুটো ডেটাসেট। একটাতে দেওয়া হয়েছে ৮৯১
জন মানুষের সম্পর্কে ১২টা ফিল্ড। সেখানে একটা ফিল্ড আছে, যার মধ্যে
বলা আছে উনি বেঁচে গিয়েছিলেন না মারা গিয়েছিলেন ওই যাত্রায়। খেয়াল
করুন ব্যাপারটা। সত্যিকারের ডেটাসেট। ইন্টারনেটে আছে সবার নাম।
দেওয়া আছে তাদের ভাগ্য। বানানোর কিছু নেই এখানে।

এখন আসুন সমস্যাতে। আরেকটা ডেটাসেট দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে
মানুষগুলোও নতুন। ওই ৮৯১ জনের বাইরের মানুষ উনারা। উনাদের
ভাগ্য বের করব আমরা। ৪১৮ জন প্যাসেঞ্জারের। সারিও ৪১৮টা। ওখানে
সব ফিল্ড আছে, ওই একটা ফিল্ড ছাড়া। যেটাতে বলা ছিল উনি বেঁচে
অথবা মারা গিয়েছিলেন। আমরা জানি না তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল।

তো, টাইটানিক চ্যালেঞ্জটা কী?

ওই ৪১৮ জন মানুষের ডেটাসেট থেকে প্রেডিক্ট করে বের করতে হবে কারা বেঁচে অথবা মারা গিয়েছিলেন। আমি যখন প্রথম প্রথম এটা নিয়ে কাজ শুরু করি, তখন অবাকই হয়েছিলাম। এটা কীভাবে সম্ভব? আমি কীভাবে জানব? মানুষের মৃত্যু প্রেডিক্ট করা আমাদের কন্ম নয়। আর মেশিন লার্নিং-ই-বা কীভাবে পারবে?

আরও চারটা বই, প্রযুক্তির ধারণায়

আমি কথা দিতে পারি একটা। আপনারা যদি এই মেশিন লার্নিং সমস্যাটা সলভ করতে পারেন, তাহলে ডিপ লার্নিং আপনারদের জন্য খুবই সহজ। সত্য বলছি। আমার বয়স ৫১। একটা জিনিস বলতে পারি। যেকোনো সমস্যার ভেতরে তার সমাধান লুকিয়ে থাকে। তাই সমস্যাটা বোঝা জরুরি। বিশেষ করে এটার হিউম্যান এলিমেন্ট। ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং। বেশি বলে আকর্ষণ নষ্ট করতে চাই না।

আরেকটা জিনিস।

‘স্টার্টিং ইজ হাফ দ্য ব্যাটেল’।

‘হাতেকলমে মেশিন লার্নিং’ বইটা হাতে থাকা মানে হচ্ছে আপনি শুরু করে দিয়েছেন। যারা প্রযুক্তি দিয়ে হাতেকলমে শিখতে চান, তাদের জন্য রয়েছে আমারই আরও চারটা বই।

শব্দের এমবেডিং প্রজেক্টর, ঘটনার সিগনেচার

মানুষের মন, ‘নিউরোসায়েন্স’ এবং ‘নিউরাল নেটওয়ার্ক’

মানুষের মন নিয়ে আমি কখনো ‘এক্সপেরিমেন্ট’ করতে চাইনি। তবে একজন মানুষ কী চিন্তা করছেন আর সেটা উনি না বলা পর্যন্ত আমরা এখনো সেভাবে জানতে পারি না। উনি ‘যেটা বলছেন না’ সেটা উনাদের ‘ব্রেইন স্ক্যান’ না করলে বোঝা অনেকটাই অসম্ভব। তবে, এই ব্রেইন স্ক্যানের অংশটুকু এখনো শুরুর পর্যায়ে মানে ঘষামাজার মধ্যে রয়েছে। মানুষের মনের উত্তেজনা, দুঃখ জিনিসগুলোর কিছু ‘ভিজুয়াল’ আসছে সেই ‘প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স’ স্ক্যানে। ব্যাপারটা বোঝানো বেশ কঠিন, বিশেষ করে ‘নিউরোসায়েন্স’ আমার বিশেষত্ব নয়।

তবে, সেটার কিছুটা ‘স্লিকপিক’ অর্থাৎ ছিটেফোঁটা ধারণা পাই যখন ‘নিউরাল নেটওয়ার্ক’ নিয়ে কাজ করছি। একজন অথবা একটা গোষ্ঠীর মানুষ সামনে কী করবে, সেটা বের করতে চাইছে মানুষ। সেটার সামাজিক চাহিদা এবং ব্যবসায়িক ইমপ্লিকেশন চলে গেছে আরও সামনে। সেগুলোর কিছু ধারণা পাই আমাদের ডিজিটাল ডিভাইসে। আমি যা সার্চ করতে চাই (যা এখনো আমাদের মনের মধ্যে আছে) সেটাও চলে আসছে লেখার আগেই। আমি কী মুভি, ভিডিওটা দেখতে চাই অথবা কাকে এবং সেই ইমেইলে কী লিখব, সেটার অনেক কিছুই লেখা হয়ে যাচ্ছে আগে থেকে।

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা’র ধারণা

You aren’t necessarily aware that when you tell me what music you listen to or what TV shows you watch, you are telling me some of your deepest and most personal attributes.

—Christopher Wylie, the Cambridge Analytica whistleblower

প্রেডিকশন ও প্রেডিকশন

সত্যি বলতে এ ধরনের কিছু অ্যাপ্লিকেশন আমরা এখনই দেখছি কাজে লাগছে। আপনি কোন জিনিসটা কালকে অর্ডার করবেন অথবা কোন মানুষটা কী ধরনের মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই মানুষটা সামনে অন্যান্য সবার জন্য বিপজ্জনক হতে পারেন কি না সে ধরনের মানসিক অ্যানালাইসিস নিয়ে কাজ চলছে বহুদিন ধরে। একটা মানুষ কখন তার নিজের জীবন নিয়ে নিতে পারেন, সেটা আগে থেকে ধারণা করে তাকে সাহায্য করার কাজ শুরু হয়ে গেছে অনেক জায়গায়।

এর পাশাপাশি, আপনি সাধারণত যাকে ভোট দিয়ে থাকেন এবং আপনার কোথায় কাজ করলে আপনি সেই ভোট অন্যকে দেবেন স্বেচ্ছায়, সে ধরনের কাজ দেখেছি অনেক জায়গায়। তবে, মানুষ কী কারণে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেন অথবা পাল্টান, সেটার ট্রিগার পয়েন্টগুলো বুঝলে এই কাজগুলো বোঝা আরও সহজ হয়। সেক্ষেত্রে ‘নাজ’ অর্থনীতি খারাপ নয়। সেটা নিয়ে লিখেছি এই বইয়ের আরেক জায়গায়।

‘মাইন্ড’ ম্যাপিং এবং মনের স্বাধীনতা

তবে, অনেকে পুরো পৃথিবীর কষ্টের ‘বোঝা’ মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও তাকে সাহায্য করতে পারি না, উনি যদি সাহায্য না চান। তার মানে, মানুষটা কী চিন্তা করছেন, সেটাকে ‘উনি যতক্ষণ পর্যন্ত না বলছেন’ ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জানতে পারছি না উনি কী চিন্তা করছেন। সেটা একটা বড় সমস্যা। যদি উনি কিছু করে ফেলেন? তবে, চিন্তার একটা ভালো প্রতিফলন আসে তার লেখায়। মানুষের মন পড়তে না পারলেও তার বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ লেখার ছিটেফোঁটা থেকেও অনেক কিছু বোঝা যায়। সে কারণে মানুষের মনের ভেতরে সরাসরি না ঢোকার চেষ্টা করে তার লেখা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করা যায়। পৃথিবীর বড় বড় বিপজ্জনক লোকগুলোর কাজগুলো হয়ে যাওয়ার পরে তার ডিজিটাল ‘ট্রেস’ দেখে বোঝা গেছে সে সেই দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্য চিন্তাভাবনা করছিল অনেক আগে থেকেই। আমরা সম্পর্কিত ‘ডটগুলোকে কানেক্ট’ করতে পারিনি।

আমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে বলছি না। এখানে যে অংশটুকু সম্ভব অর্থাৎ যেই ‘ভাষা’ আমরা এবং মেশিন পড়তে পারে, সেটার কথা বলছি। মানুষের ভাষার ব্যাপারটা এখনো কমপ্লেক্স হলেও যেটা সম্ভব সেটার কিছু ধারণা নিয়ে আলাপ করতে চাই। মানুষ কী বলছেন এবং সেটাকে কতটুকু আক্ষরিক অর্থে বোঝাতে চাচ্ছেন, সেটা বের করা সম্ভব, যখন কথার সঙ্গে তার গলার টোনের ফ্রিকোয়েন্সি’র ওঠানামা অ্যানালাইসিস করলে সেটার ‘কোরিলেশন’ ভালো ধারণা দেয়। তবে, আমি ‘পলিগ্রাফ’ টেস্ট করতে বসিনি।

যন্ত্র, ভাষা, হেঁয়ালি ও অংক

আর তাই, ভয়েস অ্যানালাইসিসকে ফেলে দিতে চাই, যেহেতু সেটার ‘কমপ্লেক্সিটি’ আমাদের আজকের আলাপের বাইরে। তবে, শুধু টেক্সট অর্থাৎ মানুষের কথার লিখিত অংশটাকে অ্যানালাইসিস করলে অনেক ধারণা পাওয়া যায়। মানুষ কথার মধ্যে অনেক ‘হেঁয়ালি’ করে সেটা যন্ত্রকে দিয়ে করানো প্রায় অসম্ভব। ভাষা জিনিসটাই অনেক কমপ্লেক্স, তবে যন্ত্রকে যখন এই ভাষাকে দিয়ে যোগাযোগ করার জন্য কিছু কাজ করতে গেলাম, সেখানে দেখলাম ভাষার পেছনের পুরো অংশটাই অংক।

ভাষার পেছনে সংখ্যা হবার কারণ হচ্ছে, যন্ত্র সংখ্যা ছাড়া কিছু বোঝে না। আগে যন্ত্র কীভাবে কাজ করে সেটা অনেকটাই স্বচ্ছ হলেও সেটা আস্তে আস্তে মানুষের বোঝার বাইরে চলে যাচ্ছে। আর, সেখানে ভাষার শব্দগুলোকে বিভিন্ন ‘এক্সিসেস’ প্লট করতে গিয়ে দেখি ভেতরের অনেক গল্প। শব্দগুলো একসঙ্গে হয়ে যেন কিছু বলার চেষ্টা করছে। এবং মজার কথা, তারা সেটা বলছেও।

সোশ্যাল মিডিয়া

I'm not a supporter of #DeleteFacebook because it's like saying if you don't want to get electrocuted, get rid of electricity. It's stupid. No, demand better standards for your electricity so you don't get electrocuted... the solution is not to delete these platforms or attack them and make them the enemy, it's to make sure they are doing their job to make a safe environment for people.

—Christopher Wylie

শব্দকে ‘ভিজুয়লাইজেশন’— অনেক ডাইমেনশনে

ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। আমাদের প্রতিটা শব্দ— ধরুন, বাংলা শব্দকে সংখ্যায় নিয়ে যাওয়ার আগে সেটাকে টোকেনে ভাগ করে ফেলি। মানুষ এই শব্দগুলোকে ঠিকমতো বুঝতে চাইলে সেটাকে প্লট করতে হবে। মনে আছে গ্রাফে প্লট করার কথা? আমরা মেশিন লার্নিংয়ের যেকোনো জিনিস বুঝতে চাইলে সেটাকে শুরুতে ‘ভিজুয়লাইজ’ করার জন্য আমরা দুই ডাইমেনশনে প্লট করি। মানুষের মাথা, বিশেষ করে মাথার ‘নিউরাল নেটওয়ার্ক’ এতটাই চমৎকার যে যেকোনো ডেটাকে ঠিকমতো প্লটিং করতে পারলে সেটার মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে বের করে ফেলবে আমাদের অসাধারণ মাথা। তবে সেই ডেটা অনেক, মানে অনেক বেশি হলে খালি চোখে সেটা কয়েক ডাইমেনশনে দেখা কষ্টকর।

তবে, এই শব্দগুলোকে সংখ্যায় পরিবর্তন করলে সেগুলোকে অনেক ডাইমেনশনে অর্থাৎ শতাধিক এক্সিসেস প্লট করলে সম্পর্কের ভালো ধারণা পাওয়া যায়। সেখানে প্রতিটা শব্দের সঙ্গে আরেকটা শব্দের সম্পর্ক, কে কার কাছে এবং দূরে অথবা কে কার থেকে কত দূরে, আপেক্ষিক এবং আসল কাছে-দূরের ধারণা থেকে অসাধারণ প্রজ্ঞা পাওয়া যায়।

ধরুন, গত ২০ বছরের পুরো বাংলাদেশের নামকরা বাংলা খবরের কাগজের প্রতিটা শব্দকে আমরা যদি ১২৮ ডাইমেনশনে (যত বেশি, তত বেশি প্রসেসিং ক্ষমতা দরকার) প্লট করি, তখন সেই শব্দগুলোর মধ্যে কোন শব্দগুলো বারবার ঘুরেফিরে আসছে এবং কোন শব্দগুলো আরেকটা শব্দের সঙ্গে প্রথাগত সম্পর্কিত না হলেও সেখানে ওই ঘটনার জন্য একটা সম্পর্কের হিসেব মানুষকে অন্যভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। এটা নতুন জিনিস।

শব্দের ‘এমবেডিং প্রজেক্টর’ এবং সম্পর্ক, বায়াস, কী মিস করলাম?

শব্দের সম্পর্ক

Machine learning researchers and developers often need to explore the properties of a specific embedding to understand the behavior of their model. An engineer who creates an embedding of songs for a recommendation system might want to verify that the nearest neighbors of ‘Stairway to Heaven’ include ‘Whole Lotta Love’ and not ‘Let It Go’ from Frozen.

–Embedding Projector: Interactive Visualization and Interpretation of Embeddings, Google Brain Team

যখন কয়েক কোটি শব্দকে একটা শব্দের ‘এমবেডিং প্রজেক্টরে’ ফেলবেন, তখন অনেকেই অবাক হবেন এর বিশালতা দেখে। ডেটা সায়েন্সের যুগে এ ধরনের ‘এমবেডিং প্রজেক্টর’ চলে আসছে প্রতিটা ডিপ লার্নিং লাইব্রেরিগুলোতে। এই ‘কানেস্টেড’ অর্থাৎ সম্পর্কিত ডেটা দেখে আমার গতানুগতিক চিন্তাভাবনা পাণ্টেছে গত পাঁচ বছরে। আমরা যেভাবে ধরে নিচ্ছি, এই ঘটনাটা এভাবে ঘটার কথা, কিন্তু সেই ঘটনাগুলো আসলে ঘটছে অন্যভাবে। সে মুহূর্তে মানুষ ‘ক্লু’ না পেলেও পরে সেই ডেটা অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে ভেতরের ঘটনা অন্য। অর্থাৎ, সেই লিড না পেলে আমরা ভাবতাম ঘটনাটা গতানুগতিকভাবে ঘটেছে।

তবে, আমি আরও একটু ভেতরে ঢুকতে চাই। অনেক দিন থেকে কোন ঘটনাগুলো মানুষের চিন্তাভাবনা পাণ্টে দিচ্ছে, সেগুলো ঠিকমতো অ্যানালাইসিস করা গেলে অনেক সময় সেটাকে ‘আইসবার্গের টিপে’র মতো মনে হবে। অনেক ভেতরের ধারণা পাওয়া যাবে সেটা ঘটবে সামনের ৫-১০ বছরে। সেগুলোর কিছু ধারণা এখনই আসছে গত ২০, ৩০ বছরের

ঘটনাগুলোকে ‘ওভারলে’র মতো করে গ্লট করে। একেকটা শব্দের স্পেসের কাছের গ্রুপের মধ্যে অন্য ধরনের শব্দ পেলে সেটাই পাল্টে দিচ্ছে আমাদের মানে অ্যানালিস্টদের গতানুগতিক চিন্তাভাবনা। আমরা তখন ভাবি, ‘এভাবে তো কখনো চিন্তা করা হয়নি’। তাহলে এটা কীভাবে এখানে এল? এখানে অসংগতিটা কেন এল? আমরা কি মিস করেছি? এখানে এত ‘বায়াস’ কেন? এই ‘বায়াসের’ পেছনে ‘ইন্টারলিংকড’ ঘটনা কী? ‘কনটেক্সট’ কীভাবে এল?

ঘটনা/দুর্ঘটনার ইউনিক ‘সিগনেচার’, আরেকটা ঘটনার যোগসূত্র

এর পাশাপাশি এই শব্দগুলোর ‘অ্যাসোসিয়েশন’ অনেক কিছু গতানুগতিক ধারণাকে ভেঙে দেয়। যেকোনো দুর্ঘটনা, সেটা কেন ঘটল অথবা সেই দুর্ঘটনার পেছনে কী কারণ হতে পারে অথবা এ ধরনের দুর্ঘটনা সামনে আবার হবার আশঙ্কা কতটুকু? এগুলো নিয়ে সেই শব্দের ‘এমবেডিং প্রজেক্টর’ আমাদের অনেক নতুন ধারণা দিচ্ছে, যা অসম্ভব ছিল কয়েক বছর আগে, ডেটা এবং শক্তিশালী প্রসেসরের অভাবে।

প্রতিটা ঘটনা/দুর্ঘটনার একেকটা ‘সিগনেচার’ থাকে, যা বোঝা যায় ডেটাকে বড় স্কেলে ফেললে। সেগুলোকে যোগ, বিয়োগ, গুণ অথবা ভাগ করলে তৈরি করা যায় আরেকটা ‘ভবিষ্য’ ঘটনা। কেন একটা ঘটনা ‘কনটেক্সচুয়ালাইজেশন’ করার জন্য আগের সিগনেচার অনেক কাজে দেয়। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যন্ত্রের মনে রাখার অর্থাৎ লম্বা অভিজ্ঞতার ‘লাইফ স্প্যান’ সাহায্য করছে ভবিষ্যৎ তৈরি করতে, যা আমরা চাই। সেটার জন্য দরকার ডেটা। খারাপ ঘটনাকে ঘটার আগেই আটকাতে।

আগাম ধারণার প্রশাসন

সরকার ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা— শুরুর প্রস্তাবনা

দেশীয় উদার নীতিমালা

If the government regulates against use of drones or stem cells or artificial intelligence, all that means is that the work and the research leave the borders of that country and go someplace else.

—Peter Diamandis

শুরুটা হবে কোথায়?

একটা প্রশ্ন প্রায়ই শুনি, আমাদের ডেটা কোথায়? ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন হবার আগে রাষ্ট্র এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিয়ত প্রচুর জনগণের ডেটা নিয়ে কাজ করছে, যা সাধারণত কাগজপত্রে পড়ে আছে বহুদিন ধরে। বিভিন্ন ফর্ম হিসেবে। ফাইল নোটে। নোটশিট হিসেবে। আলমারিতে। ফলে জনগণের এই ডেটাকে প্রসেস করতে হয় টেবিল থেকে টেবিলে—ম্যানুয়ালি, যার আউটপুট আসে অনেক সময় ক্ষেপণ করে।

১৯৯৯ সালে আমার ‘সিঅ্যান্ডএফ’ মানে ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্সি কিছু মাইক্রোসফটের সিডি/ডকুমেন্ট ছাড়ানো হচ্ছিল, সেটাকে সাইন করাতে হয়েছিল অনেকগুলো টেবিলে। শেষ রক্ষা যায়নি শেষে। ‘ইভ্যালুয়েশন’ (স্যাম্পল) সিডির জন্য যে কর এসেছিল, সেটা দিয়ে ছাড়ানো হয়নি জিনিসগুলোকে। পরিবর্তন দরকার সেই প্রসেসের। সেই মানসিকতার। আমরা ভুলে যাই, ১৬ কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন একটা দেশ।

জনগণের জন্ম নিবন্ধন, পাসপোর্ট ডেলিভারি, জমি কেনাবেচা থেকে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন এই সবকিছুর কাগজপত্র কাগজে ফাইল জমা রাখা থেকে শুরু করে এর অ্যানালগ ফাইলিং প্রসেস পদে পদে মানুষের বিশাল মনঃকষ্টের কারণ হিসেবে দাঁড়ায়। পরে এই রেকর্ডগুলোকে আবার ‘রিট্রাইভ’ অর্থাৎ বের করতে যে সময় এবং আলাদা পয়সা খরচ করতে হয় সেখানে ‘সরকারি সার্ভিস ডেলিভারি’ এবং ‘দক্ষতা’ এই দুটো জিনিস বিপরীত মেরুর সমার্থক হিসেবে দাঁড়ায়। এই সমস্যা থেকে বের হবার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে আমাদের দেশে। এখন দরকার, সেটা করার ম্যান্ডেট।

বিজনেস প্রসেস, রুলস অব বিজনেসের সামগ্রিক ধারণা

সমস্যার ভেতরে ঢোকা

Governments should make a genuine effort to understand what people need at different stages of their lives, and what their interactions with government actually look like. This can't be done from the safe space of a government department. It can only be achieved by going out, speaking to people, and experiencing life from their perspective.

—Finding a more human government, Centre for Public Impact, BCG Foundation

কোন জিনিসগুলো শুরু করা যায় এ মুহূর্তে? সরকারি অফিসে অ্যানালগ রেকর্ড প্রসেসিং সমস্যা নয়। সমস্যা একটা প্রসেস তৈরি করা, যেটা সামনে ডিজিটাল সার্ভিসকে সাপোর্ট করবে। এই অ্যানালগ অবস্থায়। সেটাই মাইগ্রেশন স্ট্রাটেজি। যেকোনো সমস্যার প্রযুক্তিগত সমাধান আছে, তবে, সেটা দেখতে হবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

যেমন, এখন ১২ টেবিলে সিগনেচার লাগলে ডিজিটাল সার্ভিসে মাইগ্রেশনের সময় সেটা কমে আসবে ৩ সিগনেচারে। সিগনেচারের জন্য সিগনেচার, নাকি কাজ ডেলিভারি আমাদের অগ্রাধিকার? তবে আমি বলতে পারি, এই ৩ সিগনেচারে সুরক্ষা বেশি হবে। অ্যানালগ কাজে ডিজিটাল প্রসেসের যেই অভ্যন্তরীণ সময় সেটা ডিজাইন করা জরুরি। সামনে ডিজিটাল সিগনেচার বাধ্যতামূলক করা হলে বাকি জিনিস এমনভাবেই উঠে যাবে। আমাদের নীতিমালা আছে, সেটার ‘প্রয়োগ’ নেই।

অনেক অফিসে ডিজিটাল সার্ভিস শেষ পর্যন্ত কাজ করেনি। কারণ, তাদের বিজনেস প্রসেস ছিল ‘সনাতন’ অ্যানালগ। নীতিনির্ধারণীতে বসে থাকা মানুষজনের পুরো বিজনেস প্রসেসটাকে ডিজিটলাইজড করার জন্য সামগ্রিক যে ধারণা থাকা দরকার ছিল, সেটার অভাবে চালু করা নতুন ডিজিটাল সার্ভিস শেষ পর্যন্ত কাজ করেনি। এবং এই ব্যর্থ হবার পুরো দোষটা গিয়ে পড়েছে ‘ডিজিটাল সার্ভিস’-এর ওপর, সেটা ঠিকমতো কাজ করেনি বলে। এখন অনেক মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে, তবে ডিজিটাল রুলস অব বিজনেস’ আপডেট হওয়া প্রয়োজন।

দেরিতে হলেও এখন চালু হয়েছে গভর্নমেন্ট এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, জিআরপি। প্রতিটা সরকারি অফিসে এই অ্যাপ্লিকেশন থেকে সরকারি সম্পদের খুঁটিনাটি হিসেব, বাজেট, অডিটিং এবং প্রতিটা প্রজেক্টের খরচের হিসেবের ‘অপটিমাইজেশন’ আসবে এক জায়গায়। নীতিনির্ধারকদের ড্যাশবোর্ডে। ম্যাডুটে করতে হবে ই-নথি— ডিজিটাল সিগনেচারসহ, দেশব্যাপী। সরকার থেকে বিজনেস কমিউনিকেশনেও। এর উপকার ‘মাল্টিপ্লাই’ হবে যখন এর ওপর বসবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মানুষের সাহায্যে। জন্ম থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। উন্নত দেশগুলোর সরকারি পোর্টালগুলো দেখলে সেটার একটা ভালো ধারণা আসবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ‘রেকর্ড কিপিং’ এবং কমপ্লেক্স কাজে ফোকাস

তবে বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং এই ব্যাপারগুলোকে পাল্টে দিয়েছে অনেক আগেই। সেটা আমি দেখেছি অনেক দেশে। তাদের কাজের সুবিধার্থে। এই প্রযুক্তিগুলোর সঙ্গে সরকারি সার্ভিস ডেলিভারি আরও অনেক দ্রুতগতিতে এবং আরও ‘পরিশুদ্ধ’ করে ডেটাসেটকে প্রসেস করা এত ভালোভাবেই সম্ভব যে এই বেসিক কাজগুলো এই প্রযুক্তির ওপর ছেড়ে দিয়ে সরকার আরও কমপ্লেক্স অর্থাৎ যেকোনো লম্বা সময় ধরে করতে হবে সেখানে মনোযোগ দিতে পারে। সে ধরনের কিছু কাজ। যেমন শিক্ষার আধুনিকীকরণ, সেটার উন্নত সংস্করণ এবং অনেক সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

প্রযুক্তির কাজ প্রযুক্তির ওপর ছেড়ে দিয়ে মানবিক কাজগুলোর দিকে সরকার মনোনিবেশ করতে পারে আরও বেশি সময় ধরে। আমার অভিজ্ঞতা বলে সরকারি পর্যায়ে ‘রেকর্ড কিপিং’, যেখানে জনগণের তথ্য ঠিকমতো রাখা

এবং সেটাকে রিয়েল টাইমে প্রসেস করে যাতে জনগণ সেই সুবিধা পেতে পারে কয়েক দিনেই। এই কাজ করতে গেলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তি ছাড়া আমাদের সামনে আর কিছু নেই। সে কাজগুলো শুরু করতে দেরি হবার কারণে আমরা সময় হারাচ্ছি প্রতিনিয়ত।

সাধারণ ডকুমেন্ট ইস্যু, রিনিউয়াল, বিল পেমেন্ট সম্ভব এখনই

শুরুতে সরকারি সার্ভিস দেবার জন্য কিছু প্রসেস, যেগুলো এখনো আমরা ম্যানুয়ালি করে থাকি, যেমন বিদ্যুৎ, ফোন বিল জেনারেশন—বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সার্ভিসগুলোর পেমেন্ট প্রসেসিং, জনগণের ব্যাংক অথবা মোবাইল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ট্যাগ করে দেওয়া, জনগণের প্রতিদিনের হাজারো প্রশ্নের উত্তর ঠিকমতো দিতে পারা (এসএমএস/ভয়েস কলে) সম্ভব কিছু সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন করলেই। এর পাশাপাশি সরকারি কী ধরনের সমস্যা কে দেখবে, বিশেষ করে জনগণের অভিযোগগুলো ঠিকমতো ‘রাউটিং’ করে আসল সংস্থার কাছে পৌঁছে দেওয়া, এ সবকিছুই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ।

সরকারি বিভিন্ন ডকুমেন্ট, যেগুলোর ‘ইস্যু’ থেকে শুরু করে তার ‘রিনিউয়াল’ এবং যে সাধারণ জিনিসগুলোতে অফিসপ্রধানের অথোরাইজেশন প্রয়োজন পড়ে না, সেগুলো খুব সহজেই করে ফেলতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। সামান্য গাড়ির ফিটনেস থেকে শুরু করে গাড়ির ট্যাক্স সার্টিফিকেট, টিন/বিন (ট্যাক্স) সার্টিফিকেট এ সবকিছুই করা সম্ভব যদি এগুলোকে ঠিকমতো ‘প্রসেস জেনারেট’ করে রুলসেট অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়। এতে মানুষের হস্তক্ষেপ না থাকায় কম জালিয়াতি অথবা দুর্নীতি ঘটবে দিনশেষে।

নীতিমালার সঙ্গে মনোভাবের সম্পর্ক, নিরাপত্তা ও ‘আরবান’ প্ল্যানিং

ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বর্তমানে বিভিন্ন দেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে বিভিন্ন ধরনের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ব্যবহার করছে, যাতে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মতামত সেই নীতিমালায় বেশি মাত্রায় চলে না আসে। এটা একটা ‘ব্যালান্সিং অ্যাক্ট’, যাতে রাষ্ট্র পরিচালনায় সবার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। সরকারগুলোর ভেতরের অনেক সংস্থা এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মতামত নিয়ে আসছে

এক জায়গায়। একটা ইউনিফায়েড ড্যাশবোর্ডে। সরকারের ভেতরে। জনগণের মানসিক অবস্থা, বিশেষ করে ‘সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস’ সহ।

সোশ্যাল মিডিয়ার মতো বড় বড় ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট (নিউজ সাইট)–এর পাশাপাশি নিউজ মিডিয়া বিশেষ করে ইলেকট্রনিক নিউজ মিডিয়ার সঙ্গে জনগণের ‘ইন্টার-অ্যাকশন’গুলোকে একটা জায়গায় নিয়ে এলে সরকারি নীতিমালার সঙ্গে জনগণের মনোভাবের একটা স্পষ্ট সম্পর্ক বের করা যায়। প্রতিটা ‘কেসের ইনস্ট্যান্স’ ধরে। এটা থেকে ভালো ইনপুট পায় সরকারগুলো।

শহরের হৃদয়

Urban planning is a multi-faceted discipline in which planners collect data points from targeted areas to determine if a store, hospital or other types of buildings are likely needed in that area. It also involves determining if the needed infrastructure to support the building is there or needs to be added. The data provides context to planners and includes things such as geographic factors, socioeconomic statistics and human mobility.

—Where Artificial Intelligence Meets Urban Planning, University of Central Florida

বর্তমানে যেহেতু প্রতিটা মানুষের হাতে একটা ‘ডিজিটাল সেন্সর’ অর্থাৎ মোবাইল ডিভাইস আছে, সে কারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ‘অ্যানোনিমাইজ’ মানে কাউকে ট্র্যাকিং না করেই পুরো দেশের রাস্তাঘাটের ‘ট্রানজিট’ ট্রাফিক অ্যানালাইসিস, কোথায় ট্রাফিক সিগন্যাল আটকে রাখছে মানুষকে বেশি, কোন রাস্তা বন্ধ থাকছে কখন, রাস্তার ‘রি-রাউটিং’ তথ্য, ওই রাস্তার লাইন ধরে ক্রাইম প্যাটার্ন, প্রতিটি ট্রাফিক লাইটের সিগনালের টাইমিং এবং প্রতিটা রাস্তা/বাড়িঘরের অবস্থানের নিরিখে স্থানীয়ভাবে ‘নিরাপত্তা’ বলয় এবং ‘আরবান’ প্ল্যানিং (রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার, আভারপাস, জলাশয়, টার্নপাইক ইত্যাদি) করা যায় খুব সহজেই। এ ধরনের প্রচুর পাবলিক ডেটা পাওয়া যায় উন্নত দেশগুলোর স্থানীয় সরকারগুলোর সাইটে। তখন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় সংস্থাগুলোর ভেতরে-ভেতরে।

সামনে আসছে বিশালাকার বেসরকারিকরণ, দক্ষতার কারণে

দক্ষতা এবং সেবা

Evidence from low- and middle-income countries suggests private provision is more efficient than public provision. ... Greater private sector efficiency is attributed to the ability to set lower pay and to recruitment autonomy, as well as the market-like competitive conditions in which they operate.

—Is the Private Sector more Efficient?— UNDP

আমি সরকারি কর্মকর্তা হলেও প্রাইভেট সেক্টর শিখিয়েছে অনেক কিছু। হাতে ধরে। আমার বন্ধুদের অনেকেই এখন উদ্যোক্তা। প্রাইভেট সেক্টরের অপটিমাইজেশন নিয়ে আলাপ করেছি বহুবার। আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট অরবিটে বসানোর জন্য প্রাইভেট অপারেটর ‘স্পেস-এক্স’-এর পেছনের গল্পটা জানলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে বেশি। এই মহামারির সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রাইভেট সেক্টর কীভাবে তাদের ব্যবসায়িক খরচ কমিয়ে আস্তে আস্তে মুনাফা বাড়চ্ছে, সেটা নিয়ে আমি আরেকটা চ্যাপ্টারে বলেছি। উদ্ভাবনার অভাবেই অনেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে এই মহামারির মধ্যে পড়ে। সরকারগুলো খরচ কমাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে এই সময়টাতে।

বিশেষ করে, এই সময়ে যেখানে কাজের অপটিমাইজেশন করতে গিয়ে সাধারণ এবং সনাতন সফটওয়্যারগুলো ডেলিভারি করতে পারছে না ঠিকমতো, সেখানে অনেক উদ্ভাবনী কোম্পানিগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে এমন কিছু দেখাচ্ছে, যেটা আগে অনেকে চিন্তাই করতে পারেনি। একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে কীভাবে গুগল, ফেসবুক, অ্যামাজন, জুম, নেটফ্লিক্স, ইউটিউব বা অন্য কোম্পানিগুলো এখনো প্রচুর আয় করে চলেছে, যেখানে সরকারগুলো বুঝতে পারছে না কীভাবে তাদের নাকের ডগা দিয়ে এত মুনাফা চলে যাচ্ছে তাদের কাছে?

একটাই ‘সিক্রেট সস’, প্রতিটা ব্যবহারকারীকে ঠিকভাবে শনাক্ত করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী দরকারি প্রোডাক্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে সেই পণ্যের কোম্পানিগুলো থেকে টাকা বের করে নিচ্ছে এই উদ্ভাবনী কোম্পানিগুলো। আবারও বলছি, তারা প্রতিটা মানুষকে ঠিকমতো শনাক্ত করেই সার্ভিস দিচ্ছে। কিওয়ার্ড, ব্যবহারকারীদের শনাক্তকরণ

এবং তাদের পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুই জানে তারা। এর পেছনে আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মজার কথা হচ্ছে, এই ‘সিক্রেট সস’ ব্যবহার করে শিক্ষা এবং সরকারি অনেক সার্ভিস ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব মডেলটাকে কিছুটা ‘টুইকিং’ করে। আমাদের ডেটা দিয়ে।

সেই ‘সিক্রেট সস’ থেকে সরকারগুলো তাদের প্রতিটা জনগণের সরকারি সার্ভিস ডেলিভারিতে কী কী দেওয়া দরকার বা এই মুহূর্তে কী কী জিনিস জনগণ চাইছে বা সামনে কোন কোন জিনিস জনগণ চাইতে পারে, সে ধরনের সার্ভিস প্রেডিকশন করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ধারণা নিতে পারছে না অনেক দেশের সরকারই। ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো এ ধরনের উদ্ভাবনী ধারণা নিয়েও সরকারগুলো তাদের জনগণের বিভিন্ন চাহিদা সময়মতো ডেলিভারি দিতে পারছে না। সামনে জনগণ তাদের কাছ থেকে কী কী সার্ভিস চাইতে পারে, সেটা প্রেডিকশন শুরু করেনি অনেক সরকার।

সরকারের কাজে ‘অপটিমাইজেশন’, কাজের পরিধি ছোট করে’’

ছোট তবে দক্ষ সরকার

The federal government will also introduce a Contestability Framework, which will assess whether government functions should be open to competition and will likely see far more functions provided by non-government organisations.

—What skills does a ‘smaller’ government need? The Conversation

পুরো পৃথিবীর বর্তমান ট্রেন্ড হচ্ছে কীভাবে সরকারকে ছোট করে নিয়ে আসা যায়। এতে সরকারের কাজগুলোকে অনেকটাই ‘অপটিমাইজ’ করে খরচ কমানো আনা যায়। যেহেতু, সরকারগুলোতে সঠিক জনবলের অভাবে দক্ষতার মান বেসরকারি কোম্পানিগুলো থেকে বেশ কম, সে কারণে পৃথিবীব্যাপী ব্যবসায়িক ধারণাগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি সেক্টরে। সরকার নিজস্ব বিমান ক্যারিয়ার, রেলওয়ে অথবা টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলোকে নিজে থেকে চালাতে গেলে সেখানে

১১. ‘বোস্টন কনসালটিং গ্রুপ’ থেকে কিছু ধারণা নিয়েছি এই লেখাতে। বাংলাদেশের জন্য যতটুকু ‘লোকালাইজেশন’ দরকার, সেটা যোগ করা হয়েছে এখানে। ম্যানেজমেন্ট কনসালটিংয়ের দিক থেকে তারা সেরাদের কয়েকজন।

লাভের সম্ভাবনা কম দেখা দেয়। সরকারের দক্ষতা হচ্ছে নীতিমালা তৈরিতে এবং সেই নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি কোম্পানিগুলো যাতে জনগণের স্বার্থহানি না ঘটায় সেটার জন্য প্রতিটা সেক্টরের জন্য আলাদা করে নিয়ন্ত্রক কমিশন তো থাকছেই।

সরকারি দক্ষতা আসবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের বিয়ে হয়েছে ২০০১ সালে। সেটা জানে সরকার, কাজি অফিস থেকে। বিয়ের পর থেকে আমাদের বাড়তি চাহিদার ব্যাপারগুলো প্রেডিক্ট করবে সরকার। যেমন, আমাদের এখন দরকার আগের থেকে একটু বড় বাড়ি। সরকারি বাসস্থান এজেন্সি যোগাযোগ করবেন আমাদের সঙ্গে, আমাদের আয় ধরে। কিছুটা ‘পুশ-সেল’-এর মতো, তবে মানবিক ভাবে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিসগুলো দেবার জন্য যোগাযোগ করবে নির্দিষ্ট এজেন্সি— ওই বিয়ে তারিখের পর থেকে। আমার ধারণা, এগুলো বেসরকারিকরণ হয়ে যাবে এর মধ্যে। দক্ষতার কারণে।

আমি আশা করছি না মানুষ কল করবে, বরং সিস্টেম থেকে জিনিসগুলো অ্যাক্টিভেট করবে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ধরে, আমাকে জানিয়ে। আমাদের বাচ্চা হবার আগে যোগাযোগ করবে হাসপাতাল, ইউনিভার্সাল হেলথকেয়ার স্কিমের আওতায়। বাচ্চা হবার পর কবে এবং কোন স্কুলে যাবে সেটা ঠিক করে দেবে শিক্ষা পরিদপ্তর। সরকারি এই যোগাযোগ হচ্ছে ব্যাকএন্ডের ডেটা এবং প্রেডিকশন থেকে, ডেটার ‘প্রাইভেসি’ বজায় রেখে। যেভাবে আজকে কাজ করছে গুগল, ফেসবুক, নেটফ্লিক্স, আমাজন ইত্যাদি ডেটা ড্রিভেন কোম্পানিগুলো। আমার চাওয়ার আগেই বলে দিচ্ছে আমার পছন্দ। হয়তোবা ছোট স্কেলে। তবে, তারা ভয় দেখাতে চাইছে না আমাদের, কতটুকু বেশি জানে আমাদের। সেটা আরেক গল্প।

সিস্টেম লস, বাহুল্য খরচ, কম খরচে বাজেট প্রণয়ন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সরকারগুলো কী করছে দেশে দেশে? আমার রিসার্চ বলে, বিশেষ করে একটা দেশের বাজেট প্রণয়ন এবং তার খরচ কোথায় বেড়ে যাচ্ছে তা আগে থেকে কমিয়ে আনা, বিশেষ করে খরচের ফোরকাস্টিং এবং তা কেন খরচ বাড়ছে সেই ধারণা আগে থেকে

পাওয়া— এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটা বড় ধাপ। বলতে হয়, একটা বিশাল ধাপ যে— প্রতিবছর প্রজেক্টের খরচ বাড়ার আগেই সেটাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে আনছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

ধরুন, দেশব্যাপী জ্বালানি প্রোডাকশনের সঙ্গে জ্বালানির ডিস্ট্রিবিউশন, বিশেষ করে বৈদ্যুতিক ডিস্ট্রিবিউশনে কোথায় কোথায় সিস্টেম লস হচ্ছে, সেগুলোকে কমিয়ে আনতে ব্যবহার হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আমি নিজে দেখেছি, বেশ কিছু দেশের ড্যাশবোর্ডে। সরকারি প্রজেক্টে কোথায় কোথায় জালিয়াতি হচ্ছে এবং তার সঙ্গে বাহুল্য খরচ সেটাও বের করতে পারছে এই জিনিস। ব্যাপারটা সেরকম কঠিন নয়।

ডেটা ছাড়া ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা বেশি

যেকোনো দেশের সরকারের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তগুলোতে শুধু টাকার শ্রাদ্ধ হয় না বরং এর পেছনে অনেক বছর হারিয়ে যায়। জনগণ যে প্রজেক্ট থেকে ১০ বছর আগেই যে সুবিধা পেত, সেটা পেছাতে থাকে। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে শুধু টাকার ক্ষতির পাশাপাশি একটা জেনারেশন সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ধরুন, একটা শহরের পাবলিক ট্রানজিট সিস্টেম।

অনেক সময় আমাদের নীতিমালাগুলোতে ঠিকমতো ‘অ্যাকশন পয়েন্ট’ না থাকার কারণে সেগুলো নিস্পৃহ পাতায় পর্যবসিত হয়। সে দিক থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নতুন করে ‘এভিডেন্স বেইজড’ নীতিমালা করতে গেলে এর জন্য ‘ইউজ কেইস’ অর্থাৎ সম্পর্কিত ঘটনামালা প্রতিটা ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ডেটা থেকে ধারণা নিয়েই একটা অটোমেটেড ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমের ভিতরে দিয়ে এলে প্রতিটা কাজের খরচ এবং অ্যাকাউন্টিবিলিটি— সব হিসেবের মধ্যে চলে আসে। এটা চলছে অনেক দেশে। মানুষের পক্ষে এ ব্যাপারগুলো মাথায় নেওয়া সম্ভব নয়।

কমপ্লেক্স জিনিস এআই’র মতো কিছু এক্সপার্ট সিস্টেমে মাইগ্রেশন

উন্নত দেশগুলো বহু বছর ধরে তাদের কমপ্লেক্স প্রজেক্টগুলোকে বেশকিছু অটোমেটেড সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করলেও এখন সেটা ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো কিছু এক্সপার্ট সিস্টেমের হাতে, যা একজন মানুষের ধারণার স্কোপের বাইরে। এজন্য এর নাম ‘এক্সপার্ট সিস্টেম’

এটা মেনে নিতে হবে। বিশাল বিশাল কমপ্লেক্স সিস্টেম চালানো যাবে না ম্যানুয়ালি অথবা মানুষকে দিয়ে। এর পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে যেভাবে ইনভেস্টমেন্টের ফলাফল পাচ্ছে, সেটা এই মহামারির সময়ও তাদের কোনোভাবেই বিপদে ফেলছে না। এর পেছনে আছে তাদের অসাধারণ উদ্ভাবনা এবং কীভাবে দুঃসময়ে তাদের কাজগুলোকে নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে খরচ কমিয়ে প্রোডাকশন বাড়ানো যায়।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ, ডেটা ও ইনসাইট

একসঙ্গে হয়ে কাজ নামিয়ে দেওয়া

Infrastructure is difficult for the public sector to get right, notes the World Bank. Public-private partnerships can help; they can provide more efficient procurement, focus on consumer satisfaction and life cycle maintenance, and provide new sources of investment.

—How Do You Build Effective Public-Private Partnerships? Yale Insights

এখানে কী দরকার? পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। এই নিয়ে সামনে একটা বড় চ্যাপ্টার লিখেছি। কারণ, সরকারের কাছে আছে জনগণের সব ডেটা এবং প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর কাছে আছে দক্ষতা এবং অপটিমাইজেশনের ভালো ধারণা। তাহলে কেন সরকার এবং উদ্ভাবনী কোম্পানিগুলো একসঙ্গে উত্তরণ করতে পারছে না? সমস্যাটা কোথায়? আমার ধারণা, বিশ্বাস। আমাদের মতো দেশগুলোতে সরকার এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলোর মধ্যে আস্থার অভাব থাকায় এই পার্টনারশিপ ঠিকমতো কাজ করেনি আগে।

তবে এই অবস্থান থেকে সরে আসছে আমাদের মতো সরকারগুলো। এখন সরকারের সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার প্রজেক্ট ‘জিআরপি’ অর্থাৎ ‘গভর্মেন্ট এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং’ বানাচ্ছে ১২টা কোম্পানি সরকারের সঙ্গে। সামনে আসছে ‘ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইনডো’ নামে একীভূত সল্যুশন। এদিকে আমার রিসার্চ বলে বেশ কয়েকটা দেশ এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির পাইপলাইনকে এমনভাবে ‘স্ট্রিমলাইন’ করে নিয়েছে, যার মাধ্যমে কম খরচে সার্ভিসগুলোকে নিয়ে যেতে পারছে

জনগণের দোরগোড়ায়। বাকিরা যারা এখনো এই ধারণাতে ‘অ্যাডাপ্ট’ করতে পারেনি এবং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের পাইপলাইনটাকে এখনো ঠিকমতো যুক্ত করতে পারেনি তাদের কাজের ধারায়, তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারকারী কোম্পানিগুলো থেকে পিছিয়ে আছে।

মহামারি, শাপে বর

নতুন প্রজ্ঞা

The CORD-19 data set is inadvertently proving to be a super-interesting pragmatic test for AI-based literature analysis.

—Anthony Goldbloom, Kaggle

এটা ঠিক যে, সরকারি কর্মকর্তারা কাজে ভুল অথবা সিদ্ধান্ত ভুল হবার ভয়ে অনেক সময় এ ধরনের বড় ইনভেস্টমেন্ট ধারণা মাথায় নিতে ভয় পান। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপ, যেখানে বাহুল্য খরচ হবার ভয়ে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’র মতো নতুন ধরনের উদ্ভাবনা সরকারে যোগ করার ইচ্ছে কম থাকে। তবে বর্তমানে এই মহামারির সময় এই প্রযুক্তির ব্যাপারটা শাপে বর হয়ে এসেছে। প্রতিটা সরকার এখন তাদের ‘লিমিটেড’ বাজেট সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষ করে মহামারির সময় সরকারের বাজেট যাতে সমাজের দুস্থ মানুষের কাছে ঠিকমতো পৌঁছায় সে কারণে অনেক দেশ ব্যাপারটি ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ‘ডেটা ড্রিভেন’ সিদ্ধান্তের ওপর।

এদিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে, মহামারির সময় আমরা প্রচুর ডেটা ব্যবহার করেছি, যা মহামারি ঠেকানোর ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে। শুরুতে ব্যাপারটা সেভাবে বোঝা না গেলেও ধীরে ধীরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন করা এবং তাদের সংস্পর্শে কারা এসেছিল, তাদের সেভাবে আলাদা করে ফেলা এই পুরো ব্যাপারটাই অনেক দেশেই ঘটেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। আমরাও চেষ্টা করেছি শুরুর দিকে। সেই এয়ারপোর্ট থেকে।

দেশগুলো তৈরি করেছে নতুন নীতিমালা, মহামারিকে ঘিরে

আমার কাজের শতভাগ যেহেতু প্রযুক্তিকে ঘিরে সে কারণে এই মহামারির সময় অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং মানুষের অসহায় সময়গুলোতে প্রযুক্তি ব্যবহার না করে উপায় ছিল না। অনেক দেশ এই সুযোগে প্রযুক্তির কিছু

নীতিনির্ধারণী গাইডলাইন তৈরি করে ফেলেছে জনগণকে সুবিধার জন্য। আমাদের মতো দেশে ভার্টুয়াল কোর্ট-সুবিধা ব্যবহার করে অনেকটুকুই সুবিধা পাওয়া গেছে। তবে এই সুযোগে বেশ কয়েকটা দেশ তাদের নীতিমালাতে এমন কিছু পরিবর্তন এনেছে, যা মহামারির আগে করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

এ ব্যাপারে তারা জনগণের পুরো ম্যাডেট নিয়ে ইলেকট্রনিক সিগনেচার থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য অনলাইন ট্রানজ্যাকশন ধরনের আইন পাস করিয়ে নিয়েছে। এই করোনাভাইরাসের সময় দুস্থ মানুষদের ঠিকমতো শনাক্তকরণ এবং তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছানো একটা সমস্যা ছিল বটে। সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আরও কিছু টুল ব্যবহার করে অনেকটাই সম্ভব করা গেছে আসল দুস্থ মানুষদের কাছে সাহায্য পৌঁছাতে। এরপরে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং তার পাশাপাশি কিছু ডিজিটাল প্রসেস ডেভেলপ করে একধরনের ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আসা গেছে, যা এই মহামারি না হলে করা যেত না।

স্বাস্থ্য খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাফল্য

যন্ত্রের মানবিকতা

AI is getting increasingly sophisticated at doing what humans do, but more efficiently, more quickly and at a lower cost. The potential for both AI and robotics in healthcare is vast. Just like in our every-day lives, AI and robotics are increasingly a part of our healthcare eco-system.

—No longer science fiction, AI and robotics are transforming healthcare, PwC network

স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ করে, আমাদের এই মহামারির সময় ভেন্টিলেটর এবং বেশকিছু যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জনসম্পদ না থাকাতে হাসপাতালগুলোতে ঠিকমতো সেবা দেওয়া যায়নি। সেদিক থেকে চিন্তা করে যুক্তরাজ্য ধীরে ধীরে তাদের হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যসেবায় যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় সেগুলোকে একটা প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসছে, যাতে সেখানে জনবলের অভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা যায়।

এর পাশাপাশি জাপান সরকারও বিনিয়োগ করছে কীভাবে দশটা ‘স্মার্ট’ হাসপাতাল বানানো যায়, যেখানে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত পেশাদার জনবল নেই। এ ধরনের হাসপাতালগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কীভাবে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায়, বিশেষ করে বিভিন্ন মেডিকেল টেস্টগুলোর ফলাফল নিয়ে রিপোর্ট তৈরির পাশাপাশি ভুল না করে একদম ‘সঠিক’ সেবা দেওয়া যায়।

আচরণগত বিজ্ঞান দিয়ে ভালো মতবাদ প্রচার

করতে পারা

Knowing what must be done does away with fear.

—Rosa Parks

অর্থনীতিতে ‘নাজ তত্ত্ব’ অর্থাৎ ‘সামান্য ধাক্কা’ দিয়ে একটা ভালো কাজ করার ধারণা নিয়ে আসতে পারি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। মানুষ কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, সেটার ব্যাপারে ভালো ধারণা থাকলে সরকার সেই সিদ্ধান্ত নেবার সময় একজন জনগণকে সাহায্য করতে পারে, যাতে উনারই সুবিধা হয়। এটা একধরনের অর্থনীতি, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আচরণ বিশ্লেষণ করে ‘মানুষ কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়’ তার কিছু ধারণা নিয়ে কাজ করে এখানে। সরকার যখন বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে তাদের খাবারের সঙ্গে ক্যালরির পরিমাণ বলে দেওয়ার জন্য নীতিমালা করে, তখন জনগণ ক্যালরির মাপগুলো দেখে স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নিতে সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার সরাসরি বাধ্য না করলেও তথ্য দিয়ে তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সাহায্য করল।

আমি অবশ্যই আয়কর দিতে চাইব যখন আমার অফিসের বাকি সবাই আয়কর দেয়। প্রশাসন যদি আমাকে একটা মেসেজ/চিঠি দেয়: ‘আপনার এলাকার ১০ জনের মধ্যে ৭ জনই আয়কর পরিশোধ করেছেন’। তাহলে আপনি নিজেও আয়কর দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। আমাদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর জন্য ‘মিউনিসিপ্যালিটি’ নতুন সবজি এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য তির চিহ্ন বাধ্যতামূলক করে দেয়, তাহলে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢোকানোর সময়ে সেই তির চিহ্ন দেখে সবজি কেনার একটা আগ্রহ তৈরি হতে পারে। অনলাইন আয়করে ৩ শতাংশ ছাড় দিলে সবাই অনলাইনে আয়কর দেওয়ার জন্য উৎসাহী হবে। অনেক দেশের প্রশাসন এখন ‘নাজ’

ইউনিট তৈরি করেছে জনগণের সমস্যাগুলো বুঝে আগেভাগে সমাধান করে দেবার জন্য।

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আচরণ বিশ্লেষণ করে অনেক কিছু করা সম্ভব। সবাইকে ভালো কিছু দেবার জন্য। বেসরকারি সেক্টরে এগুলো চলে আসছে অনেক দিন থেকে। অনেক সময় রেস্টুরেন্টগুলো ইচ্ছে করেই একটা আইটেমের সর্বোচ্চ দাম দিয়ে রাখে, যাতে আমরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আইটেমটা কেনার আগ্রহ প্রকাশ করি। সেই রেস্টুরেন্টও জানে, আমরা সর্বোচ্চ মূল্যের আইটেমটা কিনব না বরং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আইটেমটা কিনে আমরা খুশি থাকব ‘জিতেছি’ ভেবে।

‘নাজ তত্ত্ব’, ডেটা, এবং বেসরকারি খাতের পেনশননীতি

যুক্তরাজ্যের সরকারের পেনশননীতির ব্যাপারে একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বেসরকারি খাতের কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে কম পেনশন স্কিম নেবার কারণে ২০১২ সালে নিয়োগকারীদের একটি ‘স্বয়ংক্রিয় তালিকাভুক্তি’ স্কিম স্থাপনে বাধ্যতামূলক করেছিল সরকার। এর অর্থ হচ্ছে বেসরকারি খাতের কর্মী স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোম্পানির পেনশন স্কিমে চলে যাবেন। কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ না করলে তার বেতন থেকে একটা শতাংশ কেটে নেওয়া হবে। ‘স্বয়ংক্রিয় তালিকাভুক্তি’কে আমরা আগে থেকেই ‘অপ্ট-ইন’-এর মতো, আপনি আলাদা করে না বললে, তারা আর কাটবে না।

সরকার এই ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করেছে ‘বিহেভিয়ারাল সায়েন্স’ দিয়ে। সাধারণত কেউ চান না তার বেতন থেকে কিছু টাকা কেটে রাখা হবে—ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এই প্রজন্মের মানুষ বর্তমান নিয়েই বিশ্বাসী। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে দেখা যাবে ভেবে এগুলো করি আমরা। এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ নতুন করে ‘সিদ্ধান্ত নেবার’ বামেলায় যেতে চান না। যখন পুরো ব্যাপারটাকে ‘ডিফল্ট’ অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনরোলমেন্ট হয়ে থাকল, তখন মানুষ খুব একটা আপত্তি করেনি। কারণ, সে জানে—চাইলেই বন্ধ করতে পারবে যেকোনো সময়ে। ফলে, সরকার সত্যিকার

অর্থে ভালোর জন্য যা করতে চেয়েছিল, সেই সঞ্চয়ী স্কিম এমনিতেই হতে থাকল।

সরকার এই গণমুখী সিদ্ধান্তটা কীভাবে নিতে পারল? আগের ডেটা থেকে। আমি নিজে যেহেতু দেশের প্রচুর ডেটা দেখেছি, সে কারণে ডেটা থেকে সামনে কী কী কাজ আসতে পারে সেটার বেশ ভালো ধারণা চলে আসে এমনিতেই। আমার কথা একটাই ডেটাকে বুঝতে হবে রাষ্ট্রের পরিচালনায়।

বিহেভিয়ারাল ইনসাইট দিয়ে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা

যুক্তরাজ্যে আচরণগত বিজ্ঞান অর্থাৎ বিহেভিয়ারাল সায়েন্স টিম একটা অ্যালগরিদম তৈরি করেছে, যা আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারে কোন ড্রাইভাররা ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাবে। এই ধারণাটা আসে যখন তারা একটা সম্পর্ক বের করতে পারে যেসব ড্রাইভার নিজ নিজ এলাকায় অনেক গতিতে গাড়ি চালায়। তারা ডেটার এই কো-রিলেশন দেখাতে সমর্থ হয় কীভাবে এই নিজ এলাকায় গাড়ি দ্রুতগতিতে চালানোর ছোট ছোট ঘটনাগুলো ভবিষ্যতে বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

আর তাই, এই টিম আস্তে আস্তে যেসব ড্রাইভার এ মুহূর্তে ছোট ছোট দুর্ঘটনায় রাস্তায় সবার জন্য বিপদ ডেকে আনছে,— সেসব ‘ছোট ছোট দ্রুতগতি’র এই ড্রাইভারদের ভবিষ্যতে বড় দুর্ঘটনা ঘটানোর আগেই আলাদা করে ফেলছে। তাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করে দিচ্ছে, কীভাবে তারা সামনে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাদের এই কাজ এখন প্রায় ২০%—এর মতো বড় দুর্ঘটনাগুলোকে কমিয়ে এনেছে।

ভবিষ্যতের সরকার এবং গ্লোবালাইজেশন ইফেক্ট

গতি ও সার্ভিস

The speed of social change is too great for most governments to handle in their current form.

Companies continue to up their game in customer service, but the public sector is not keeping pace.

Government should design Service Delivery on the basis of people's needs, not the convenience of providers.

—A blueprint for the Government of the future, BCG Report

ডেটা যার, ক্ষমতা তার

পৃথিবীতে এখন যার কাছে ডেটা আছে, তারাই ক্ষমতাশালী। আমরা ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখব, পৃথিবীর চিন্তাধারণা পাল্টে দিচ্ছে যে বেশ কয়েকটা কোম্পানি, ডেটার অতিরিক্ত ‘এক্সপোজারের’ কারণে, বিশেষ করে পাল্টে যাচ্ছে মানুষের ‘পারসেপশন’ এবং ধ্যানধারণা। মানুষ কোন জিনিসটা নিয়ে সামনে কী ধরনের চিন্তা করবে সে ব্যাপারেও রিসার্চ শুরু হয়ে গেছে সেই কোম্পানিগুলোর মধ্যে।

আমরা কি প্রোডাক্টটা কিনব নাকি অন্য কিছু করব সে ধরনের প্রেডিকশন নিয়ে আসছে সেই কোম্পানিগুলো— যাদের কাছে মানুষের পুরো ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট রয়েছে। এটা কিছু কিছু সরকারের জন্য সমস্যা বটে। সরকার তার নিজেদের জনগণ সম্পর্কে যতটুকু জানে— তার থেকে অনেক ভালো জানে এই ডিজিটাল কোম্পানিগুলো, যারা আমাদের প্রতিনিয়ত তাদের মতো করে নিরীহভাবে ‘ট্র্যাকিং’ করছে।

ট্র্যাকিং ও ‘পার্সোনালাইজড’ সার্ভিস

মানুষ তাদেরকে ‘ট্র্যাকিং’ করতে দিচ্ছে কারণ, আমরা ভাবছি মেশিন আমাদের যত ভালোভাবে চিনবে, তত ভালো ‘পার্সোনালাইজড’ সার্ভিস দিতে পারবে। এটা অবশ্যই সত্য কথা। ইউটিউব ২০ বছর ধরে আমাদের যতটুকু চিনেছে, এখন প্লেলিস্টে এমন কিছু আসবে না, যেটা আমাদের পছন্দ নয়। গত কয়েক বছরে আমরা মোবাইল ফোনে কী ধরনের লেখা লিখেছি, সেটাকে ‘ট্র্যাক’ করে সে আমাদের বলতে পারে আমরা পরের শব্দটা কী লিখতে চাইছি। অনেক সময় পুরো বাক্যটাই বলতে পারে সে। অথবা আমাজন আমাকে সে ধরনের প্রোডাক্ট ‘রিকমেন্ড’ করবে, যে ধরনের প্রোডাক্ট আমি দেখে এবং কিনে আসছি ২০ বছর ধরে।

আমি কোন প্রোডাক্টটা কবে কিনব এবং কত পরিমাণে কিনব সেটার একটা ভালো ধারণা আছে তাদের কাছে। নেটফ্লিক্স আমাদের মনের প্রেফারেন্স জানে বলেই আমরা যে ধরনের রুচির সঙ্গে পরিচিত, সে ধরনের রুচির মুভি অথবা টিভি সিরিজ রিকমেন্ড করে আসছে। আমরা সাধারণত কোথায় যাই, কীভাবে যাই এবং কেমন করে যাই, সে ধরনের তথ্য আস্তে আস্তে চলে গেছে উবার-পাঠাওয়ার কাছে। আমরা তথ্যগুলো দিচ্ছি কারণ,

মানুষ-এর মাধ্যমে অনেক ভালো পার্সোনালাইজড সার্ভিস পাচ্ছে, যেটা তার সময়কে অনেক বাঁচিয়ে দিচ্ছে।

সরকারের ডেটা থেকে প্রজ্ঞা বের করা

এখানে সমস্যা একটাই। সরকারগুলো কি সেরকমভাবে ‘ইন্টেলিজেন্ট’ হবার ধারাটা ধরে রেখেছে তাদের নিজেদের সার্ভিস ডেলিভারির ব্যাপারে? এর মধ্যে চলে এসেছে গ্লোবালাইজেশনের ইফেক্ট। পৃথিবীর মানুষ এখন গ্লোবাল ভিলেজের সদস্য হয়ে গেছে। নিজেদের দেশে কী হচ্ছে তার পাশাপাশি অন্য দেশে কী হচ্ছে, সেটার মধ্যে তুলনা হচ্ছে অনেক বেশি। সনাতন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা বেড়েছে অনেক বেশি। পাশাপাশি ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে।

অনেকে বলতে পারেন, মানুষের চোখ-কান খুলে গেছে অনেক বেশি, যা দেখেছি ২০ বছর আগে। মানুষ এখন তার প্রাপ্যতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অন্য দেশগুলোর জনগণ এবং নিজেদের মধ্যে। এটা অনেকের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করছে। পাশাপাশি আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা দেখেছি আরব বসন্তে। আমরা যেটা বুঝতে পারছি, সরকারগুলো সামাজিক এই পরিবর্তনগুলো ঠিকমতো ধরতে পারছে না। এই সামাজিক পরিবর্তন এতই দ্রুত হচ্ছে, সেটা বর্তমান আমলাতান্ত্রিকতা দিয়ে ঠেকানো সম্ভব না। উপায় একটাই। সরকারগুলোর কাছে যে প্রচুর ডেটা আছে, সেটা থেকে প্রজ্ঞা বের করা।

এই পরিবর্তনের পেছনে শক্তি, গতি

সবাইকে গতির মধ্যে আনা

The concept of ‘speed to services’ becomes more important as government agencies begin to incorporate the lessons learned during this crisis and evolve from a digital transformation mindset to digital execution. It’s not simply that speed to services is something governments can pull off during extraordinary times but is becoming part of the new operating paradigm as governments

are required to keep up with the demands to accelerate speed to scale, access and innovation.

—Three Keys to Speed in Government Service, National League of Cities

‘বোস্টন কনসালটিং গ্রুপ’ বলছে বর্তমানে সরকার ও জনগণের মধ্যে যে ফারাক দেখা যাচ্ছে, তার পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করছে ‘পরিবর্তনের গতি’। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় সরকারের যে স্ট্রাকচার কাজ করছে, সেটা অন্যান্য ডেটাভিত্তিক কোম্পানির স্ট্রাকচারের কাছে সেকেলে হয়ে গেছে। সামাজিক ব্যবস্থা যেহেতু আস্তে আস্তে অনেক বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে, সেদিক থেকে সরকারের কার্যপদ্ধতি অনেকটাই সরল ও সোজাসাপ্টা। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

সরকারের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থা এবং এজেন্সির মধ্যে সমন্বয়হীনতায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে দেশের জনগণ। একটা সার্ভিস নিতে হলে সরকারের ডেপার্টমেন্টের আরও কয়েকটা অফিসের ছাড়পত্র বের করতে হিমশিম খেতে হয় জনগণকে। জনগণ চিন্তা করেন, সরকারের কাছেই সব ডেটা, তাহলে তাঁকে কেন দৌড়াতে হবে আলাদা আলাদাভাবে এতগুলো অফিসে? এই বামেলার কথা চিন্তা করে সমস্যায় পড়া জনগণ তখন দ্বারস্থ হন অবৈধ রাস্তায়।

বাড়ছে জনগণের আকাঙ্ক্ষা

আমাদের বাবা-মা একটা অফিসেই কাটিয়েছেন সারা জীবন। সেই পার্সপেক্টিভটা এখন সেভাবে কাজ করে না। কারণ, প্রচুর সুযোগ তৈরি হয়েছে আমাদের আশপাশে। গ্লোবালাইজেশনের কারণে মানুষ সামান্য চাকরির জন্য চলে যাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে, যেটা ২০ বছর আগেও অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হতো। এখন পৃথিবী চলে এসেছে হাতের মুঠোয়, মানে মুঠোফোনে। এই যন্ত্রটা পাণ্টে দিয়েছে আমাদের ‘পার্সপেক্টিভ’ কাস্টমার সার্ভিসের ব্যাপারে।

মুঠোফোনে ‘প্যারাদাইম শিফট’

মোবাইল ফোন থেকে আপনি যেভাবে অর্ডার করতে পারছেন হাজারো জিনিস, সেভাবে এই মোবাইল ফোন থেকেই সব ধরনের টাকাপয়সা

লেনদেন করা যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে। আপনাকে একটা জিনিসের জন্য হেঁটে যেতে হচ্ছে না দোকানে, বরং আপনি যা চাইছেন সেটা পৌঁছে যাচ্ছে আপনার দোরগোড়ায় এবং সেটার ‘ইনস্টলেশন’ হয়ে যাচ্ছে আপনার পছন্দমতো জায়গায়। এটা বিশাল একটা মানসিক ‘শিফট’ আমাদের জন্য, যেখানে একজন ব্যবহারকারী অর্থাৎ কাস্টমারই রাজা। আপনার পছন্দমতো জিনিস না এলে সেটাকে ফেরত দেওয়া যাচ্ছে কোনো ধরনের বামেলা ছাড়াই। এই ধরনের ‘প্যারাডাইম শিফট’ দেখেনি মানুষ।

সেখানে সরকার থেকে সার্ভিস নিতে হলে প্রচুর ধকল পোহাতে হয় একজন সাধারণ মানুষকে। এ কারণেই এ দুটো জিনিসের ব্যাপারে ফারাক বাড়ছে জনগণ ও সরকারগুলোর মধ্যে। আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ফারাক। এক জায়গায় জনগণ রাজা, আরেক জায়গায় জনগণ ঠিকমতো সার্ভিস পেতে যে বামেলা পোহাচ্ছে, সেটা মেনে নিতে পারছে না সাধারণ জনগণ। পৃথিবীজুড়েই একই অবস্থা। সরকারগুলো বেরোতে পারছে না তাদের পুরোনো সার্ভিস ‘স্ট্রাকচার’ থেকে। বিশেষ করে ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারিতে।

দুতগতিতে প্রযুক্তির পরিবর্তন

গত দুই যুগের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এতটাই এগিয়েছে যে, তার সঙ্গে মেলাতে পারছে না অনেক সরকার। শুরুতে ইন্টারনেটের উত্থান। মোবাইল প্রযুক্তি ঢুকে গেছে সব জায়গায়। বিগ ডেটা থেকে ব্যবসায়ীরা পাচ্ছে অসাধারণ প্রজ্ঞা, এ সবকিছুই পাল্টে দিয়েছে আমাদের বর্তমান কাজ এবং চিন্তাধারা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেটাকে আমরা বলছি ‘মেশিন লার্নিং’, ‘রোবটিকস’, ‘কম্পিউটার ভিশন’ অথবা ‘ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং’— এই সবকিছুই পাল্টে দিচ্ছে সমাজকে যে স্কেলে, সেটা ব্যবহার করতে পারছে সামান্য কিছু ‘বুদ্ধিমান’ কোম্পানি। সব সরকার নয়।

এ অবস্থায় সরকারগুলোকে তৈরি হওয়া প্রয়োজন এই ধরনের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে কবজা করে। প্রথমত, সরকারি সংস্থাগুলোর এই প্রযুক্তির ব্যবহারকে সামনে নিয়ে আসা উচিত তাদের প্রতিদিনের কাজে, বিশেষ করে অপারেশনাল অংশে, নীতিনির্ধারণীতে এবং জনগণের জন্য সার্ভিস ডেলিভারিতে। দ্বিতীয়ত, যেখানে সরকার খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে এই প্রযুক্তিগত ব্যাপারগুলো নিয়ে, জনগণ যাতে বিপদে না পড়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা তৈরি করার কাজে।

এর মানে এই নয় যে নতুন প্রযুক্তি আমরা বুঝছি না, সেটাকে আটকে রেখে আরও সমস্যা জন্ম দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ‘শেয়ারিং ইকোনমি’ এবং ‘ব্লকচেইন’-এর ব্যবহার, যা অনেক সময় সরকারগুলো বুঝতে না পেরে সেগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করে নীতিমালা তৈরি করে।

যেকোনো প্রযুক্তির ভালো ব্যবহারের সঙ্গে কিছু অবৈধ ব্যবহার চলে আসে বলে পুরো প্রযুক্তিকে আটকে দেওয়া ঠিক নয়। সেখানেই সরকারগুলো মাঝে মাঝে প্রযুক্তিকে ঠিকমতো বিশ্লেষণ না করে ব্যবহার না করার পরিপত্র জারি করে, যা একটা দেশকে পিছিয়ে দেয়। হয়তোবা, সেই প্রযুক্তি আমাদের নিয়ে যেতে পারত পরবর্তী উৎকর্ষের ধারণায়।

প্রযুক্তিকে ব্যবহার না করার ক্ষতি

যেহেতু সবকিছু এত দ্রুত ঘটছে, সেখানে প্রশাসন যদি এই গতির সঙ্গে তাল না মেলায়, তখন সরকার এবং জনগণকে সেটার দাম দিতে হয়। ব্যাপারটা এ রকম যে, প্রশাসনের ব্যর্থতায় জনগণের নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। যখন সরকারগুলো এ ধরনের প্রযুক্তির পরিবর্তনকে ঠিকমতো ধরতে পারে না, তখন জনগণের আকাঙ্ক্ষা বোঝার যে অন্যান্য টুল, সেগুলো তার কার্যকারিতা হারায়।

ধরুন, যেই ব্যবসাগুলো ‘শেয়ারিং ইকোনমি’র ওপর ভিত্তি করে চলছে, সেগুলো অসাধারণ সাফল্য পায় সরকারগুলো বোঝার আগেই। যখন সরকারগুলো তাদের ওপর নীতিমালা তৈরি করার চেষ্টা করে, কারণ ওই প্রযুক্তিগুলোর ওপরে সরকারের ঠিকমতো ধারণা না থাকার কারণে নীতিমালাগুলো বিফলে পর্যবসিত হয়।

আমি ধারণা করি, এ ধরনের নীতিমালা সরকারের পক্ষে একা তৈরি করা সম্ভব নয়। তবে সরকারের যদি ব্যবসাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ঠিকমতো তৈরি না হয়, তখন ব্যবসাগুলো শুরু হয়ে যাওয়ার পরে সেগুলোকে নীতিমালার মধ্যে আনা বেশ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আর সে কারণে নতুন নতুন প্রযুক্তিগুলো কীভাবে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ‘ইম্প্যাক্ট’ ফেলছে সেটার ধারণা পেতে দরকার প্রশাসনগুলোকে প্রযুক্তির উৎকর্ষের থাকা। এতে জনগণের আকাঙ্ক্ষা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ধারণা এবং সরকারের নীতিমালা— সবই একই তালে চলতে পারে।

প্রাথমিক প্রস্তাবনা: আলিঙ্গন করতে হবে নতুন প্রযুক্তিকে

এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে প্রযুক্তিকে আটকে রাখার যৌক্তিকতা নেই। উপায় কী? সরকারের একটা ইউনিফাইড ইন্টারফেস তৈরি করতে হবে— জনগণের জন্য। জনগণ তো জানবে না কোন সংস্থার কাজ কী, অথবা কোন ব্যক্তি তার কাজ করে দেবেন। এর জন্য দরকার সরকারের সব ডেটাকে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দেওয়া। একটা ‘এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস’ অথবা ‘ডেটাহাব’ নিয়ে কাজ করার ‘ইউনিফিকেশন’ করার জন্য দরকার ডেটা থেকে সিদ্ধান্ত নেবার দূরদর্শিতা। এর পাশাপাশি ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’-এর একটা দরকারি কম্পোনেন্ট হবে প্রেডিকশনে মানে ‘ভবিষ্যৎ’ দেখতে। সেখানে দরকার প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ।

সংস্থাগুলোর মধ্যে ডেটার আদান-প্রদানের আইনগত বাধ্যবাধকতা

যুক্ত হবার বাধ্যবাধকতা

Success in the future of government work also depends on collaboration across agencies. Often agencies operate in isolated silos and miss out on learning from others.

—Report: Federal Agencies Must Be ‘Better Connected, More Collaborative’, Government Executive

আমি যেহেতু সরকারের ‘ডেটা ড্রিভেন’ কয়েকটা সংস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে চাকরি করেছি, সেটার পার্সপেক্টিভ থেকে ধারণা থেকে বলা যায়; সরকারগুলোর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে সংস্থাগুলোর নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের অভাব। সে কারণে সরকারের কাছে প্রচুর ডেটা থাকা সত্ত্বেও সেই ডেটাগুলো ‘সাইলো’ হিসেবে পড়ে আছে সংস্থাগুলোর ভেতরে। আজকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থানের পেছনের একটা বড় কারণ, বিগ ডেটা; যখন এ ধরনের ডেটাগুলো একে অপরের সঙ্গে কথা বলে। আমি জনগণ হিসেবে একটা অফিস থেকে ছাড়পত্রের জন্য গেলে তখন সেই অফিস যখন অন্যান্য আরও কয়েকটা অফিস থেকে ছাড়পত্র আনতে বলে, তখন ওই সংস্থাগুলোর ভেতরে সমন্বয়হীনতার ব্যাপারটা জানান দেয়।

সরকার ও জনগণ: একটা ‘সিঙ্গেল’ ইন্টারফেস

সত্যি কথা বলতে, জনগণের জানার কথা না সরকারের কোন সংস্থা কী কাজ করছে, কোথায় করছে এবং কে করছে। সরকারি সার্ভিস পাওয়ার জন্য সরকারের একটা ‘সিঙ্গেল ইন্টারফেস’ থাকলে সরকারকে এর পেছনে সব সংস্থার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করতে হবে। এই সিঙ্গেল ইন্টারফেস বলতে একটা ওয়েবসাইট বলা হচ্ছে না, বরং একটা চ্যানেল, যেখানে সবাই জমা করবে তাদের চাহিদা। ‘ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো’ এর মতো।

সেটা হতে পারে ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, ইউএসএসডি কোড, অথবা সনাতন সার্ভিস সেন্টার। প্রযুক্তির ব্যবহার ঠিক জায়গায় পৌঁছানোর দায়িত্ব সরকারের। এই যোগসূত্রের প্রথম ধাপ হচ্ছে প্রশাসনিক আইনগত বাধ্যবাধকতা। সরকারি সংস্থার মধ্যে এই মুহূর্তে এ ধরনের আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই, যেখানে তারা নিজেদের মধ্যে জনগণের প্রয়োজনে ডেটা শেয়ার করবে।

ছাড়পত্রের প্রসেস অটোমেশন, মানুষের ‘বায়াস’ ছাড়াই

অটোমেশন এবং গতি

5 minutes: That's all you need to get a commercial licence in Dubai.

—Gulf News

শুরুতেই সরকারের সঙ্গে জনগণের যে যোগসূত্র সেটাকে আমরা দু’ভাগে ভাগ করে ফেলি। প্রথমত, ব্যবসায়িক অথবা জনগণের সরকারি সুবিধাগুলো পাওয়ার জন্য ছাড়পত্র। এই ছাড়পত্রগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে যেই ‘রুলসেট’গুলো ব্যবহার হয়, সেগুলো শুরুতেই তৈরি করে দেয় প্রশাসন। পরবর্তী সময়ে পুরো প্রসেসটাকেই ‘অটোমেট’ করা যায় সেই রুলসেটের ভিত্তিতে। এই লুপে মানুষের প্রয়োজন নেই।

অনেক দেশে এই লুপ থেকে ‘সিদ্ধান্ত নেবার জন্য’ মানুষকে সরানো যাচ্ছে না। কারণ, এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মানুষের ‘বায়াস’ বিশেষ করে কাকে সার্ভিসটা দেওয়া হবে অথবা হবে না, সেই বৈষম্য তৈরি করে মানুষ নিজেই। এখানে পুরো প্রসেসটা ‘অটোমেট’ হয়ে গেলে মানুষের ‘বায়াস’

কমে আসবে। ফলে, মানুষ নির্বিশেষে সরাসরি একটা নীতিমালার ভিত্তিতে সার্ভিস পাবে, কাউকে আগে অথবা কাউকে পরে— এ ধরনের বৈষম্য তৈরি হবে না। অথবা, ‘আমি তার পরিচিত’ বলে বাড়তি সুবিধা নেওয়া যাবে না এই ধরনের সিস্টেম থেকে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই এই ধরনের ‘অনাপত্তি’ অথবা ‘ছাড়পত্র’ (যেমন ট্রেড লাইসেন্স, বিল্ডিং পারমিট) দেওয়ার সিস্টেমগুলো চলে গেছে রুল বেইজ সিস্টেমের কাছে। অনেক আগেই। সেজন্য অনেক দেশে একটা ওয়েবসাইটে বসে কয়েক মিনিটেই পাওয়া যায় ট্রেড লাইসেন্স অথবা ক্রেডিট কার্ড। যাচাই করে নেওয়া যায় এক মানুষের আদ্যোপান্ত। মানুষের স্পর্শ ছাড়াই। জনগণের যে অংশ ডিজিটাল সার্ভিস নেবার ব্যাপারে অভ্যস্ত নয় (বয়স্কদের ক্ষেত্রে হতে পারে) তাদের জন্য সনাতন সার্ভিস সেন্টার থাকলেও পেছনের সব সিদ্ধান্ত হবে একই ‘রুল বেইজড’ সিস্টেম থেকে।

বাকিটা আসছে সামনের প্রস্তাবনায়।

অপরাধ শনাক্তকরণ পদ্ধতি, ক্রাইম ডেটা

পুলিশের হাতিয়ার, ডেটা

The new crime-fighting weapon of choice for a growing number of police forces around the world isn't a gun, a taser or pepper spray— it's data.

—Can we predict when and where a crime will take place? [BBC News]

তিনটা সম্পর্কিত গল্প।

যখন বড় ইচ্ছিকাম যখন যে জিনিসটা দেখে মনে নিয়েছিলাম যে সব বড় জিনিস করে সরকার। আর সরকার ছাড়া গতিও ছিল না। কারণ, বড় ফান্ডের জোগানদাতা ছিল সরকারগুলো। বড় জিনিসগুলো মানে বলতে চাচ্ছিলাম যেগুলো করতে প্রচুর ফান্ডিং লাগে, যা প্রাইভেট সেক্টরের কাছে অসম্ভব ছিল। দেখুন, সরকারি ডারপার ফান্ডিং না থাকলে আসত না ইন্টারনেট। হতো না চন্দ্র বিজয়।

প্রোডাক্ট অপটিমাইজেশনে প্রাইভেট সেক্টর

তবে কয়েক দশকে পাল্টে গেছে ধারণা। আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট তৈরি এবং অরবিটে বসানোর কাজে পুরোটাই সহায়তা করেছে প্রাইভেট সেক্টর। এর পেছনে আছে উদ্ভাবনা। এই ‘ইনোভেশন’ অর্থাৎ উদ্ভাবনী ধ্যানধারণা এখন অনেক বড় কোম্পানির জন্ম দিয়েছে, যাদের উৎপত্তি হয়েছে একটা বাসার পেছনের গ্যারেজে। এই কোম্পানিগুলোর বাৎসরিক টার্নওভার অনেক দেশের জিডিপি আয় থেকেও বেশি। কারণ, সরকারগুলো দেশের ভেতরে যত প্রযুক্তি ব্যবহার করে, তার প্রায় শতভাগই আসে এই ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর কোম্পানিগুলো থেকে। রিসার্চ এখন প্রাইভেট সেক্টরের অংশ। কারণ, অপটিমাইজেশনে প্রাইভেট সেক্টর দুর্দান্ত।

‘ক্রাইম প্রেডিকশন’, অপরাধ না হলে কেমন হয়?

অনেক আগে একটা ভিডিও দেখছিলাম ‘আইবিএম’-এর। ‘ক্রাইম প্রেডিকশন’ নিয়ে। একজন ডাকাত অনেক প্ল্যান প্রোথাম করে যাবে একটা শপিংমলে, ডাকাতি করতে। এদিকে পুলিশ ডিপার্টমেন্টও তার আগের কার্যকলাপ ঘেঁটে প্রেডিকশন করে ধারণা করেছে কবে সেই ডাকাত যাবে ওই শপিংমলে। সত্যি বলতে, ডিপার্টমেন্টে প্রেডিকশন অ্যালগরিদম চলে সব সময়ে।

নির্ধারিত দিনে ডাকাত শপিংমলে হাজির। এসে দেখল দূরে একটা পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে। সামনে দাঁড়ানো পুলিশ অফিসার তাকে দেখে টুপি খুলে নড করলেন। সম্মানিত নাগরিককে সম্মান দেবার কায়দায়। ডাকাত যা বোঝার বুঝে ফেলল ওই মুহূর্তেই। পকেটের পিস্তল রইল পকেটেই। পুলিশ অফিসারকে ফিরতি একটা স্মিত হাসি উপহার দিয়ে ফেরত চলে গেল তার ডেরায়। একটা অপরাধ ঘটার আগেই সেটাকে দমন করার পদ্ধতি হতে পারে এটা।

ডেটা আমাদের হাতে

Cut crime, save time and optimize resources by using data driven insights to help know what's coming. Take advantage of structured

and unstructured data sources— including incident reports, surveillance, sensor and social media content.

—Crime Prediction and Prevention, Public Safety and Policing, IBM

‘দা মাইনরিটি রিপোর্ট’

১৯৫৬ সালের একটা সায়েন্স ফিকশন বই থেকে মুভিটা তৈরি হয়েছিল ২০০২ সালে। ‘দা মাইনরিটি রিপোর্ট’। ব্যাপারটা ছিল ‘প্রি-ক্রাইম’ নিয়ে। যে অপরাধটা সামনে ঘটতে পারে, সেটার ব্যাপারে আগে থেকেই একটা ‘প্রিভেন্টিভ’ ধারণা। অর্থাৎ সেটা যাতে না হয় সেটার একটা ব্যবস্থা নেওয়া। ব্যাপারটা এ রকম হতে পারে, আপনি একটা কার পার্কিং ঘেঁষে অন্ধকার রাস্তায় হাঁটছেন রাতে। হঠাৎ মনে হতে পারে কেউ আপনার দিকেই এগিয়ে আসছে। আর ঠিক তখনই আপনার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে একটা পুলিশ কার চলে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে হাত নাড়িয়ে অভিবাদনের মতো সাইন ল্যাপ্সয়েজে একটা কমিউনিকেশন ঘটল আপনার সঙ্গে। ব্যাপারটা নিরীহ মানে আকস্মিক মনে হতে পারে, তবে ডেটা ধরে পুলিশের ওই মুহূর্তের টহলটা ‘প্রি-ডেজিগনেটেড’ ছিল। অপরাধ ঘটার আগেই তার প্রিভেন্টিভ একটা ব্যবস্থা চলে এল। বিশেষ করে ওই মানুষটার ক্ষেত্রে, একটা অপরাধ করা থেকে বেঁচে গেল সে। মানবিক রাষ্ট্রের একটা স্ল্যাপশট বলতে পারেন এই ঘটনাগুলোকে।

অপরাধ করলে সেটার শাস্তি পেতেই হবে। তবে সেটার মানবিক দিক হচ্ছে অপরাধ করার আগেই সেই ধারণাটাকে ধরে তাকে কাউন্সেল করলে সেই অপরাধ করার শাস্তি পেতে হয় না সেই মানুষটাকে। আর সে কারণে অনেক উন্নত দেশে উঠে যাচ্ছে জেল-জরিমানা। কারণ, মানুষ সেগুলো করছে না। এর বড় কারণ হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা, নাগরিক অনুশাসন জানা। যে শিক্ষাকে ভর করে রাষ্ট্র হয়ে যাচ্ছে মানবিক, দিচ্ছে ইউনিভার্সাল হেলথকেয়ার, দিচ্ছে অনেক ধরনের ভাতা। তবে এই পরিবর্তনের একটা বড় অংশ আসছে তাদের গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে। মানবিক হবার একটা বড় ইনডিকেটর হচ্ছে বিচারব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রতা না থাকা। আর সে কারণে এই বইটাতে প্রাধান্য পেয়েছে ‘টেকনোলজিক্যাল জাস্টিস’ ও সরকারি সেবা সহজীকরণ।

এ ব্যাপারটা এত দিন সায়েন্স ফিকশন হিসেবে থাকলেও বর্তমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিংয়ের বদৌলতে এই জিনিসগুলো চলে এসেছে আমাদের সময়ে। ‘থ্রেড-পোল’ নামের একটি কোম্পানি, যার মানে হচ্ছে ‘থ্রেডিকশন পুলিশিং’, এই ব্যাপারে কিছু ডেটা অ্যানালিটিকস অ্যালগরিদম নিয়ে নেমেছে, যা বর্তমান ‘ক্রাইম ডিটেকশন’ মানে অপরাধ শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে নিয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। বেড়েছে ক্রাইম ডিটেকশনের হার। সাধারণ সময়ের থেকে অনেক ভালো ধারণা নিয়ে।

সামনের ১২ ঘণ্টার অপরাধ আগে দেখা

এর পুরো সিস্টেমটাই কাজ করে অনেক বছরের হিস্টোরিক্যাল, মানে আগের ডেটা নিয়ে, যেখানে অপরাধের ধরন, তার সময় এবং কোথায় অপরাধটা হয়েছে, এর পাশাপাশি ওই এলাকা স্পেসিফিক তথ্য, পাশাপাশি সম্পর্কিত আর্থসামাজিক তথ্যকে ঠিকমতো ‘কোরিলেট’ করলে সেই এলাকার ভবিষ্যৎ অপরাধের ব্যাপারে ভালো ধারণা পাওয়া যায়। এই সফটওয়্যারটার একটা বিশেষত্ব হলো সে চেষ্টা করবে সামনের ১২ ঘণ্টায় কোথায় এবং কখন ওই স্পেসিফিক অপরাধটা ঘটবে, সেটার একটা থ্রেডিকটিভ মডেল বের করা। বর্তমান সময়ের টাইমলাইনের সঙ্গে মিলিয়ে এর অ্যালগরিদম আপডেট হতে থাকবে নতুন ডেটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

অপরাধ ঘটার আগে বন্ধ করা

Predictive policing refers to the usage of mathematical, predictive analytics, and other analytical techniques in law enforcement to identify potential criminal activity. Predictive policing methods fall into four general categories: methods for predicting crimes, methods for predicting offenders, methods for predicting perpetrators' identities, and methods for predicting victims of crime.

The technology has been described in the media as a revolutionary innovation capable of ‘stopping crime before it starts’.

—Predictive policing, Wikipedia

মনে আছে গল্পের শুরুতে সরকার এবং প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর মধ্যে ফারাকের কথা? তাদের মধ্যে ফান্ডিং এবং জ্ঞানের ফারাক বাড়তে সরকারগুলো সাহায্য নিচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর। সরকার কাজ

করছে জননিরাপত্তার স্বার্থে, সেখানে প্রজ্ঞা দিয়ে সাহায্য করছে এই ‘প্রেড-পোল’-এর মতো অ্যানালাইটিকস কোম্পানিগুলো। ‘উইন-উইন’ অবস্থা।

এই ‘প্রেড-পোল’র জন্ম হয় ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াতে, যখন তারা কাজ করছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে। ডেটা থাকে সরকারের কাছে, তবে সেটার সঠিক ব্যবহার আসে প্রাইভেট সেক্টরের জ্ঞান থেকে। তখনকার ডেটা বলছিল, এই ধরনের প্রেডিকটিভ অ্যানালাইটিকস দ্বিগুণ মাত্রার অপরাধ প্রেডিকশন করতে পারছিল যখন ফিল্ডে নেওয়া হলো গবেষণা শেষে। পরের বছরে অপরাধের মাত্রা কমে এল দ্বিগুণেরও কম।

বাংলাদেশ প্রস্তাবনা, সম্ভব দেশের ভেতরেই

বাংলাদেশে সম্ভব? অবশ্যই। দরকার বছর ধরে সঠিক ক্রাইম ডেটা। অ্যালগরিদম বানানো সমস্যা নয়। আর সেটার জন্য দরকার দেশের ভেতরে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ। বাকিটা করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। সব সম্ভব আমাদের দেশেই। এই ধরনের সফটওয়্যারগুলোর আউটপুটগুলো খুবই সহজবোধ্য, যেখানে আইটি জ্ঞান না থাকলেও চলে।

শুরুতেই ধরে নিন এটা একটা গুলম ম্যাপ, যা যে কেউ নেভিগেট করতে পারে। পুরোনো ডেটা থেকে বিশেষ করে হিস্টোরিক্যাল ডেটা থেকে সময়, লোকেশন, আগের ক্রাইমের বিভিন্ন প্যাটার্ন থেকে প্রোবাবিলিটি স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনপুট নিয়ে সেটার প্রেডিকশন হিসেবে ৫০০ বর্গফুটের একটা ‘ক্রাইম জোন’ হিসেবে সে বলে দেবে। এ ধরনের ক্রাইম জোনকে অনেক সময়ে আমরা হটস্পট হিসেবে ধরি, যেখানে অন্যান্য জায়গা থেকে সেই জায়গায় অপরাধপ্রবণতার হার বেশি।

তখন সেই জোনকে বাড়তি নজরদারি করা পুলিশের দায়িত্ব। যেহেতু সবকিছুই ডেটা ডিপেনডেন্ট, অর্থাৎ ভালো ডেটা ইনপুট হলে আউটপুট তত রিয়েলিস্টিক হবে। আমার গত ১০ বছরের ধারণা বলে, যত দিন যাবে তত এ ধরনের মডেল পরিপক্বতা পাবে। শুরুতে এ ধরনের ডেটা না থাকাতে এ ধরনের মডেল থেকে ভালো আউটপুট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, সে কারণে পুরোনো ডেটা যত সম্ভব সঠিক হওয়া প্রয়োজন। এর

পাশাপাশি আগের হটস্পট এবং নতুন হটস্পটের মধ্যে একটা ‘কো-রিলেশন’ চলে আসবে। ফলে পুলিশ অন্যান্য জায়গার নজরদারির পাশাপাশি এ ধরনের হটস্পটগুলোকে কিছু বাড়তি নজরদারি করলেই অপরাধপ্রবণতা কমে আসবে।

আমি প্রচুর বিদেশি সফটওয়্যার দেখেছি এ ব্যাপারে, এদের সবারই কাজ প্রায় একই। পাশাপাশি ‘প্রফ অব কনসেন্ট’ এবং ডেমোতে চমৎকার কাজ করে, যেহেতু তাদের ডেটা অনেকটাই ‘প্রি-প্রসেসড’। অভিজ্ঞতা বলে, আমাদের মতো দেশে বাইরে থেকে সফটওয়্যার নিয়ে এসে কাজ করা হয় বটে, তবে সেটার ‘কাস্টমাইজেশন’ অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কাজে বাধাগ্রস্ত করে। তখন আমরা আগের সফটওয়্যারটা ফেলে দিয়ে নতুনভাবে আরেকটা সফটওয়্যার কিনি, যা কিনা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটায়। সেদিক থেকে দেশীয় সফটওয়্যার কোম্পানি সরকারি প্রণোদনা এবং ভালো ডেটা পেলে এ ধরনের কাজ তুলে দিতে পারবে। এখানে সফটওয়্যারের মুন্সিয়ানা থেকে ভালো ডেটার দরকার বেশি। এ ব্যাপারে স্থানীয় সফটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে।

এই ধরনের প্রযুক্তিতে ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে মেশিন লার্নিং, যা আগের ডেটাকে অ্যানালাইসিস করে বিভিন্ন ডেটা সোর্সের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে। সেগুলোর মধ্যে একটা অংকের ‘কো-রিলেশন’ সেটাই একটা সিদ্ধান্ত বের করে দেয়, যা মানুষ ‘অ্যানালিস্ট’ থেকে পাওয়া অসম্ভব। মানুষের কাজও না সেটা। ধরুন, লার্জস্কেল ডেটাসেটে কয়েক বিলিয়ন রেকর্ড, সেগুলোর প্রসেস করা সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে। আমরাও চাইছি না সেগুলো করুক মানুষ। বিশাল ‘ক্রেনের’ কাজও তো করে না মানুষ। তবে, যন্ত্রের দক্ষতা দেখেছি এ ধরনের বিশাল বিশাল ক্রাইম ডেটাতে। যেকোনো ভালো ‘ডেটা সায়েন্টিস্ট’কে গত পাঁচ বছরের নির্ভুল ডেটা দিলে সে সামনের দিনগুলোর ভালো অ্যাকুরেসির প্রেডিকশন দিতে পারবে। আর সেখানে ভুল হবে কেন, পুরোটাই তো অংকের খেলা।

আমি নিজেও ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের বিশাল ডেটাসেট থেকে যে ধরনের ‘ইনসাইট’ পেয়েছি, যা সাধারণ অ্যানালিস্ট থেকে পাওয়া অসম্ভব। এটাই স্বাভাবিক। সনাতন হটস্পট অ্যানালাইসিসে আমরা একটা ম্যাপের ওপর পুরোনো সব ডেটা ফেলে (ওভারলে) দেখতে চাই কেন ঘটনাটা ঘটেছে। এ ব্যাপারগুলোর আউটকাম থাকে না শুরুতে,

তবে সামনে কী কী ঘটতে পারে, এর পাশাপাশি আমরা বের করার চেষ্টা করি ‘কেন ঘটনাটা ঘটেছে?’ ফলে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের বলছে, সামনে কবে, কখন, কী ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। এটাই বড় পার্থক্য। মানুষ এক্সপার্ট ও ম্যাথমেটিক্যাল মডেল মানুষের ‘পারসেপশন’ থেকে অনেক ভালো কাজ করতে পারে।

ডেটার সাহায্যে মানুষকে সমাজে ফিরিয়ে আনা

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যারা জেলে আছেন, তাদেরকে কীভাবে সমাজে ফিরিয়ে আনা যায়, সেটার জন্য ডেটা দিয়ে মডেলিং করলে অনেক ভালো ধারণা পাওয়া যাবে। মানুষ খারাপ হয়ে জন্ম নেয় না, বরং ক্রিমিনাল ডেটা ঘাঁটলে বোঝা যায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে অনেকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ওসব ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের পেছনের পুরোনো ডেটা ব্যবহার করলে জানা যাবে কারা এখনই সমাজে ফিরতে পারবেন।

মানুষকে সাজা দেবার অর্থ তাকে শাস্তি দেওয়া নয়, বরং এই কাজ যাতে ভবিষ্যতে সে না করে সেটার ব্যবস্থা করা। পুরোনো ডেটা এবং ঠিকমতো মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং করলে অনেক অপরাধীকে তার সাজার সময় শেষ হবার আগে সমাজে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ক্রাইম ডেটা নিয়ে কাজ করার সময়ে এ ব্যাপারটা অনেক ভাবিয়েছে আমাকে। অনেক দেশে অপরাধী না পাওয়ায় জেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার উঠে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এবং আগাম ধারণার প্রশাসন, কীভাবে?

থাপ খাইয়ে নিতে পারা

We understand anticipatory governance to broadly mean governing in the present to adapt to or shape uncertain futures.

—Four approaches to anticipatory climate governance: Different conceptions of the future and implications for the present, Wiley Online Library

অ্যান্টিসিপেটরি গভর্নমেন্ট অর্থাৎ আগাম ধারণার প্রশাসন

ডেটার ভবিষ্যৎ দেখার বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যবহার করে প্রশাসন একধরনের ‘অ্যান্টিসিপেটরি গভর্নমেন্ট’ অর্থাৎ আগাম ধারণার প্রশাসন তৈরি করতে পারে। কিছুটা আবহাওয়া পূর্বাভাসের মতো। ফোরকাস্ট দিয়ে সমস্যা খুঁজে বের করে সেটার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে তৈরি থাকা। মানুষ কালকে অর্থাৎ সামনের মাসগুলোতে যেই সমস্যাগুলোতে পড়তে পারেন, সেটা যদি আগেভাগে সমাধান করা যায়, তাহলে কেমন হয়? সেই প্রশাসনকে মানুষ ভালো না বেসে যাবে কোথায়? ডেটাকে ঠিকভাবে অ্যানালাইসিস অর্থাৎ নিরীক্ষণ করলে সামনে কী ঘটতে পারে সেটা নিয়ে কাজ করছে অনেক দেশের প্রশাসন। নীতিমালা তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করলে সেই নীতিমালার ফলাফল একটা সামগ্রিক ড্যাশবোর্ডে আসে। নীতিনির্ধারকদের জন্য। সেই রাস্তায় হাঁটছে অনেক দেশ এখন।

সার্ভিস হবে দ্রুত, ভালো ও কম খরচে

বাংলাদেশের ‘ডেটা ড্রিভেন’ প্রশাসন সরকারি সার্ভিস ডেলিভারিতে অবশ্যই ভালো ফলাফল দেখাতে পারবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে।

বর্তমানে সরকারি পদ্ধতিতে জমিসংক্রান্ত কেনাবেচা, নাম পরিবর্তন, নামজারি ইত্যাদি ভূমির সার্ভিসগুলোতে যে সময় লাগে, সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এলে পুরো ব্যাপারটাই নেমে আসবে কয়েক দিনে। ডেটাসেটগুলো যখন একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, তখন বিভিন্ন সংস্থা থেকে সরকারি ছাড়পত্রগুলো নিরীক্ষণ হবে অনলাইন কোয়েরি দিয়ে যা করবে সিস্টেমের ভেতরের ওয়ার্ক ফ্লো। এখন যেখানে অনেক টেবিল ঘুরতে হচ্ছে অ্যানালগ প্রসেসে, তখন ডিজিটাল প্রসেসে ব্যাপারগুলো কমে আসবে নতুন ডিজিটাল ডিজাইনে।

প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন দৈনন্দিন সিদ্ধান্তের প্রসেসগুলো পুরোপুরি অটোমেটেড হয়ে যাবে, তখন কাজের সময় আসবে কমে। যেকোনো কাজের প্রসেসের মধ্যে কোনো ধরনের ভুল অথবা ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন বা পরিমার্জন, অথবা প্রতারণামূলক কার্যক্রম, সিস্টেম থেকেই ‘ফ্লাগিং’ অর্থাৎ আটকে দেবে প্যাটার্ন বুঝে। যখন একটা রিসোর্স অনেকের মধ্যে ভাগ হবে তখন সেটার ব্যবহারের অপটিমাইজেশন করতে পারবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বিশেষ করে দেশব্যাপী এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিংয়ে। একই খাতে টাকা কোথায় কয়েকবার খরচ হচ্ছে, সেটাও ধরা পড়বে ড্যাশবোর্ডে।

কম খরচ, ভালো সার্ভিস

These new applications could save hundreds of millions of staff hours and billions of dollars annually. But the shift's size and impact will depend on many factors, some political and some financial. With adequate investment and support, we believe, AI could free up 30 percent of the government workforce's time within five to seven years.

—How much time and money can AI save government? Deloitte Insights

সরকারি কোন কোন সার্ভিস দিতে গিয়ে সময় বেশি লাগছে এবং কেন লাগছে সেটা বের করতে পারবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। যেহেতু বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে শুরুতে ছোটখাটো সিদ্ধান্তগুলো একটা প্রসেসে পড়ে যাবে বলে দিনের কাজ দিনেই বের করে আনা যাবে। যেমন, সরকারি হেলথকেয়ার সিস্টেমে কোন রোগীকে হাসপাতাল থেকে আগে ছেড়ে দিলে সেই রোগীর আবার ভর্তি হওয়ার আশঙ্কা কতটুকু, সেটা জেনেই

রোগীকে ঠিকমতো ছাড়ার ব্যবস্থা করা যায়। সেই রোগী যদি আবার একই সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয় দুই দিন পরে, তাহলে সরকারের রিসোর্সের ক্ষতি হয় ঠিক প্রেডিকশন না করার কারণে।

প্রেডিকটিভ মডেল, সামাজিক সুবিধা দেবার ক্ষেত্রে

বাংলাদেশের পেনশন অর্থাৎ অবসর ভাতা থেকে শুরু করে বয়স্ক ভাতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভাতা (সামাজিক সুবিধা হিসেবে) আগে থেকে হিসেব করা যাবে সরকারি সিস্টেমের তথ্য অনুযায়ী। কয়েক বছর আগেই এক বছরে কত টাকা আলাদা করে রাখতে হবে, সেটা বের করা যাবে কবে কতজন অবসরগ্রহণ করছেন। এ ধরনের প্রেডিকশন বাঁচিয়ে দেবে অনেক ধরনের বিপদ থেকে। প্রশাসনকে হতাশ করতে হবে না কাউকে। কে একটা ভাতার জন্য যোগ্য অর্থাৎ কোন কোন মানদণ্ড মেনে একজন ভাতা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত, সেটা বের করে দিবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

ইউরোপে এ রকম বেশ কিছু দেশে সামাজিক সুবিধা বন্টন করা হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রেডিক্টিভ মডেলের সাহায্য নিয়ে। এই জায়গাগুলোতে মানুষ যেভাবে সিদ্ধান্তের লুপ থেকে বের হয়ে যাবে, এর সঙ্গে সঙ্গে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত দেওয়ার মানুষের সংখ্যাও আসবে কমে। এটা তখনই হবে যখন সর্বশেষ সিদ্ধান্তগুলো দিতে চাইবে মানুষ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ‘সামগ্রিক’ প্রশাসন

আমি যখন সরকারের বেশ কিছু মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরে কাজ করেছি, তখন একটা জিনিস বোঝা গেছে, প্রশাসনের সুবিধার্থে প্রতিটা মন্ত্রণালয় আসলে একেকটা সরকার। নীতিমালাগুলোতে স্পষ্ট করে বলা থাকে ‘সরকার বলতে উক্ত মন্ত্রণালয় বুঝাইবে’, এর অর্থ হচ্ছে সরকার তার কাজগুলোকে ঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য একেকটা মন্ত্রণালয়কে সরকারের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে মন্ত্রণালয়গুলো সরকারের হয়ে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ‘সামগ্রিক সরকার’ অর্থাৎ প্রশাসন হচ্ছে এমন একটা নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রসেস, যেখানে প্রতিটা মন্ত্রণালয় এবং সরকারের প্রশাসন একে অপরের কাজের সামগ্রিকতা ভেবেই কাজ করবেন।

অটোমেশন

Since overall government employment trends follow skills-biased trends, we expect similar trends at the task level, determining which government tasks will be replaced sooner than others.

—How much time and money can AI save government? Deloitte Insights

সরকারের কাজের ভেতরে প্রচুর সদৃশ কাজ অর্থাৎ ‘ডুপ্লিকেশন’ থাকে, যেখানে বিভিন্ন সংস্থার আলাদা আলাদা প্রচেষ্টা এবং টাকা সময় নষ্ট হয়। এর পাশাপাশি একটা কাজের ইভেন্ট আরেকটা উন্নয়নকাজের কোথায় প্রভাব ফেলবে, সেটা জানা যাবে কীভাবে? ধরা যাক, সরকার নতুন কিছু কর আরোপিত করলে সেটা শিক্ষা খাত অথবা পোশাক খাতে কতটুকু প্রভাব ফেলবে? অথবা বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের ট্রাফিক কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলছে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটা বড় অংশ হচ্ছে সামগ্রিকভাবে একটা কাজ অন্য আরেকটা ওপরে কী ধরনের প্রভাব ফেলে সেটা বের করতে পারা।

শক্তি উৎপাদন, জেনারেশনে অসাধারণ ‘অপটিমাইজেশন’

যেকোনো দেশের জন্য শক্তি উৎপাদন অর্থাৎ এনার্জি জেনারেশন তার সক্ষমতার একটা বড় অংশ। সাধারণ গ্যাস টারবাইন থেকে যে বিদ্যুৎ আসবে, তার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য শক্তি কীভাবে (গ্রিডের শক্তি ব্যবহারে) আরও অপটিমাইজ করা যায়, সেটা করতে পারবে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আমি কয়েকটা দেশের শক্তি উৎপাদনের দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি, তাদের প্রেডিকশন ক্ষমতা অসাধারণ। কোন শক্তি নষ্ট হবার নয়।

এনার্জি অর্থাৎ শক্তি জেনারেশনের পাশাপাশি আবহাওয়া পূর্বাভাস ধরলে কখন সোলার প্যানেল সূর্য পাবে আর কখন সাগরের পাড়ে টারবাইন ঘুরিয়ে এর সঙ্গে জাতীয় গ্রিডে কারা কারা শক্তি দিতে পারবেন, তাদের মধ্যে সমন্বয় করে পুরো বছরের একটা ভালো শক্তি ধারণা দিতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বিদ্যুৎ জেনারেশন নিয়ে একটা বিশাল অংশ আছে, যার মাধ্যমে এই জেনারেশন চালানো যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রেডিকশন

থেকে। মাথা খারাপ করে দেবার মতো প্রজ্ঞা। বসিয়ে দিতে হবে না ক্যাপটিভ চার্জ।

কখন কোন্ডস্টোরেজ চলবে এবং কখন ব্যবসায়িক লাইনে বিদ্যুতের দাম কমবে, এই সবকিছুই মেলানো যাবে যদি একটা ভালো পূর্বাভাস পাওয়া যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে। পাওয়ার জেনারেশনের প্রচুর পূর্বাভাস আসে আগের বছরগুলোর ডেটা থেকে। ২০-৩০ বছরের ডেটা। বিদ্যুতের দাম কখন বাড়লে বা কমলে গ্রাহকদের সুবিধা হয় সেটাও প্রেডিকশন করতে পারবে মডেল। পাওয়ার জেনারেশন কখন বাজারের জন্য ভালো হবে এবং কখন গ্রাহকেরা এর ব্যাপারে ন্যায্য দাম দিতে পারবেন, সেটাও হিসেব করা যায় এই পদ্ধতিতে। এর পাশাপাশি গ্রাহক থেকে তৈরি বিদ্যুৎ কীভাবে গ্রিডে ফেরত দেওয়া যায়, সেটা নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে মধ্যে।

সরকারি কাজে সংবেদনশীলতা অর্থাৎ রেসপনসিভনেস

ডেটার যে ক্ষমতা, সেখানে জনগণের প্রতিটা সমস্যা ধরে ধরে সেটার সমাধান করা যায় এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। যেহেতু প্রতিটা জিনিস ‘রুল-বেজড’ সিস্টেমের মাধ্যমে হচ্ছে সেখানে মানুষের সাহায্য ছাড়াই জনগণের মোটাদাগের সমস্যাগুলো মেটানো যাবে, একটা প্রসেস ফ্লো’র মাধ্যমে। ডেটা ড্রিভেন সরকারের একটা বিশাল কাজই হচ্ছে জনগণের সমস্যা খুঁজে খুঁজে বের করে সেটার সমাধান দেওয়া। অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের পুরোনো গ্রাহকদের খুঁজে পেতে যেভাবে তাদেরকে সার্ভিস দেয়, সে রকম মডেলে। বিগ ডেটা ব্যবহার করে। জনগণের সঙ্গে ‘ক্রেতার বিশ্বস্ততা’র মতো ধারণা একটা প্রশাসনের জন্য আশীর্বাদ।

‘আমরা এখনো অভিযোগ পাইনি’ অথবা ‘লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে’ এ ধরনের সরকারি গৎবাঁধা উত্তর প্রয়োজন পড়বে না, যখন এই ‘প্রসেস ফ্লো’ মানুষের সিদ্ধান্ত ছাড়াই চলবে। সোশ্যাল মিডিয়া কী নিয়ে সামনে উত্তাল হবে, সেটার ধারণা আগেই পেতে পারে প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস। জনগণের সমস্যাগুলোকে প্রেডিকশন করে সেটার জন্য তৈরি থাকাই হচ্ছে ‘অ্যান্টিসিপেটরি গভর্নমেন্ট’ অর্থাৎ আগাম ধারণার প্রশাসনের কাজ। অনেক আগে পড়েছিলাম, যেই প্রশাসন অদৃশ্যমান, যাদের অফিস/দালানকোঠা দেখা যায় না, যাদেরকে নিয়ে কোনো আলাপ

নেই পত্রিকায়, তাদের নীতিমালাই কথা বলে তাদের উপস্থিতি প্রতিমুহূর্তে। সে ধরনের ‘অদৃশ্য’ প্রশাসন কীভাবে সম্ভব? সম্ভব, ডেটা থেকে। সেই ডেটার শুরুরটা আসছে কোথা থেকে?

বিভিন্ন জরুরি সেবা কল সেন্টারের ডেটা অ্যানালাইসিস

আমার যেহেতু সরকারের বেশ কয়েকটি জরুরি সেবা কল সেন্টারের ডেটা নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল একসময়, সেখানে কল সেন্টারের মানুষের সমস্যাগুলো ঠিকমতো ইনপুট দিয়ে প্রসেস করলে অনেক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করলে প্রতিটা কল থেকে ‘যিনি ফোন করেছেন, তার ডিটেইলস’, ‘কোথা থেকে ফোন করেছেন’ যা পাওয়া যাবে ‘লোকেশন’ সিস্টেমের মাধ্যমে, ‘কী জন্য’ ফোন করেছিলেন, কোন অফিসে তার সমস্যাটা আটকে আছে, কত দিনের মধ্যে সমাধান প্রয়োজন— এ ধরনের ডেটাগুলোকে অ্যানালাইজ করলে সরকারের সার্ভিসের বর্তমান চিত্র পাওয়া যাবে।

কোন সমস্যাগুলো বর্তমানে জনগণকে খুব ভোগাচ্ছে, কোথায় আটকে যাচ্ছে জিনিস, সমাধানের প্রস্তাবনা, সেগুলোর ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস এবং এর পাশাপাশি এই ধরনের কলগুলোকে কীভাবে আরও ভালোভাবে প্রসেস করা যায়, সেটাও সম্ভব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। রিসোর্স অপটিমাইজেশন সম্ভব এভাবে। উদাহরণ হিসেবে, সরকারি সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে সেই সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে একই জায়গায় চার ধরনের সার্ভিস দিতে হলে সেখানে চারটা গাড়ি আলাদা না পাঠিয়ে একটা গাড়ি চারটা সার্ভিস দিয়ে আসতে পারে। প্রাইভেট সেক্টর যেভাবে তাদের সার্ভিস ডেলিভারি করতে পারে খুব অল্প সময়ে, সে ধরনের মডেল সম্ভব যখন সরকারের ভেতরের সংস্থাগুলো ডেটা শেয়ার করা শুরু করবে নিজেদের ভেতরে।

মানুষকে মধ্যে রেখে সল্যুশন— ‘হিউম্যান সেন্টারড ডিজাইন’

প্রযুক্তি সমস্যা নয়, মানুষকে বুঝতে দরকার প্রযুক্তি

The technology is the easy part. The hard part is figuring out the social and institutional structures around the technology.

—John Seely Brown, AI Needs Human-Centered Design

সরকারি সেবা সহজীকরণ প্রকল্পে ‘সলিউশন ডিজাইন’ তৈরি করতে ‘হিউম্যান সেন্টারড ডিজাইন’ না ব্যবহার করলে সেটা কাজ করবে না। যেকোনো সমস্যাকে দেখতে হবে ব্যবহারকারীর চশমা দিয়ে এবং সেই সলিউশনটাই কাজ করবে যখন ডেভেলপাররা শুরুতে ব্যবহারকারীর দরকারকে ঠিকমতো ফোকাস করে। এ ধরনের ‘হিউম্যান সেন্টারড ডিজাইন’ ভালো কাস্টমার সার্ভিস দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেখানে এর ভেতরের প্রক্রিয়াগুলোকে এমনভাবে তৈরি করে, যাতে দক্ষতা ও ভুলের সংখ্যা কমিয়ে সরকারি এই সার্ভিসগুলোর খরচ নামিয়ে নিয়ে আসে।

যখন অনলাইনে সব সরকারি সেবাগুলো আসবে, তখন প্রচুর সরকারি স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণের খরচগুলো কমে আসবে এলাকাগুলোতে। সব জনগণকে অনলাইন পোর্টালে আনার জন্য সরকারি স্থাপনার খরচগুলোকে ভর্তুকি হিসেবে দিলে সবাই অনলাইনে চলে আসবে। যেমন, যখন আয়কর-ব্যবস্থা পুরোপুরি অনলাইনে চলে আসবে, তখন বিভিন্ন শহরে রাজস্ব স্থাপনাগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে আসবে। এতে আয়কর দেবার জন্য বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ কমে আসবে। কারণ, অনেক সরকারি স্থাপনায় প্রতিবছর প্রশাসনিক যত খরচ হয়, সেগুলোর ওভারহেড কমে আসবে জনগণের করের ওপর।

‘কো-ক্রিয়েশন’, জনগণকে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিতে আনা

In 2017, 599 regional and national projects and in 2018 a total of 692 projects were put to the vote online or via an SMS system. Whilst in 2017 nearly 80,000 people took part in the vote, this number rose to 120,000 in 2018.

—Portugal, The World’s first National Participatory Budget, Politics Reinvented

বিশ্বব্যাপী নীতিনির্ধারণীতে নাগরিকদের অংশগ্রহণের ব্যাপারটা ভালোই বেড়েছে। ডেটা ব্যবহার করার কারণে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো বুঝতে পারছে কোথায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ তাদের প্রশাসনের কাজগুলোকে আরও সহজ করে তুলবে। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটা দেশ অংশগ্রহণমূলক বাজেটিংয়ের ব্যাপারে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করে আসছে। পর্তুগালে পৌরসভাগুলোতে সেই ২০০০ সাল থেকেই নাগরিকদের অংশগ্রহণমূলক বাজেটের অনেক অনুশীলন দেখেছি বিভিন্ন খবরে।

ধীরে ধীরে পর্তুগাল ও ব্রাজিল তাদের জনগণকে জাতীয় বাজেট প্রণয়নে যুক্ত করেছে। জনগণকে রাজনীতির আরও কাছে আনার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে বড় প্রকল্পগুলোর মধ্যে কোনগুলোতে জনগণের সায় আছে, সেগুলো বোঝার জন্য জনগণকে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রস্তাবনা নিয়ে অনলাইন এবং এসএমএস দিয়ে ভোটের ব্যবস্থা করা হয়। জনগণ অনেকে মিলে কোন কোন প্রকল্প কাজে লাগবে সেগুলোর প্রস্তাবনা দেন ওয়েবসাইটে। সেখানে বাছাই হয় অন্তর্ভুক্তিমূলক সেরা প্রকল্পগুলো হিসেবে। জনগণকে জাতীয় বাজেট প্রণয়নে অংশগ্রহণের পেছনে ডেটার ভালো কাজ রয়েছে।

ডেটা থেকে অনেক কিছু ধারণা করা যায়, কী হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে। ধরুন, উদাহরণ হিসেবে বলছি আমাদের খাবার পরিদর্শকদের কথা। এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে সব সেক্টরে কাজ করা সম্ভব। ডেটাকে বিশ্বাস করলে সমস্যাগুলোকে উতরে ওঠা যায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খাদ্য পরিদর্শন (একটা উদাহরণ)

খাদ্য পরিদর্শক কীভাবে জানবেন সামনে কোন হোটেল, রেস্টুরেন্ট অথবা বাজারে গেলে খাদ্যের সমস্যাগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে? শহরগুলো যখন আস্তে আস্তে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তখন মানুষ নিজের বাসায় তৈরি করা খাবারের পাশাপাশি বাইরের খাবারের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। এর পাশাপাশি বাইরে খাবার সরবরাহের ব্যাপারে অনেক উদ্যোক্তা কাজ করেছে বিভিন্ন অফিস, কারখানায় খাবার সরবরাহে। এ অবস্থায় একজন খাদ্য পরিদর্শক কীভাবে বুঝবেন কোথায় এই খাবারের সমস্যাগুলো পাওয়া যাবে?

এ ব্যাপারে বর্তমানে ‘সোশ্যাল মিডিয়া’, নিউজ কমেণ্টে, অথবা বিভিন্ন রিভিউয়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট অথবা বাজারের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে

মানুষের মতামতগুলো পাওয়া যায়। আমি নিজে কাজ করেছিলাম এগুলো নিয়ে, বিশেষ করে ‘সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিসে’। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ‘ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং’ ব্যবহার করে খাদ্যে বিক্রিয়া, পচা খাবার, মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার বিক্রি করা ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যাগুলো জানাতে পারবে সরকারের নির্ধারিত সংস্থাকে।

কৃষক এবং অন্যান্য আত্মহত্যার যোগসূত্র

আগে থেকে দেখার ধারণা

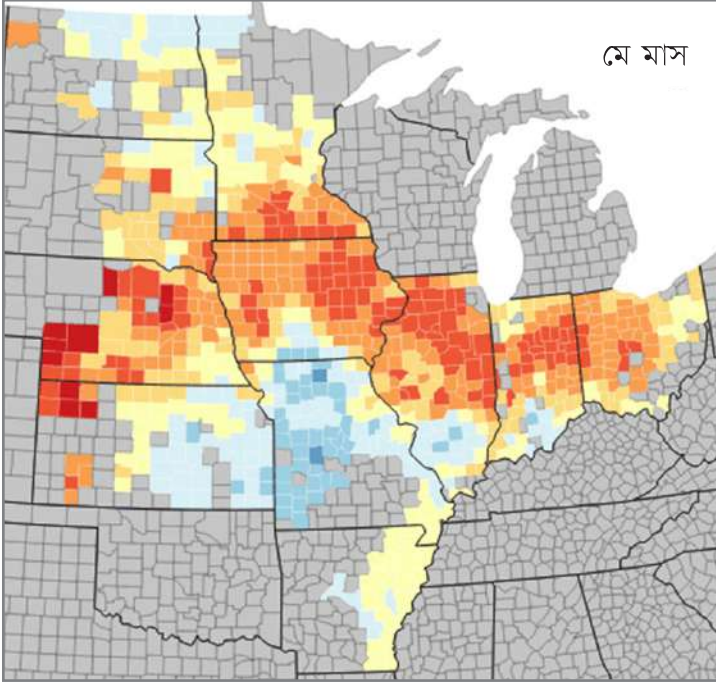
Machine learning analysis of social media data represents a promising way to capture longitudinal environmental influences contributing to individual risk for suicidal thoughts and behaviors.

—A machine learning approach predicts future risk to suicidal ideation from social media data, Nature

আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ায় অনেক কৃষক আত্মহত্যার খবর পাওয়া যায় প্রায়শ। যখন কোনো ফসল মার যায় অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টির কারণে, তখন তারা বাধ্য হয় উঁচু হারে টাকা ধার নিতে। বিশেষ করে তাদের সংসার আগলিয়ে রাখতে। কয়েকটা ফসল পরপর মার গেলে বন্ধকের কারণে প্রিয় ভিটেটাও হারাতে হয় একসময়। ব্যাপারগুলো অনেক সময় বাধ্য করে কৃষকদের আত্মহত্যা। চড়া সুদের হাত থেকে বাঁচতে তারা হাত বাড়ায় কীটনাশকের দিকে। খুবই কষ্টকর বিষয় বটে। ২০১২ সালের পর থেকে হিসেবমতে, ১২ হাজারেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করে শুধু ভারতে। একটা হিসেবে দেখা গেছে, প্রতি ১ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে একটা দেশের ৭০টি আত্মহত্যার সম্পর্ক আছে মাসে। কিছুই করার নেই কি আমাদের?

এরকম একটা বিশাল একটা কাজে লাগছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আমাদের আশপাশের দেশের কয়েকটা ‘স্টার্ট-আপ’ এলাকাভিত্তিক স্যাটেলাইট ইমেজে খুঁজে পাচ্ছে কোন এলাকাতে কী রকম ফসল হয়েছে আগে আর কী হবে সামনে। ছোট ছোট এলাকা ধরে। বুঝতেই পারছেন সেই ‘রিমোট সেন্সিং ডেটা’ থেকে অনেক ধারণা পাওয়া যাচ্ছে এখন। সেই ডেটা থেকে তারা যোগসূত্র পেয়েছে সেই আত্মহত্যাগুলোর। মানে, আমরা আগে থেকেই জানতে পারব এই বাড়িতে কোনো ফসল হয়নি গত কয়েক

মাসে। ভেতরের ডেটা থেকে পাওয়া যাবে এলাকাভিত্তিক কোন কোন ফসলের দাম পড়তির দিকে? কোথায় কৃষক ফসল বিক্রিতে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে? কোথায় সুদের হার কত এখন?



চিত্র ৪: রিমোট সেন্সিং ডেটা থেকে ধারণা

এই ডেটা থেকে আমরা বড় একটা ধারণা পেতে পারি সরকারি জরিপের আগেই। অনেক সময় ভুল অথবা সময়মতো জরিপ না হলে মানুষের ভেতরের খবর জানবে কে? কে আসলে কষ্টে আছে? কে একদম আত্মহত্যার মুখোমুখি পর্যায়ে আছে? ডেটা মিথ্যা বলে না। ফসল ধরে ধরে বলা যাচ্ছে কোথায় কী কী হচ্ছে? আসলেই তাই।

ফসলের রং ধরে বলে দেওয়া যায় আর কত দিন পরে ফসল উঠবে? কোথায় মঙ্গা হবে সেটা বের করা যাবে আগে থেকে। আবহাওয়া, মাটির অবস্থা, ফসলের দামও প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে এই মডেলে। আগামী বছর আমাদের চাল আমদানি করতে হবে নাকি সেটাও পাওয়া যাবে এখানে।

ফাও, একটা জাতিসংঘ সংস্থা এই কাজ করছে অনেক বছর ধরে। কোথায় খাদ্য সাহায্য পাঠাতে হবে, সেটার হিসেব তারা পায় আগে থেকে।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যা রোধ করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সোশ্যাল মিডিয়ায় সাহায্য

In 2017, Facebook automated the detection of suicide content. This was an upgrade from a simplified platform that required users to manually upload screenshots (2011) or flag (2015) suicide-based content for urgent review. If suicide risk is detected, crisis response protocols are initiated, which may include providing supportive resources and crisis line information to users, or alerting local emergency responders.

—Kleinman, 2015; Novet, 2018, The utility of artificial intelligence in suicide risk prediction and the management of suicidal behaviors

স্থানীয় গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে আত্মহত্যার হার প্রতি লাখে ৬ থেকে ১০ জন, যা উন্নত দেশের কাছাকাছি। গোটা বিশ্বে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন আত্মহত্যা করছে। বাংলাদেশেও এই সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। বছরে প্রতি লাখে ৮ থেকে ১০ জন আত্মহত্যা করছে। মনোরোগ চিকিৎসকেরা বলছেন, মানসিক রোগ নিয়ে সমাজে যে কুসংস্কার রয়েছে, সেটি রোধ করা না গেলে আত্মহত্যার মতো ঘটনা এড়ানো যাবে না।

বেশ লম্বা সময় ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে এই আত্মহত্যার ব্যাপারে বেশকিছু ঘটনা দেখেছি। দেশে-বিদেশে এবং অনেক ধরনের ফোরামে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কিছু প্যাটার্ন বোঝা যায়। ঘটনাক্রমে, যিনি আত্মহত্যা করেছেন, তিনি অনেক আগে থেকেই তার কিছু ‘স্পেসিফিক’ প্যাটার্ন রেখে যাচ্ছেন যা ‘ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং’ দিয়ে ভালোভাবে মনিটর করলে এ ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা ঠেকানো সম্ভব।

এর পাশাপাশি, জরুরি কল সেন্টারগুলোর কল ঠিকভাবে মনিটর করলে এ ধরনের সংখ্যা আরও পাওয়া সম্ভব। এ ব্যাপারে আশপাশের মানুষসহ অনেকেই সাহায্য করতে পারেন তাদের ইনপুট দিয়ে। সেই ইনপুটগুলো সব সময় থাকবে ক্রাইসিস-সেন্টারগুলোতে, যা থেকে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোকে প্রেডিক্ট করা যাবে।

ডেটা সংগ্রহে আইনগত বাধ্যবাধকতা

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, একজন মানুষ কীভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, বিশেষ করে উনার টাচস্ক্রিন ব্যবহার করার প্যাটার্ন দেখে তার মানসিক অবস্থা বোঝা যায়। ভবিষ্যতে (আইনগত বাধ্যবাধকতা যদি থাকে) একজন মানুষের মানসিক অবস্থা ভয়ংকরভাবে খারাপ হবার আগেই বেনামে মোবাইল অপারেটর/সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে প্রশাসন জানতে পারবে। সামনে বিশ্বের সবারই মানসিক-স্বাস্থ্য ঠিক রাখা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধা এখনই সম্ভব, তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য নেবার ব্যাপারে আইনি কাঠামো লাগবে।

বাংলাদেশে আইডেনটিফিকেশন

কাগজের ফটোকপির দৌরাখ্য, আর কত দিন?

সবাইকে জানা

An illiterate person is one who cannot write his name, and an illiterate state is one that cannot write the names of its citizens.

—Plan Nacional Peru Contra la Indocumentacion

কেন প্রয়োজন ‘একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি’ সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

আমাকে সরকারি এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে যেতে হয়। যেহেতু আমাদের প্রায় সব জায়গায় একটা বাড়তি সময় লাগে— তখন সেখানে থাকাকালীন সময়টার একটা বড় সময় আমি তাদের কার্যপদ্ধতি বোঝার চেষ্টা করি। ওই জায়গাগুলোতে (আমার অফিসেও কিছু জায়গায়) যে ব্যাপারটা আমার কাছে এখনো কষ্টকর মনে হয়, সেটা হচ্ছে যে জিনিসটা স্বল্প সময়ে সার্ভিস হিসেবে ডেলিভারি দেওয়া যায়, সেটার জন্য সময় লাগছে মাসের পর মাস। আমরাও মেনে নেই সে ব্যাপারগুলো বিনা বাক্যব্যয়ে।

সুখবর হচ্ছে, সরকার প্রচুর সফটওয়্যার কিনছে অটোমেশনের জন্য, তবে সেগুলোর অনেকগুলোই ঠিকমতো কাস্টমাইজেশন অথবা লোকালাইজেশন না করার ফলে আগের সিস্টেমে ইন্টিগ্রেশনে সমস্যা বাড়তে থাকে। ফলে, সফটওয়্যারগুলো বর্তমান সিস্টেমের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কোথাও না কোথাও অসম্পূর্ণ/ইনকম্প্যাটিবল হয়ে থাকে। এতে সেই সার্ভিস অথবা সফটওয়্যার থেকে আশানুরূপ সার্ভিস না পেয়ে আবার অনেকে অ্যানালগ

সিস্টেমে ফেরত যান। দেশের ডিজিটাইজেশনের জন্য এটা একটা বড় সমস্যা।

সিস্টেম থেকে সিস্টেমের সংযোগ: অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস

সিস্টেম থেকে সিস্টেম, মানে সিস্টেমগুলো নিজেদের মধ্যে ঠিকমতো কথা বলছে না বলে আমাদের সার্ভিস ডেলিভারিতে সময় কমাতে পারছি না। সরকারি-বেসরকারি সব ডকুমেন্ট ই-ফাইলিং না হওয়ায় পুরো ডকুমেন্ট ইকোসিস্টেমে একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করাতে সফটওয়্যারগুলোর ভেতর অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস অর্থাৎ এপিআই বিভিন্ন কোম্পানির সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন না হওয়ায় এই ইনকম্পেটিবিলিটি। ফলে বিলগেটসের কথা অনুযায়ী একটা দক্ষ সিস্টেম অদক্ষ প্রসেসে পড়ে আরও বেশি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে।

ফটোকপি-নির্ভর ব্যক্তি শনাক্তকরণ পদ্ধতি

একটা জমির নামজারি অর্থাৎ মিউটেশন অথবা রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে সেই ব্যক্তির শনাক্তকরণ পদ্ধতির জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি প্রয়োজন হয়। তবে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, যা সহজে জাল করা সম্ভব, পাসপোর্টের ফটোকপি অথবা ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নাম্বারের ফটোকপি যত জিনিসই জমা দেওয়া হোক না কেন, সব জায়গাতেই জাল হবার সুযোগ থাকে। একটা কাজের জন্য পনেরোটা ডকুমেন্টের ফটোকপি, যার সবগুলোই জাল করা সম্ভব, সেখানে তাদের সফটওয়্যারের সঙ্গে একটা একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি সংযোগ থাকলেই এই সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব। এখানে সরকার দুটো অফিসের মধ্যে একটা ডেটা শেয়ারিং চুক্তিপত্র, যার মাধ্যমে দুটো অফিস নিজেদের মধ্যে এই শনাক্তকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতি দিয়ে ব্যক্তি শনাক্তকরণ পদ্ধতি

যেভাবে একটা মোবাইল ফোনের সিম একজন ব্যক্তির আঙুলের ছাপ অর্থাৎ বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন দিয়ে কেনা যাচ্ছে, সেখানে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি রাখা হচ্ছে সরকারি কিছু বাধাবাধকতার কারণে। তবে আমরা সিস্টেমে দেখেছি, এই ফটোকপির প্রয়োজন নেই।

কারণ, একটা মানুষের সব তথ্য স্টোর করা আছে জাতীয় পরিচয়পত্র সিস্টেমে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের দরকারমতো সেই সিস্টেম থেকে তথ্য নিয়ে কাজ করছে।

যেহেতু জাতীয় পরিচয়পত্র ফটোকপি জাল হয় সে কারণে রাজউককে দেখেছি আসল পাসপোর্ট দিয়ে একজন মানুষকে শনাক্ত করতে। অর্থাৎ যে জিনিসটা জাল করা যাচ্ছে না, সেটা দিয়ে শনাক্তকরণের একটা চেষ্টা। কিন্তু সবার কি পাসপোর্ট আছে? তাদের জন্য কী হবে? ভূমি অফিসের সব ধরনের শনাক্তকরণ পদ্ধতি কাজ করতে পারে যখন তাদের সফটওয়্যার কথা বলবে জাতীয় পরিচয়পত্র সিস্টেমের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে। এর মাধ্যমে সব ধরনের জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব।

আমরা, সরকারি ও বেসরকারি অফিসে প্রচুর সফটওয়্যার কিনছি, তবে সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে সঠিক ‘লোকালাইজেশন’ বা ‘কাস্টমাইজেশন’ (বাংলাদেশের নীতিমালা অনুযায়ী যে ধরনের প্রযোজ্যতা দরকার) না থাকার ফলে এই ব্যাপারগুলো আরও দেরি হচ্ছে। ধরুন, এই মুহূর্তে ভূমিসংক্রান্ত সব সরকারি সার্ভিস জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাবেইসের সংযোগ দিয়ে শুরু করলেও সেখানে নীতিনির্ধারণীতে থাকা এবং যারা আসলে কাজটা করবেন, তাদের সঠিক জ্ঞানের অভাবে এ ধরনের সমস্যা দীর্ঘ হচ্ছে। এই দীর্ঘসূত্রতার শেষ সম্ভব যখন এই ধরনের ইমপ্লিমেন্টেশনে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ থাকবেন।

ডিজিটাল প্রসেস মাইন্ডসেট

প্রাইভেট সেক্টরে একই সমস্যা বিদ্যমান। জাতীয় সঞ্চয়পত্র কেনার জন্য আমার ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, জাতীয় পরিচয়পত্র, ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নাম্বার অথবা পাসপোর্টের কপি দিয়ে। সেখানে ব্যাংক জাতীয় সঞ্চয়পত্র কেনার জন্য আলাদা করে আবার জাতীয় পরিচয়পত্র, ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বরের জন্য আলাদা শনাক্তকরণ কপি, অথবা পাসপোর্টের ফটোকপি জমা দিতে বলল। এর পাশাপাশি আমার ব্যাংকের চেক বইয়ের কপি চাইলেন ব্যাংকের সঙ্গে সংযোগের প্রমাণের জন্য। সবশেষে এই সঞ্চয়পত্র কেনার জন্য একটা বিশাল ফর্ম লিখতে হচ্ছে, যার মধ্যে সব

তথ্যই ব্যাংকে ডিজিটাল ফরমে বিদ্যমান। আর আমি যা-ই জমা দিচ্ছি, ফটোকপি হিসেবে সবগুলোর তথ্য জমা আছে ব্যাংকে আগে থেকেই। হয়তোবা প্রোডাক্ট ম্যানেজার সময় নিয়ে ব্যাপারটাকে ঠিক প্রসেসে ফেলে ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে ফেলছেন না।

সমস্যা একটাই। আমি অনলাইনে সঞ্চয়পত্র কিনতে চাইলে আমার শনাক্তকরণ পদ্ধতি নিয়ে সবাই বিপদে আছেন। ব্যাংকগুলোর একটা একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি সঙ্গে সংযোগ না থাকায় একেক কোম্পানি একেক ধরনের নীতিমালা ব্যবহার করছেন গ্রাহককে শনাক্ত করার জন্য। আমি ক্রেডিট কার্ড অথবা এটিএম কার্ড দিয়ে অনলাইন এবং ‘পস মেশিন’ থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারলে, এটা পারছি না কেন? আমার মনে হচ্ছে, প্রসেস ডেফিনিশনে আজকের অ্যানালগ পদ্ধতিতে থেকে ডিজিটাল প্রসেস ডিফাইন করার জন্য যেই মাইন্ডসেট দরকার, সেটা এ মুহূর্তে অনুপস্থিত।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং একীভূত পরিচয় শনাক্তকরণ পদ্ধতি

পরিচয় ও নিরাপত্তা

Governmental and authorized institutions would still have their role in authenticating the identity information by verifying and validating the digital records to be inscribed on the blockchain. But in the majority of cases, this would only be required the first time. Similar to an official document, a blockchain-based identity proof would serve the same purpose, but with enhanced security.

—Digital Identity: Decentralization and Self-Sovereignty, Fintech Factory

আমরা অনলাইনে কেনাকাটা করতে গেলে যেখানে সবকিছুই সহজ হয়ে গিয়েছে, কারণ অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো আমাদের শনাক্তকরণ পদ্ধতির বাইরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহায়তায় কিছু পদ্ধতি বের করে ফেলেছে তাদের সুবিধার জন্য। সেখানে আমি অনলাইনে সঞ্চয়পত্র কিনতে গেলে এত সমস্যা হবার কথা না। এই মুহূর্তে সঞ্চয়পত্র কিনতে গেলে আমার ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র সিস্টেমের ঢুকে আমার জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর দিয়ে যথাযথ এন্ট্রি দিলে সেখান থেকে সফটওয়্যারের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস দিয়ে

জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বরের সিস্টেমের সঙ্গে যোগাযোগ করে সঙ্গে সঙ্গে ভেরিফাই করতে পারছে।

এর অর্থ হচ্ছে, সিস্টেমগুলো ভেতরে-ভেতরে কানেক্টেড, তবে ব্যাংকগুলো এখানে আলাদা ইনভেস্ট করছে না, যাতে একজন গ্রাহক হিসেবে আমার বাসায় বসে অন্যান্য জিনিসের মতো ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে সঞ্চয়পত্র কিনতে পারি। সহজ কথায়, আমি যেই শনাক্তকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংকে নিজের অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট অনলাইনে দেখতে পাচ্ছি, সেখানে আরেকটু সতর্কতা অবলম্বন করে এই পুরো জিনিসটা অর্থাৎ অনলাইনেই সঞ্চয়পত্র/ জমিজমা কেনা সম্ভব। এতে প্রয়োজনীয় যে নীতিমালাগুলো প্রয়োজন, সেগুলোর সবই বাংলাদেশে বিদ্যমান।

ডিজিটাল সিগনেচার নীতিমালা এবং তার বাধ্যবাধকতা

সমস্যা একটাই। আমাদের একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি তৈরি হয়নি, যার ওপর সবার আইনত সংযোগ তৈরি করতে হবে। এর পাশাপাশি শনাক্তকরণ পদ্ধতির ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা নেই সব প্রতিষ্ঠানের ওপর রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান থেকে। যেকোনো মানুষের সঠিক শনাক্তকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করার একটা বড় ‘মিসিং পিস’ হচ্ছে তার ডিজিটাল সিগনেচার। যে পদ্ধতিতে একজন বাংলাদেশের নাগরিক অনলাইনে প্রমাণ করতে পারবেন তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি সরকার অথবা বেসরকারি সিস্টেম থেকে একটা সার্ভিস পেতে ইচ্ছুক। এই আইন বাংলাদেশ হয়েছে বহু আগে। নীতিমালার সঠিক এনফোর্সমেন্টের অভাব, কারণ সে ব্যাপারে নীতিনির্ধারণীতে বসে থাকা মানুষের বিশ্বাসের সমস্যা রয়েছে। উনি নিজেও বিশ্বাস করেন না সে ব্যাপারটা সম্ভব। ফলে জিনিসটাকে ঠিকমতো ব্যবহার করার জন্য ঠিক বিধিমালা আসছে না।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ডকুমেন্টের ক্ল্যাসিফিকেশন অনুযায়ী তিন/ পাঁচ/সাত বছর পর বিভিন্ন ডকুমেন্ট বিভিন্ন ফরম্যাটে ট্রান্সফার করা যেতে পারে। কাজ শেষে সে ধরনের ডকুমেন্ট সময়ের পর পুড়িয়ে ফেলার কথা। অন্যান্য দেশের নীতিমালা অনুযায়ী কিছু কিছু ক্যাটাগরি একটা সময় পর মাইক্রোফিল্ম অথবা হার্ডকপি অথবা ই-ফাইল হিসেবে ডিজিটাইজ করা যেতে পারে।

আমার দেখা মতে, মোবাইল ফোন কোম্পানির সিম রেজিস্ট্রেশন ফাইলের হার্ডকপি রাখার কথা বলা হয়েছে একটা নির্দিষ্ট অফিস থেকে। এ ধরনের ডকুমেন্টে ক্যাটাগরি অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কীভাবে ডিজিটাল ফাইল ফরম্যাটে চলে যাবে, সেটা নির্দেশনা আরও স্পেসিফিক করা যেতে পারে। তা না হলে প্রতিটি জায়গায় হার্ডকপি, যা রক্ষণাবেক্ষণ স্টোরেজঃ ব্যয়বহুল হওয়ায় সবার সমস্যা বাড়বে। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে এই ডকুমেন্টগুলো ই-ফাইলিংয়ে চলে গেলে দেশের ভেতরে ডিজিটাল রেকর্ডের ব্যবহার বাড়বে, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

পাঁচটা ডেটাসেট^{১২} নিয়ে আলাপ করেছি সামনে। সেটার সঙ্গে যুক্ত হবে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’। সেটাই তৈরি করে দেবে একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি।

কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর, বর্তমান শনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং ফটোকপি

ফিন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট এবং কাগুজে ডকুমেন্ট

ডিজিটাল অ্যাজেন্ডা

eIDAS is a result of the European Commission’s focus on Europe’s Digital Agenda. With the Commission’s oversight, eIDAS was implemented to spur digital growth within the EU.

—(electronic IDentification, Authentication and trust Services) an EU regulation on electronic identification and trust services for electronic transactions

শুরুতে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেবার সময় কাজটা ঠিকমতো উঠবে কি না এবং ভবিষ্যতে সেটা কাজ করবে কি না সেটা নিশ্চিত করার জন্য ‘পারফরম্যান্স বন্ড’ অথবা ‘পারফরম্যান্স গ্যারান্টি’ নিয়ে নেয়। এটা একটা ‘ব্যাংক ইনস্ট্রুমেন্ট’, যার মাধ্যমে কাজ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বুঝতে পারেন যিনি কাজটা পেয়েছেন উনার কাজের সদিচ্ছা এবং কোনো কারণে কাজ

১২. বাংলাদেশে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস (সিআরভিএস); খ. জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাসেট, নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ; গ. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ; ঘ. ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিআরটিএ; ঙ. পাসপোর্ট ডেটাসেট, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

ঠিকমতো সম্পন্ন করতে না পারলে এই ইনস্ট্রুমেন্টটিকে কাজ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতিপূরণ হিসেবে টাকায় পরিবর্তন করতে পারেন।

তবে এখন জালিয়াতি প্রযুক্তি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যেখানে ব্যাংক যে ধরনের কাগজে ‘পারফরম্যান্স গ্যারান্টি’ অথবা ‘বন্ড’ দিচ্ছেন, সেই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে পুরোপুরি নকল করা যায়। ফলে এই মুহূর্তে যেসব প্রতিষ্ঠানে কাজ দিচ্ছে, তারা কাজ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এই বন্ড অথবা গ্যারান্টি ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে নিলেও পরবর্তী সময়ে তারা ব্যাংক থেকে চিঠি দিয়ে আলাদা করে নিশ্চিত করে, যাতে এই ইনস্ট্রুমেন্টটার ‘জাল’ না হয়।

এমনও ঘটনা ঘটেছে, প্রতিষ্ঠান থেকে চিঠি পাঠানোর পরও ব্যাংক থেকে সেই গ্যারান্টি অথবা বন্ডকে চিঠি দিয়ে নিশ্চিত করার পর পুনরায় ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায় যে সেই চিঠিটি ব্যাংক পাঠায়নি অথবা ব্যাংক এ ধরনের নিশ্চিতকরণ চিঠি সেই প্রতিষ্ঠানকে দেয়নি। অর্থাৎ চিঠিটাও জাল। ফলে এ ধরনের ফিন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট সনাতন কাগজে পদ্ধতিতে নিশ্চিতকরণ অথবা ‘ডেরিফাই’ করা সম্ভব নয়।

গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে কাগজে বন্ড

দ্বিতীয় ঘটনা। যারা পরিবার নিয়ে হজে যান, তাদেরকে এককালীন যে টাকা জমা দিতে হয়, সেটা হাতে করে বহন করা নিরাপদ নয় বলে ‘পে-অর্ডার’-এর মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া যায়। একটা পরিবারের যদি তিনজন হজে যান, তার জন্য যত টাকা হাতে করে এক ব্যাংক থেকে তুলে আরেক ব্যাংকে জমা দিতে হবে, তার জন্য ‘পে-অর্ডার’ করা অনেক সহজ ও নিরাপদ বলে সবাই এই ফিন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টটাকে ব্যবহার করতে চান। এই জিনিসটাকে একটা কন্ট্রোলিং নম্বর দিয়ে ‘ডিমান্ড ড্রাফট’ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে সেটার সময় লাগে বেশি।

বর্তমানে পে-অর্ডারের জালিয়াতির ঘটনায় ইদানীং ব্যাংকগুলো পে-অর্ডার জমা দেওয়ার পর সেই পে-অর্ডারটি নগদায়ন/‘এনক্যাশ’ অর্থাৎ টাকায় পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো ধরনের ছাড়পত্র দিতে পারছে না। অথচ, ব্যাংক ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ‘পে-অর্ডার’ অর্থ হচ্ছে সমপরিমাণ টাকা তাকে দিতে বাধ্য থাকবে। একদম টাকার মতো। এর জন্য আগে

ব্যাংকের কনফার্মেশনের প্রয়োজন নেই। একই ঘটনা ঘটেছে টাকায়। সে কারণে মানুষ ঝুঁকছে ডিজিটাল টাকায়।

সরকারি/বেসরকারি ডকুমেন্ট জালিয়াতি

তৃতীয় ঘটনা। বাংলাদেশ বেশ কিছু প্রোডাক্ট আমদানির জন্য কিছু রেগুলেটরি সংস্থার অনাপত্তি অথবা ছাড়পত্রের প্রয়োজন পড়ে। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো এই অনাপত্তি এবং ছাড়পত্রগুলো রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ থেকে নিয়ে জমা দেয় শুল্ক বিভাগে। এমন ঘটনা ঘটেছে যেখানে এ ধরনের অনাপত্তিপত্রের জালিয়াতি হবার কারণে সরকার তার সঠিক শুল্ক এবং অজানা সংখ্যক জিনিসপত্র ঢুকে গেছে দেশের ভেতরে।

অথবা অনাপত্তিপত্রে মালামাল সংখ্যা আসলে যা ছিল তাকে পরিবর্তন করে অন্যান্য মালামাল যোগ করা হয়েছে, যা মূল ‘অনাপত্তি’ পত্রে ছিল না। এ ধরনের জালিয়াতির ঘটনা বেশ ঘটেছে জমিসংক্রান্ত দলিল নিয়ে। এ ধরনের দলিলকে ঠিকমতো শনাক্তকরণ পদ্ধতির অভাবে প্রচুর মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন।

এ ধরনের পরপর কয়েকটা ঘটনায় বোঝা যাচ্ছে, কাগজের ফিন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট অথবা অ্যাগ্রিমেন্ট কপি অথবা সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যে কোনো চিঠি, রেগুলেটরি এজেন্সিগুলোর অনাপত্তি ছাড়পত্র, ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন সার্টিফিকেট, ট্রেড লাইসেন্সের কপি, দলিল—কোনোটাই এই জালিয়াতি থেকে মুক্ত নয়। ফলে বর্তমানে দেশের ভেতরে/বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাক্ট এবং অ্যাগ্রিমেন্টে মানুষের যত স্বাক্ষর রয়েছে, সেটাকে নিশ্চিতকরণ অথবা ভেরিফাই না করা পর্যন্ত কোনো ডকুমেন্টকে সত্য বলে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

স্বাক্ষর কি জালিয়াতি থেকে বাঁচাতে পারছে?

ইলেকট্রনিক সিগনেচার

A contract or signature ‘may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form.’

—First section (101.a), Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, USA

আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মানসিকভাবে একটি চিঠি, কন্ট্রাক্ট অ্যাগ্রিমেন্ট এবং অন্যান্য আইনগত ডকুমেন্টে মানুষের স্বাক্ষরকে শনাক্তকরণের পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেব, ততক্ষণ পর্যন্ত এই জালিয়াতি চলতে থাকবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, আমরা ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যেই ডকুমেন্টটি পাচ্ছি, সেখানে যার স্বাক্ষর রয়েছে, সেই স্বাক্ষর তো আমরা আগে কখনো দেখিনি, যাতে সেটাকে প্রাথমিকভাবে ভেরিফাই করা সম্ভব হবে।

আমি কি আপনার স্বাক্ষর চিনি?

একজন ব্যক্তি অথবা একটা প্রতিষ্ঠান যখন তাদের এ ধরনের ডকুমেন্ট আরেকটা প্রতিষ্ঠানে জমা দেন, তখন দুটো প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো যোগসূত্র নেই, যার মাধ্যমে এ ধরনের স্বাক্ষর, প্রতিষ্ঠানের সিল, ‘এমবোস’কৃত ডকুমেন্ট শনাক্তকরণ সম্ভব হবে। আমরা একটা ডকুমেন্টকে স্ক্যান করে নতুন করে প্রিন্ট করলে সেই অ্যানালগ ডকুমেন্টকে শনাক্তকরণ করার কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করছি না এ মুহূর্তে। ফলে, স্ক্যানকৃত ডকুমেন্টের ‘প্রিন্ট-আউট’ মানে এই নয় যে এইটা আসল ডকুমেন্টের প্রতিচ্ছবি।

ডিজিটাল ডকুমেন্ট, শনাক্তকরণ পদ্ধতি

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সরকারি ও বেসরকারি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের অ্যানালগ মানে কাগজে ডকুমেন্টে কিছু ডিজিটাল সিগনেচারের মতো প্রযুক্তি ‘এমবেড’ মানে সংযোগ করে দিচ্ছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী তার মোবাইল হ্যাণ্ডসেটে ক্যামেরা ব্যবহার করে সেটাকে শনাক্ত করতে পারছেন। ব্যাপারটা এ রকম যে ডকুমেন্ট অথবা অ্যাগ্রিমেন্টটা যিনি ইস্যু করছেন, উনি অ্যানালগ ডকুমেন্টে এমন একটা লিংক জেনারেট করছেন, যা পড়া যাচ্ছে মোবাইল ক্যামেরার মাধ্যমে।

অর্থাৎ গ্রহীতা একটা ডকুমেন্ট শনাক্তকরণ কর্তৃপক্ষের (ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ হতে পারেন) মাধ্যমে ভেরিফাই করে নিচ্ছেন। এর মধ্যে ডকুমেন্টটা যদি পরিবর্তন অর্থাৎ টেম্পারিং হয়, তাহলে সেটা সহজেই জানা যায় এ ধরনের শনাক্তকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে। সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কোনো ডিজিটাল ডকুমেন্ট ইলেকট্রনিকভাবে বণ্টন এবং বিতরণ অর্থাৎ ‘ডিস্ট্রিবিউট’ হলে সেই ডকুমেন্টটাকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ইলেকট্রনিক্যালি

বুঝে নেওয়ার সক্ষমতা এলে এ ধরনের জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হবে।
এটা সম্ভব এখনই।

এর পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাক্ট অ্যাগ্রিমেন্ট এবং দলিল দেখে থাকি, সেটার প্রিন্ট কপি অনেক পৃষ্ঠাসংবলিত হয়। এখানে অ্যাগ্রিমেন্টের সঙ্গে যে অংশটুকু ব্যবহারকারীর কাছে থাকবে, সেখানে এত বড় ডকুমেন্ট প্রয়োজন নেই। এ জন্য উন্নত দেশগুলোতে দলিল হিসেবে সাধারণত এক পাতার একটা ডকুমেন্ট হয়ে থাকে, যেখানে বাকি অংশটুকু থাকে ইলেকট্রনিক অ্যাগ্রিমেন্ট কতৃপক্ষের কাছে।

বাংলাদেশে দলিলকে ইলেকট্রনিক্যালি পরিবর্তন করতে হলে সেটা যতটুকু সহজ, তার থেকে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে এখানে অনেক দলিল লেখক কাজ হারাবেন। এ ব্যাপারে সরকার তাদের নতুন কাজের আওতায় অর্থাৎ ‘রি-স্কিলিং’ প্রোগ্রামে নতুন অথবা একই ধরনের কাজে তাদের পরিবর্তন করে আনতে পারে। আমাদের প্রচুর কম্পিউটার অপারেটর প্রয়োজন।

দরকার সরকারি নীতিমালা— সঙ্গে ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা

আইনি সংজ্ঞা

In the United States, the legal definition outlined in the Electronic Signatures in Global and National Commerce (ESIGN) Act is ‘an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record.’

—Electronic Signature vs Digital Signature: What You Should Know, Ontask

আমার বর্তমান কাজের সাথে ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটা সফটওয়্যার কোম্পানি থাকায় এই কাগজে অ্যাগ্রিমেন্ট/কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টের শনাক্তকরণ পদ্ধতি নিয়ে প্রায় আলাপ হয়। সেখানে ‘ডকুসাইন’ বলে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি কীভাবে নির্ভুলভাবে ইলেকট্রনিক কন্ট্রাক্ট এবং অ্যাগ্রিমেন্ট সহজে শনাক্ত করেছে, সেটা নিয়ে চেষ্টা করেছি কয়েকবার। এই ‘ডকুসাইনের’ অপারেশন চলছে পৃথিবীর ১৮০টার মতো দেশে।

তবে আমার রিসার্চ বলে, এ ধরনের সার্ভিস বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টসগুলোকে সঠিকভাবে শনাক্ত করার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০১ সালে জারি করা ‘ইলেকট্রনিকস সিগনেচার গ্লোবাল অ্যান্ড ন্যাশনাল কমার্স অ্যাক্ট’ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ‘ইলেকট্রনিক আইডেনটিফিকেশন অথেনটিকেশন অ্যান্ড ট্রাস্ট সার্ভিসেস’ নীতিমালা অসাধারণভাবে প্রভাবিত করেছে।

মানুষ কখনোই তার প্রথাগত ধ্যানধারণা থেকে সরবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার এবং সংগঠনগুলোর সঙ্গে কথা বলে একটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, যা সরকার এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সুফল বয়ে নিয়ে আসে। অনেকটা চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের মতো, নতুন জিনিস শুরুতে মানতে চাইবে না সবাই। আর সে কারণে এ ধরনের ইলেকট্রনিক সিগনেচার এবং ব্যবসায়িক নীতিমালার মধ্যে যুক্তিযুক্ত ‘সংযোগ’ নিয়ে আসতে হবে। এই একই কারণে ইলেকট্রনিক ভিসা পদ্ধতি, সরকারগুলোর কাগুজে ভিসার কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শনাক্তকরণ পদ্ধতি/আইডেনটিফিকেশন

নতুন ও পুরোনো আইডিয়া

I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones.

—John Cage

কোভিড-১৯: শাপে বর

আমার স্ত্রী কাজ করেন প্রাইভেট সেক্টরে। প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করার সুবাদে কোভিড-১৯ সময়কালীন কাজে অফিস ডিপিএন ব্যবহার করে পৃথিবীব্যাপী সব ধরনের কমিউনিকেশনে খুব একটা সমস্যা হচ্ছিল না তাদের। সমস্যা একটাই, যখন তাদের রেগুলেটরি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়, সেটা এখনো করতে হয় চিঠির মাধ্যমে, হার্ডকপি দিয়ে। পাশাপাশি, সেই সাইন দিয়ে, যেটা জাল করা খুব একটা সমস্যা নয়। ফলে, হার্ডকপি সাইন করতে অফিসে যাওয়া এবং অফিস থেকে সরকারি অফিসের ডাক রুমে পৌঁছানো একটা দরকারি কাজ।

আমরা যেখানে ইলেকট্রনিক্যালি নিজেদের ‘আইডেনটিটি’ প্রমাণ করে ডকুমেন্ট এবং টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি দেশ থেকে দেশান্তরে, সেখানে এই সামান্য সরকারি অনলাইন আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা ‘এনফোর্সড’ না থাকার ফলে আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি এই দশকে। উইন্ডোজের সাধারণ ‘অ্যাকটিভ ডিরেক্টরি’ সার্ভিস এ ধরনের সলিউশন দিয়ে আসছে গত ২০ বছর ধরে। নীতিনির্ধারণী (আমি নিজেও একজন) মানুষজনকে ব্যাপারটা বললে একটা ব্যাপার উনারা বলে থাকেন প্রায়ই, অনলাইনে ‘আমি যে আমি’ অথবা ‘আপনি যে আপনি’ সেটার প্রমাণ দেবে কে?

প্রশ্ন ‘ভ্যালিড’, তবে অনলাইনে ‘আমি যে আমি’ সেটাকে প্রমাণ করার জন্য বেসিক লেভেলে যে মেকানিজমগুলো আছে, সেগুলো দিয়েই বিলিয়ন ডলার ব্যবসা করছে প্রাইভেট সেক্টর, সেখানে সরকারি এজেন্সিগুলোর সমস্যা কোথায়? কিছুদিন পর যখন ফেসবুক সবার প্রোফাইল অথবা পেজ ঠিকমতো অথেনটিকেট করে ‘ব্লু রিবন’ মানে ‘ভেরিফাইড’ করে দেবে, তখনো কী আমরা প্রশ্ন করতে থাকব? নাকি নিজেদের একটা অনলাইন আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের জন্য এক পাতার একটা নীতিমালা তৈরি করব? আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, শুল্ক দরকার একটা ‘কানেক্টেড’ নীতিমালা এবং তার যথার্থ প্রয়োগ।

একীভূত ‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’, ব্লকচেইন এবং এআই
সবাইকে একটা ভিত্তি দেওয়া

Unique identification is a crucial element in the design of economic and social policies. This value is due to its multiple implications in human development, particularly in the areas of poverty reduction, education, health, and governance.

—Thales Group

এটা ঠিক যে আমাদের জীবনে প্রচুর উদ্ভাবনাত্মিক সার্ভিস চলে আসছে, তবে এর সঙ্গে নতুন এই উদ্ভাবনগুলো কিছু সময়ের জন্য আমাদের জীবনকে জটিল করে দিচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন অসামঞ্জস্যকে কমানোর জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার এদিকে নতুন নতুন উদ্ভাবনা নিয়ে আসছে, যাতে জনগণকে ঠিকমতো সার্ভিস দেওয়া যায়। বিশেষ করে জনগণের দোরগোড়ায় সার্ভিস পৌঁছাতে গেলে সবচেয়ে প্রথম যে জিনিসটি

প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে জনগণের একটি সঠিক পরিচয় নিবন্ধন সার্ভিস অর্থাৎ ‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’।

জনগণ সঠিকভাবে সরকারি অথবা বেসরকারি সার্ভিসগুলো ঠিকমতো পাচ্ছে কি না এর পাশাপাশি তার নিরাপত্তা, তার নিজস্ব তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা সরকারের একটা বড় দায়িত্ব। এই সবকিছুই করা হচ্ছে যাতে সরকারি ও বেসরকারি সার্ভিস প্রসেসগুলোকে একীভূত করে যতটা সহজ করা যায়। জনগণকে ঠিকমতো শনাক্ত করা না গেলে তারা ঠিকমতো সার্ভিস পাচ্ছে কি না সেটা বের করা দুষ্কর।

যেকোনো দেশের জন্য একটি ‘একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি অর্থাৎ ‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন’ নিয়ে কাজ করতে গেলে এই মুহূর্তে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ছাড়া সামনে কিছু টিকবে বলে মনে হয় না। যেহেতু, ব্লকচেইন প্রযুক্তি ‘ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার’ পদ্ধতি আকারে চলে, সে কারণে বাংলাদেশ পাঁচটা ডেটাসেট থেকে তথ্য এক জায়গায় নিয়ে এসে একীভূত প্রক্রিয়ায় ফ্রন্ট-এন্ডে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং পেছনে ব্লকচেইন ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই মুহূর্তে এ ধরনের একটা বিকেন্দ্রীকরণ ‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন’ চলছে সুইজারল্যান্ডের জুগ শহরে। এর কাজ শুরু হয় ইনস্টিটিউট অব ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের জায়গায়, যা লুসার্ন ইউনিভার্সিটিতে অবস্থিত। এর সঙ্গে আরও কয়েকটা সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর কোম্পানি যুক্ত হয়েছে শুরুতে একটা ভোটিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য। ২০১৭ সালে তারা একটি পাইলট প্রোগ্রাম চালু করেছে নাগরিকদের ডিজিটাল আইডেনটিটি রেজিস্টার করার জন্য।

এই ইথেরিয়াম ব্লকচেইন দিয়ে। কাজ করে দেখা যাচ্ছে যে সেই শনাক্তকরণ পদ্ধতি অর্থাৎ আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রাখা যায় ব্যবহারকারীর মোবাইল ফোনে। এখন এই পদ্ধতিতে ভোটিং ছাড়াও আরও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সার্ভিস নেবার কথা হচ্ছে। একটা প্ল্যাটফর্ম, তবে এর ব্যবহার হবে অনেক কাজে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ঠিকমতো কাজ করতে হলে শুরুতে দরকার ডেটা। সরকার যাকে সার্ভিস দিতে চাইছে তার শনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং উনি কী

ধরনের সার্ভিস এ পর্যন্ত নিয়েছেন অথবা কী কী সার্ভিস সামনে চাইতে পারেন, সেটার একটা প্রেডিকশন ব্যাপারটাকে আরও সহজ করে তুলবে। আজকে ‘অ্যাডটেক’ অর্থাৎ ‘অ্যাডভার্টাইজমেন্ট টেকনোলজি’ যেভাবে প্রতিটা মানুষকে ঠিকমতো শনাক্ত করেই যার যা প্রয়োজন সেটা জেনে তার জন্য প্রযোজ্য প্রোডাক্ট অফার করে।

সে হিসেবে আপনি জমি ক্রয় করার পর তার জন্য পরবর্তী নামজারি করার জন্য কী কী প্রয়োজন সেটার জন্য সরকার (হতে পারে আমাদের ভূমি অধিদপ্তর) আগে থেকেই যোগাযোগ করতে পারে। এই মহামারির সময় সরকার দুস্থদের পাশে দাঁড়াতে চাচ্ছে, তাদেরকে (প্রকৃত দুস্থ) ঠিকমতো শনাক্ত এবং কারা এই স্কিমের জন্য প্রযোজ্য হবেন, সেটা বের করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

আমাদের একটা সুন্দর স্বাস্থ্যসেবা সিস্টেম দাঁড়িয়ে গেলে কার কখন কী ধরনের স্বাস্থ্যসেবা দরকার, সেটাও আগে থেকে প্রেডিক্ট করে জানাতে পারবে আমাদের এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আমাদের বাচ্চাদের পরীক্ষার পর কোথায় ভর্তি হতে পারে, সেটা আগে থেকেই ধারণা দিতে পারবে এই সিস্টেম। ভালো ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে এই ট্র্যাকিং নিয়ে কথা বলছি সামনের বইয়ে।

সেটার জন্য শুরুতে প্রয়োজন একটি সঠিক পরিচয় নিবন্ধন সার্ভিস।

কেন এ ধরনের ‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ দরকার?

ইনক্লুশন

Having an identity in society is a proxy for inclusion.

—Joseph Atick, Executive Chairman of ID4Africa

আমাদের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যা ভারসাম্যের সমস্যা অন্যান্য অনেক দেশ থেকে বেশি বলে সেখানে প্রতিটা সরকারি সার্ভিসের লেভেল ঠিকমতো মনিটর এবং জনগণের নিরাপত্তা দেবার জন্য এ ধরনের একটি আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সরকারের সুদূরপ্রসারী কাজের আউটকাম হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এটা অটোমেশনের প্রথম ধাপ। আমাদের মতো এই বিশাল জনগণের দেশে এ ধরনের একটি সিস্টেম সবকিছুকে সহজ হিসেবে নিয়ে আসতে পারে।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের মতো ‘স্মার্ট সিটি’ কনসেপ্ট বাংলাদেশে চলে আসছে। ফলে এখানে এমন একটা প্রযুক্তিগত ইন্টিগ্রেশন দরকার প্রতিটা সার্ভিসের সঙ্গে সঙ্গে যাতে ‘বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ যোগাযোগ করতে পারে ‘ফায়ার সার্ভিস’ অথবা পানি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে। সেখানেও ‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট’ একটা বড় অংশ হিসেবে কাজ করবে সামনে।

সঠিক পরিচয়পত্র ও আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম না থাকলে জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সরকার থেকে বিভিন্ন পরিষেবা পায় না ঠিকমতো। সরকারি বিভিন্ন সার্ভিস এবং তাদের সম্পর্কিত প্রোগ্রামগুলোতে এই আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকার ফলে জনগণ তার সঠিক প্রাপ্যতা বুঝে নিতে পারে।

একটি একক এবং ‘ইউনিফাইড সিস্টেম’

পাবলিক ও প্রাইভেট ক্রেডেনশিয়াল

The scope of IdM strategies always encompasses public sector online services. Some countries favour a universal approach, i.e. encompassing public/private sector use of credentials to support the broader Internet economy. Others plan to extend the use of public sector digital credentials to the private sector – or digital credentials’ framework. Most countries recognise the leadership role of the government for the generalisation of better digital identity management in the Internet economy. Government single sign-on services are only available or anticipated for public sector services, except in two countries where it also includes (or will include) private sector services.

–National Strategies and Policies for Digital Identity Management in OECD Countries, OECD 177

শুরুতে এই ধরনের পরিচয়পত্রগুলো একটা ছবি এবং নামসংবলিত থাকলেও পরে এই জিনিসটির পেছনে একটা বড় সিস্টেম দাঁড়িয়ে যেতে পারে, যেখানে প্রতিটা জনগণের বায়োমেট্রিক ও আচরণগত ডেটা (স্বাস্থ্যসেবা, সম্পত্তি ইত্যাদি) সংরক্ষণ করা হতে পারে। এই একই পরিচয়পত্র ধীরে ধীরে সরকারের অন্যান্য যেকোনো সার্ভিসের ক্ষেত্রে একটি একক এবং ‘ইউনিফাইড সিস্টেম’ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

শুরুতে এটা একটা ‘নিরীহ’ ভোটার আইডি কার্ড হিসেবে বিবেচ্য হলেও পরবর্তী সময়ে এই একই পরিচয়পত্র হেলথ কার্ড, বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক সার্ভিস নেবার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খোলার কেওয়াইসি (নো ইউর কাস্টমার), জন্মনিবন্ধন মানে বার্থ রেজিস্ট্রেশন, সিআরভিএস, অর্থাৎ সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস নিবন্ধন, ট্যাক্স ও বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এ ধরনের অনেক সার্ভিসে একক নিবন্ধন সার্ভিস ইন্টিগ্রেশন করা শুধু সময়ের ব্যাপার।

এর পাশাপাশি একটি দেশের ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ, পপুলেশন রেজিস্ট্রি, জন্মনিবন্ধন একীভূত করার ক্ষেত্রে এই ধরনের একটি আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অসাধারণভাবে কাজ করে। আমাদের মতো দেশে যেখানে প্রতিটা অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ব্যাংকের অ্যাক্সেস কম হওয়ায় সেখানে এ ধরনের একটা ইউনিভার্সেল পরিচয় নিবন্ধন সিস্টেম শুরুতে অনলাইন ব্যাংকিং এর ফ্রন্ট-এন্ড হিসেবে কাজ করতে পারে। সেখানে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমকে এর সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড করে বেশ ভালো সুফল দেখা গেছে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে।

দুর্নীতি, বিভিন্ন সার্ভিসের ডেলিভারি খরচ কমিয়ে আনা

সবচেয়ে সুবিধাজনক ব্যাপার হচ্ছে এই ধরনের পরিচয় নিবন্ধন পদ্ধতি দুর্নীতি কমিয়ে বিভিন্ন সার্ভিসের ডেলিভারি খরচ কমিয়ে আনে বলে ভবিষ্যতে এ ধরনের সার্ভিসগুলোকে আরও উন্নত করা যায়। এর পাশাপাশি সবাইকে একসঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য যেই অন্তর্ভুক্তি জনগণ এবং সরকারের মধ্যে বিশ্বাস এবং বিভিন্ন সার্ভিসের অ্যাকসেসিবিলিটি পরিমাপ করা যায়। প্রতিটা জনগণের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গেলে এ ধরনের একীভূত পরিচয় নিবন্ধন পদ্ধতির বিকল্প নেই। এক দেশের জন্য একটা ইউনিভার্সাল নিবন্ধন পদ্ধতি সব ধরনের সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে একীভূতভাবে কাজ করতে পারে।

এই ধরনের ডেটা নিয়ে সরকার নির্দিষ্ট জায়গায় আরবান প্ল্যানিং, বিভিন্ন ধরনের নিম্নবিত্ত অথবা মধ্যবিত্তদের আবাসন পরিকল্পনা, কোথায় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং কমিউনিটি ক্লিনিক হতে পারে সেটার ধারণা পাওয়া যায় এই নিবন্ধন পদ্ধতির ব্যাকএন্ড থেকে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার

হচ্ছে, এ ধরনের অনেক সরকারি এবং বেসরকারি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেভেলের প্ল্যানিং কাজ সম্ভব হয় এই ধরনের একীভূত ডেটা থেকে।

নীতিনির্ধারণীতে থাকা মানুষজনের জন্য ড্যাশবোর্ড

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এই ধরনের ডেটা থেকে সমাজের বিভিন্ন স্বাস্থ্য এবং আর্থসামাজিক ইন্ডিকেটর পাওয়া যায়, যা সাহায্য করে কীভাবে একটা দেশ তার ইউনিভার্সাল সার্ভিস ইন্টিগ্রেশন, শিক্ষাব্যবস্থা, প্রতিটা মানুষের জন্য ‘ইউনিভার্সাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার’ অর্থাৎ সবার জন্য সমাজকল্যাণ অথবা ভাতা, সবার জন্য ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং কী ধরনের স্বাস্থ্য কাভারেজ (সবার জন্য) আমাদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, সেটার ভালো ধারণা পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি নীতিনির্ধারণীতে থাকা মানুষজন তাদের ড্যাশবোর্ডে সরকারি ও বেসরকারি অত্যাাবশ্যকীয় সার্ভিসগুলোকে কীভাবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায়, বিশেষ করে যারা সমাজের আর্থসামাজিক স্কেলে সবচেয়ে নিচে আছেন।

এর সুবিধা অনেক।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্যাংকের অথবা বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলতে, ট্যাক্স জমা দিতে, পাসপোর্ট করতে, সিম তুলতে, জমি রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি করতে একটা ইউনিক নিবন্ধন পদ্ধতি যেমন জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করার পেছনে কারণ একটাই। সরকারি বা বেসরকারি সার্ভিসগুলোকে কম সময়ে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার জন্য একটা একীভূত পদ্ধতি, যাতে প্রতিটা মানুষ ঠিকমতো সার্ভিসটা পেতে পারেন।

‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ এবং ডিজিটাল সিগনেচার

এই দুটো সিস্টেমের মধ্যে এই সংযোগটা না হলে এই একীভূত ব্যাপারটা ঠিকমতো কাজ করবে না। আমাদের অনেকগুলো নীতিমালা রয়েছে, প্রয়োগ নেই।

প্রস্তাবনা: এআই’র সঙ্গে একীভূত ‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’

আমার দেখামতে ৫টা ডেটাসেটই পারে আমাদের দেশের জন্য একটা একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি শুরু করতে। সেটার জন্য দরকার ডেটা কো-রিলেশন, আর সেটা করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

৫টা ডেটাসেট

১. বাংলাদেশে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (সিআরভিএস)
২. জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাসেট, নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ
৩. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪. ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিআরটিএ
৫. পাসপোর্ট ডেটাসেট, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

একটি ‘একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি ইউনিক শনাক্তকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটা সরকারি ও বেসরকারি ব্যবসায়িক অথবা অন্যান্য কাগজের এবং ইলেকট্রনিক ‘ট্রানজাকশন’ করা সম্ভব। এই ইউনিক শনাক্তকরণ পদ্ধতির দিকে হাঁটতে হবে প্রশাসনকে। এই এক ইউনিক পদ্ধতির জন্য এই পাঁচটি ডেটাসেটের মধ্যে কো-রিলেশন তৈরি করে একক পদ্ধতি তৈরি করে দিতে পারবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। তবে, মেশিন লার্নিং যেভাবে কাজ করবে, সেটার প্রায়োরিটি আমি বলে দিতে পারি।

শুরুতে, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সেখানে যদি কারও ডেটা না পাওয়া যায় তাহলে সেটা যাবে জন্মনিবন্ধন রেজিস্ট্রারে। এই ডেটাগুলো আস্তে আস্তে যুক্ত হয়ে যাবে ‘সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ডেটাসেটে’। এখানে ব্যানবেইসের ডেটা যোগ হচ্ছে ‘ইউনিক আইডি’তে, যা পরে পাল্টে যাবে জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাতে। এই কো-রিলেশনের মধ্যে পাসপোর্ট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ডেটা যুক্ত হবে যখন প্রথম তিনটে ডেটাসেটে তাদের তথ্য মিল না পাওয়া যায়। এই পুরো কাজে ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার অর্থাৎ ‘ব্লকচেইন’ প্রযুক্তি ব্যবহার হবে।

সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (সিআরভিএস)

আমার দেখা মতে, পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক এবং ভ্রূণের মৃত্যুর মতো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলোর পরিসংখ্যান ঠিকমতো রেকর্ড করার জন্য একটা সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। স্পেসিফিকভাবে, এটা একটা সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি ইভেন্টের একটি স্থায়ী রেকর্ড তৈরি করে রেখে দেয়। এখন

আমরা ঠিকমতো বললে একটা ভালোকার্যকর সিআরভিএস সিস্টেমের কী করতে পারে:

- ক. একটা দেশের প্রতিটা মানুষের জন্য তাদের আইনি পরিচয় স্বীকৃতিসহ সবাইকে ঠিকমতো সুরক্ষিত করে। এই একই পরিচয় নিবন্ধন পদ্ধতি জনসেবা, সামাজিক সুরক্ষা এবং মানবাধিকারের অ্যাঙ্ক্বেসের অধিকার নিশ্চিত করে;
- খ. পুরো দেশের জন্য জনসংখ্যার ডিনামিকস, এবং স্বাস্থ্য সূচকগুলোর পরিসংখ্যান তৈরি করে প্রশাসনিক এলাকাগুলোর ভিত্তিতে এই ব্যাপারটা একটা সব সময়ের জন্য একটা প্রসেস;
- গ. দেশের নীতিনির্ধারকদের সহজে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একটা ড্যাশবোর্ড এবং প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সম্পর্কিত তথ্য জেনারেট করে দেবে এই সিআরভিএস। এই ড্যাশবোর্ড থেকে ডেটা নিয়ে নীতিনির্ধারণী পলিসি, সেগুলোর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন আমাদের নীতিনির্ধারণীতে বসে থাকা মানুষজন।
- ঘ. একটা দেশের মৃত্যুর বিস্তৃতি, তার ডিস্ট্রিবিউশন মানে জনবসতির ওপর সেটার বণ্টন এবং কেন ব্যাপারগুলো ঘটছে, সেটা বোঝার একটা পার্সপেকটিভ পাওয়া যায় এই 'সিআরভিএস' থেকে। এর পাশাপাশি পুরো দেশের স্বাস্থ্যগত অসমতা মানে ইনইকুয়ালিটি বোঝা যায় এলাকা ধরে। সেটা দেখে নীতিনির্ধারকগণ তাদের কাজের প্রায়োরিটি বের করতে পারবেন।

আচ্ছা, জাতিসংঘ এই সিভিল রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে কী বলেছে সেটা একটু দেখি এখানে:

জাতিসংঘ কী বলেছে

...the continuous, permanent, compulsory, and universal recording of the occurrence and characteristics of vital events (live births, deaths, fetal deaths, marriages, and divorces) and other civil status events pertaining to the population as provided by decree, law or regulation, in accordance with the legal requirements in each country.^{১৩}

১৩. United Nations (UN). Principles and recommendations for a vital statistics system, Rev2ision 2. UN, 2001.

যে জিনিসটা বোঝা গেছে, কোনো দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানের মান উন্নত এবং এর পাশাপাশি দেশের জন্য নীতি ও কর্মসূচি পরিচালনা করতে এই সিআরভিএস সিস্টেমের বিকাশ ও শক্তিশালী করা গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে ‘বাংলাদেশ সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস (সিআরভিএস)’ বাংলাদেশে একই ধরনের একটা একক আইডি-ব্যবস্থাপনা তৈরি করে সব নাগরিকের জীবন-প্রবাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ তথ্য-উপাত্ত আকারে সংরক্ষণ এবং এর ভিত্তিতে সরকারের সব সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগের সূত্রপাত ২০১০ সালে।

বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ডকুমেন্ট হিসেবে বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্থাৎ ‘get everyone in the picture’ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককেই চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে তার জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তার সম্পর্কিত সব তথ্য যেমন: জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিবন্ধিত করা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পরিসংখ্যান তৈরি করার নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াই হলো ‘সিআরভিএস’।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা (প্রধানত স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়) আলাদাভাবে এই জিনিসগুলো করে আসছিল। যেহেতু এখানে সমন্বয়ের একটা সমস্যা থাকতে এ ধরনের সব কাজে দ্বৈততা, অসামঞ্জস্যতা এবং কখনো কখনো বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছিল। এ জন্য ২০১৪ সালে বাংলাদেশে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি তৈরি করা হয়। ২০১৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এই বিষয়ে সিআরভিএস সচিবালয় তৈরি হয়।

জাতিসংঘের ধারণায় এ ব্যাপারটাতে কী কী তথ্য যোগ করা হবে, সেটা অনেকটাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দেশগুলোর ওপর। আর সে কারণে বেসিক তথ্য জন্ম, মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ, বিয়ে, তালাক, ও দত্তক এই ছয়টি তথ্যকে বেসিক সিআরভিএসের পাশাপাশি বাংলাদেশে সিআরভিএস জন্য বেসিক ছয়টি তথ্যের সঙ্গে আরও কিছু ডেটা যোগ করা হয়।

জনগণের স্থানান্তর মানে ইন-মাইগ্রেশন, আউট-মাইগ্রেশন এবং শিক্ষাকে যোগ করে করে ‘সিআরভিএস’কে বাংলাদেশের জনগণের সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া মানে সার্ভিস ডেলিভারি নিশ্চিত করে সামাজিক নিরাপত্তা

বেষ্টনী কর্মসূচিগুলোর সঙ্গে যোগ করার প্রক্রিয়া চলছে। এতে একটা সমন্বিত সেবাপ্রদান ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ধারণা দেখেছি তাদের ডকুমেন্টগুলোতে।

এর পাশাপাশি, বাংলাদেশে আরও বিভিন্ন আইডিব্যবস্থা যেমন, জন্মনিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সমন্বিত করে একটা একীভূত আইডি দেবার কথা হচ্ছে। এই একীভূত আইডির সঙ্গে শিক্ষার্থী ভর্তিসহ শিক্ষাব্যবস্থায় স্টুডেন্ট আইডি নিয়ে কাজ হচ্ছে, যা শিক্ষার সব পর্যায়ে ব্যবহার করা যাবে। পরবর্তী সময়ে এই একীভূত আইডি জনগণ মানে সবাই অন্যান্য সেবাগ্রহণে ব্যবহার করবে। এখন আমরা দেখি কীভাবে শিক্ষার্থী ডেটাবেইস একটা একীভূত সিস্টেমে যাচ্ছে?

সিআরভিএস এবং শিক্ষার্থী একীভূত আইডি

বাংলাদ্বিবিউনের রিপোর্টটা^{১৪} পড়ছিলাম। চমৎকার রিপোর্টটি করেছেন এস এম আব্বাস।

শিক্ষার্থীরা পেতে যাচ্ছে ইউনিক আইডি

দেশের তিন কোটির বেশি শিক্ষার্থীর জন্য ইউনিক আইডি (একক পরিচয়) তৈরি করছে সরকার। পাঁচ বছর বয়সী প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থী থেকে ১৭ বছর বয়সের দ্বাদশ শ্রেণির সব ছাত্রছাত্রী পাবে এই ইউনিক আইডি। এই আইডিতে ১০ বা ১৬ ডিজিটের শিক্ষার্থী শনাক্ত নম্বর থাকবে, যা পরবর্তী সময়ে হবে ওই শিক্ষার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর। জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরিতে আলাদা করে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না। ২০২০ সাল থেকে শিক্ষার্থী শনাক্ত করার ইউনিক আইডি দেওয়া শুরু হবে।

সিআরভিএস এবং শিক্ষার্থী শনাক্তকরণ পদ্ধতি

এই রিপোর্টটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি বিশেষ করে শিক্ষার দিক থেকে আমাদের দেশের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতির দিকে হাঁটছে। একটা দেশে বেশ কয়েকটি শনাক্তকরণ পদ্ধতি থাকলেও সেগুলোর একীভূত না করা হলে ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি

১৪. শিক্ষার্থীরা পেতে যাচ্ছে 'ইউনিক' আইডি, এস এম আব্বাস, প্রকাশিত জুলাই ১২, ২০১৯, বাংলা দ্বিবিউন— <https://www.banglatribune.com/national/news/505697/>

হতে পারে। একই মানুষ তবে তার ভিন্ন ভিন্ন ডেটা ভিন্ন ভিন্ন সিস্টেমে থাকলে সেটা থেকে সব এক জায়গায় আসতে সময় নেবে। এতে দেশের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম ড্যাশবোর্ডে সঠিক তথ্য যাবে না। সব ডেটা থেকে কো-রিলেশন হলেই ডেটার মধ্যে ক্রসম্যাচ হবে আর সেটা থেকে আউটপুট পাওয়া সফল হবে।

এর পাশাপাশি বুঝতেই পারছেন এই জিনিসটার সংযোগ আসছে সেই ‘সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস’ (সিআরভিএস) থেকে। এর মানে হচ্ছে, এই সিআরভিএসের একটা এক্সটেনডেড অংশ হচ্ছে শিক্ষার্থী শনাক্তকরণ পদ্ধতি। সেখানে বলা হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের এই নতুন আইডিতে এখনকার জাতীয় পরিচয়পত্রের চেয়ে বেশি তথ্যের সংযোজন থাকবে। সেটা কীভাবে হবে?

এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS)

আসলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতি প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা আলাদা প্রোফাইল তৈরি করলে সেটা জাতীয় পরিচয়পত্রের থেকে বেশি হবেই। এর পাশাপাশি শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর ‘এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS)’ প্রকল্প দুটো ভালো কাজে দেবে। এই ডেটাসেটের মধ্যে সিটিজেন কোর ডেটা স্ট্রাকচার স্টাইলে নেবার ফলে সেই শিক্ষার্থী ১৮ বছর হলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় পরিচয়পত্রে পরিবর্তন হয়ে যাবে। ফলে এই ডেটাসেটের সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন জেনারেলের কার্যালয় এবং নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনিআইডি) ডেটাসেট সংযুক্ত থাকবে।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রোফাইল তৈরি

দেশের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বিশেষ করে স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় আলাদাভাবে আগে থেকেই ‘সিআরভিএস’-এর কাজ শুরু করেছে, সেখানে এর সঙ্গে যুক্ত করে সংখ্যার হিসেবে প্রাথমিক

শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রোফাইল তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে।

হিসেবে দেখেছি, শুরুতে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১ কোটি ৮৭ লাখ শিক্ষার্থীর সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়েছে। এই তথ্য সংগ্রহের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা করে ইউনিক প্রোফাইল ইন সিস্টেম তৈরি করা। রিপোর্ট থেকে যেটা বোঝা গেছে, ২০১৮ সালে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে, তা শেষ হবে ২০২১ সালে।

একীভূত করার প্রসেস

তথ্য দিতে হবে অনলাইনে

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) শিক্ষা জরিপে ইআইআইএনধারী সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। ব্যানবেইসের ওয়েবসাইটে লগইন করে এসব তথ্য দিতে হবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে, ১৯ নভেম্বর ২০২০, জাগোনিউজ২৪.কম

এখানে জন্মনিবন্ধন ডেটাসেটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে শিক্ষার্থীর জন্মনিবন্ধন এবং তার বাবা-মায়ের জাতীয় পরিচয়পত্রের মধ্যে একটা রিলেশন তৈরি করে ব্যাপারটাকে ঠিক করে নেওয়া কোনো সমস্যাই নয়। এখানে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস’ (সিআরভিএস), জাতীয় পরিচয়পত্র এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ইউনিক আইডি ডেটাবেইস একসঙ্গে কাজ করছে, যাতে একটা একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি বের করে নিয়ে আসা যায়। এতে জন্ম থেকে শিক্ষার্থীর জীবন এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় পরিচয়পত্রে মাইগ্রেট করে নেওয়াটা পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হতে থাকবে।

শিক্ষার্থীর সারা জীবনের রেকর্ড ট্র্যাকিং

এর সঙ্গে সরকারি তৈরি ফর্মগুলো দেখে বোঝা গেছে এই ডেটাবেইসে শিক্ষার্থীর ফল, কোন বিষয়ে ভালো এবং তার ব্যক্তিগতজীবনের বেশ কিছু তথ্যই থাকবে। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হচ্ছে, এখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনের ট্র্যাক রেকর্ড সম্বন্ধে ভালো ধারণা আসবে। চাকরিসহ বিভিন্ন

ক্ষেত্রে এই ডেটাবেইস কাজে লাগবে। শনাক্ত নম্বরটি দিলেই সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর তার তথ্য জানতে পারবে। এর অর্থ হচ্ছে যেকোনো শিক্ষার্থীকে বিশেষ করে যারা ভালো ফল করছে শুরু থেকে, তাদের बारे পড়া রোধ হবে। সরকার জানবে তাদের কি সমস্যা হচ্ছে এবং সেই সমস্যাগুলোকে সমাধান করে তাদেরকে স্কুল বা কলেজ সিস্টেমে ইন্টিগ্রেটেড রাখবে।

এই রিপোর্টেই ২০১৯ সালে জুলাই মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেছিলেন, ‘প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সী প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একটা ডেটাবেইসের আওতায় নেওয়া হবে। জন্মনিবন্ধন অনুযায়ী শিশুর বয়স যখন পাঁচ বছর হবে তখন থেকেই একটি সিস্টেমে নেওয়া হচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে এর আওতায় আনা হবে। শিক্ষার্থীরা একটি আইডেনটিফিকেশন নম্বর পাবে। এই নম্বরটিই পরবর্তী সময় জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরে রূপান্তরিত হবে। প্রাথমিকের যারা আইডেনটিফিকেশন নম্বর পাওয়ার পর মাধ্যমিকে ভর্তি হবে এবং মাধ্যমিকের পর কলেজে ভর্তি হবে তখন পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক ও কলেজের কাছে এই তথ্য চলে যাবে। শিক্ষার্থীর বয়স ১৮ বছর হলে এনআইডির অনুবিভাগের আওতায় চলে যাবে তার তথ্য। এই সিস্টেমে কোনো তথ্য ডুপ্লিকেশনের সুযোগ নেই। সিআরভিএস বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এটি করা হচ্ছে। দেশের সব নাগরিকের জন্য একক পরিচয় নিশ্চিত হবে এই সিস্টেমে।’

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি গ্রুপের আইডি

এরপরের স্লটের কথা বললে স্কুলের সিনিয়র গ্রুপ, যেটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি, যার রেঞ্জ হচ্ছে ১১ বছর থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত। এই ডেটাটা এসেছে ব্যানবেইস সূত্র থেকে। হিসেবমতে, এই ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে দেড় কোটি। অর্থাৎ এই দেড় কোটি শিক্ষার্থীর জন্য তৈরি হবে সেই একই ইউনিক আইডি। এটা অবশ্যই আগের ডেটার সঙ্গে সম্পূরক হবে।

এই সিস্টেমে দেশে কত শিক্ষার্থী बारे পড়ছে তা জানা যাবে সহজে। এ মুহূর্তে কোনো শিক্ষার্থী অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে তার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায় না। ফলে নীতিনির্ধারকদের হিসেবে ধরে নেওয়া

হয় তারা তাদের শিক্ষা সিস্টেম থেকে হারিয়ে গিয়েছে। এই ইউনিক আইডিটা এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে একই আইডি চলে যেতে পারে জাতীয় পরিচয়পত্রে। এই আইডিসংবলিত যখন একজন শিক্ষার্থীর বয়স ১৮ বছর হয়ে যাবে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই আইডিটি জাতীয় পরিচয়পত্র পাঁটে যাবে।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর হিসেব

এদিকে ব্যানবেইস সূত্রে জানা গেছে, ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত (১১ থেকে ১৭ বছর) প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে ইউনিক আইডি। ২০২০ সাল থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই পুরো জিনিসটি ঘটবে ‘এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ প্রকল্প থেকে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘এটি একটি সিটিজেন ডেটা স্ট্রাকচার। এই ডেটা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর সব তথ্য থাকবে। এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে গেলে শুধু ইউআইডি নম্বর দিলেই সব তথ্য পাওয়া যাবে। নতুন করে কোনো তথ্য প্রয়োজন হবে না। সরকারি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ইউআইডি নম্বর চেক করলেই সব তথ্য পাবে। এখানে কোনো তথ্য ভুল হবার সুযোগ নেই এবং নকল করার সুযোগ থাকবে না। এই ডেটাবেইসে তার সারা জীবনের তথ্য সংযোজিত হবে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব তথ্যই থাকবে। একটি সময়ে গিয়ে দেশের সব মানুষ এই ডেটাবেইসের মধ্যে চলে আসবে। জনসংখ্যার পরিসংখ্যান করতে নতুন করে কোনো সময় ও অর্থ ব্যয় হবে না।’

এর অর্থ হচ্ছে আস্তে আস্তে আমরা ঢুকে যাচ্ছি একটা একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে। তবে সেটাতে একটু সময় লাগছে এই যা। সেটা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং পাসপোর্ট

নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র এর কাজের পরিধি

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্র কাজ শুরু করলেও এর পরিধি অনেক ব্যাপক। এর বিশালতা এখন বোঝা না গেলেও সেটা দেখা যাবে সামনের ৩ বছরে। নির্বাচন কমিশনের

কাজের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যাপারটি সাংঘর্ষিক না হলেও আইনগত কর্মপরিধি দিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্রকে সেভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

জাতীয় পরিচয়পত্রের সঠিক জনবল থাকলেও এর ব্যবহারের আইনগত ভিত্তি সেভাবে জোরালো হচ্ছে না। কারণ, নির্বাচন কমিশনের ম্যান্ডেট হিসেবে নির্বাচনের জন্য পরিচয়পত্র ব্যবহার করলেও পুরো দেশব্যাপী প্রতিটা সার্ভিসের জন্য সেভাবে বাধ্যবাধকতায় আনা যাচ্ছে না। অন্যান্য দেশের ‘বেস্ট প্র্যাকটিস’ অর্থাৎ সেরা অনুশীলনগুলো দেখলে এ ধরনের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রোগ্রামের বিশালতা ব্যাপক। আর সে কারণেই ভবিষ্যতে জাতীয় পরিচয়পত্র বিষয়টি অন্য সংস্থায় যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা আমার অভিজ্ঞতার কথা।

পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং ডেটাসেটগুলোর সংযোগের সুবিধা

একটা উদাহরণ নিয়ে আসি। বাংলাদেশে অনেক কাজের জন্য আন্তঃসংস্থাগুলোকে পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য কাগজ প্রসেস করতে হয়। ধরা যাক, আপনি যদি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন, সেখানে সেই পাসপোর্টের আবেদনের পরে সেখানে একটি পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন পড়ে। আমরা যেহেতু কাজের প্রসেসগুলোকে সহজীকরণ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছি, সেখানে দেখছি পাসপোর্ট একজন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। সে কারণে আমরা ধরে নিতে পারি, পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য একজন মানুষের পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন নেই।

তবে সরকারি নীতিমালায় যেহেতু ব্যাপারটা আছে, সেখানে তার যৌক্তিকতা নিয়ে কথা বলা যায়। কেন ‘পুলিশ ভেরিফিকেশন’ প্রয়োজন? এখানে প্রযুক্তির ব্যাপারে একটু পরে আলাপ করা যেতে পারে। আইনগত অথবা দেশের নিরাপত্তাজনিত কারণে একজন নাগরিককে দেশ ত্যাগে বাধা দিতে চাইলে সেখানে পাসপোর্ট যেসব সীমান্তে অর্থাৎ ‘বর্ডার কন্ট্রোল’ অংশে ব্যবহার হয়, সেখানে অনলাইনে তার পাসপোর্টের অ্যাক্সেস বন্ধ করে দিলেই এই পুলিশ ভেরিফিকেশনের সমস্যাটা থাকছে না।

ব্যাপারটাকে ব্যবচ্ছেদ করি। একজন নাগরিক যদি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে, তাহলে রাষ্ট্র তাকে পাসপোর্ট দিতে বাধ্য। তবে, সেই

নাগরিকের দেশত্যাগে অথবা তার ব্যাপারে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলে সেই পাসপোর্টটাকে যেকোনো ইমিগ্রেশন ‘বর্ডার কন্ট্রোল’ যেমন এয়ারপোর্ট অথবা সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে পার হবার সময় তার পাসপোর্টের কার্যকারিতা ‘রহিত’ করা যেতে পারে। ফলে, এখানে তার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

এই উদাহরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন মানুষ তার পাসপোর্ট আবেদনের পরিত্রেক্ষিতে এই বাড়তি পুলিশ ভেরিফিকেশনটির প্রয়োজন নেই। কারণ, তার পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য নীতিগতভাবে এই মুহূর্তে ‘জাতীয় পরিচয়পত্র’ এবং ‘জন্মনিবন্ধন সনদপত্র’ এই দুটো ডেটাসেটে তার নাম-ঠিকানা নির্ভুল থাকলে সে একটা পাসপোর্ট পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। সেখানে সেই মানুষটা বিপজ্জনক অথবা অন্য কিছু আইনগত সমস্যা থাকলে সেখানে সে পাসপোর্ট ব্যবহার বন্ধ রাখার পদ্ধতি অনলাইনে চালু করলে সেই পাসপোর্ট ব্যবহার করে কেউ দেশত্যাগ অথবা ঢুকতে পারবেন না।

এখানে ‘পার্সপেকটিভ হচ্ছে, আমাদের এতগুলো ডেটাসেট থাকতে একটা পাসপোর্ট পেতে কেন পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন পড়ছে? দেশে একটা একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি থাকলে একজন ব্যক্তির পাসপোর্টের জন্য ৫/১০ বছর পর আলাদা আলাদা নম্বর সংরক্ষণ না করে একই পাসপোর্ট নাম্বার ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই ইউনিক পাসপোর্ট নম্বরের পর তার বইয়ের সংখ্যা বাড়বে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন, আমার পাসপোর্ট নম্বর ৯৮৭৬৫৪৩২ হলে তার বই নম্বর ৯৮৭৬৫৪৩২/০১, ০২, ০৩ হিসেবে বাড়তে থাকবে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেটারও প্রয়োজন নেই। একটি একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে একটাই পাসপোর্ট নম্বর ব্যবহার হবে প্রতিটা মানুষের সারা জীবনের জন্য। এতে সরকারের প্রশাসনিক জটিলতা কমে যাবে অনেক গুণ।

ইন্টিগ্রেটেড ‘সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস’

প্রশাসন এর মধ্যেই ‘সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস’ বলে আলাদা অবকাঠামো তৈরি করেছে, যা জাতিসংঘের ম্যান্ডেটের সঙ্গে যায়। ফলে, এখানে অফিস ইনফরমেশন সার্ভিস ফ্রেমওয়ার্কের ইন্টিগ্রেশন ‘জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী’, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ‘ব্যানবেইস’-এর সংশ্লিষ্টতা ধীরে ধীরে একটা ইউনিক পরিচয়পত্রের

দিকে ঝুঁকছে। বর্তমানে সবকিছু নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাবেইসের আঙ্গিকেই সব ধরনের ইন্টিগ্রেশন হবার কারণে ‘জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়’ এবং ‘বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো’র মধ্যে আরেকটা ইন্টিগ্রেশন একটা একীভূত পরিচয়পত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এর পাশাপাশি, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর সঙ্গে ‘ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের যোভাবে ইউনিক শনাক্তকরণ পদ্ধতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে ধীরে ধীরে জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাসেট একটা একীভূত পরিচয়পত্রের দিকে মোড় নিচ্ছে। আমার ধারণা, এর সঙ্গে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ‘পাসপোর্ট’ এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের ‘ড্রাইভিং লাইসেন্স’ ডেটাসেট যোগ হলে সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাসেটের সঙ্গে প্রায় সব ধরনের সার্ভিসের সংযোগের বাধ্যবাধকতা চলে এলে এটা একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে। তখনই হবে আসল ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি! পাঁচটি ডেটাসেট, ক. বাংলাদেশে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (সিআরভিএস), খ. জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাসেট, নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ, গ. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঘ. ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিআরটিএ এবং ঙ. পাসপোর্ট ডেটাসেট, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ডেটাসেটগুলো দিয়ে একটা একীভূত আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার তৈরি করা সম্ভব এখনই, এর পেছনে থাকবে ব্লকচেইন প্রযুক্তি। আপনার ডিজিটাল ‘জাতীয় পরিচয়পত্র’ চলে আসবে আপনার ফোনে, সব নিরাপত্তাসহ। তখন বছরে ৪/৫টা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ভোটাভুটি অসম্ভব কিছু নয়। দেশের যেকোনো নীতিনির্ধারণী বিষয়ে ভোট দিতে পারবেন প্রতিমাসে।

এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস, জাতীয় ডেটাহাব

হাতেকলমে শেখা, অনেক জাতীয় ডেটাসেট

সরকারি সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়ায় যেই আর্কিটেকচারটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, সেটাকে আমরা বলছি ‘এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস।’

আমি যেহেতু এ ধরনের একটা বড় ‘এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস’ অর্থাৎ ‘ডেটাহাব’ তৈরির সঙ্গে যুক্ত আছি, সে কারণে এ ব্যাপারটা আমার খুব কাছের জিনিস। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে।

আপনাকে ট্রেড লাইসেন্স নেবার জন্য যত মূল অথবা সত্যায়িত ফটোকপি কাগজপত্র জমা দিতে হয় তার পেছনের বড় কারণ হচ্ছে আপনাকে ঠিকমতো যাচাই করে নেওয়া। এই যাচাই করতেই আসলে এতগুলো কাগজপত্রের প্রয়োজন পড়ছে। কেমন হতো, এই কাগজপত্রগুলো দেবার পরিবর্তে আপনি এই কাগজপত্রের শনাক্তকরণ সংখ্যাগুলোকে একটা অনলাইন ফরমে পূরণ করে দিলেই এ কাজটা হয়ে যাওয়ার কথা।

আপনি অনলাইন ফরমে আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রের ডিজিট, হোল্ডিং ট্যাক্স দিয়েছেন তার শনাক্তকরণ সংখ্যা, যেই জায়গায় ব্যবসা করতে চাইছেন সেই বাড়ির ঠিকানা, পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্টের জন্য যে ডকুমেন্ট প্রয়োজন তার কিছু শনাক্তকরণ সংখ্যা, ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নাম্বারের সার্টিফিকেট, যা সংখ্যায় কনভার্ট করা যেতে পারে, ব্যাংকের সচ্ছলতা সার্টিফিকেট দেবার জায়গায় ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং বিভিন্ন ধরনের পারমিটের তথ্যগুলোকে সংখ্যা ইনপুট দিয়ে দিলে এসব তথ্য সরকারি সব ধরনের শনাক্তকরণ অথবা ভেরিফিকেশন সিস্টেমের মধ্যে যাচাই হয়ে আসবে। আর সেটা হবে কীভাবে?

এত কান্টেক্টে ডিভাইস, যুক্ত হবে কোথায়?

National IdM strategies aim to benefit businesses, citizens and the government. They are considered a key enabler for innovation in the public and private sectors: as they facilitate the generalisation of stronger electronic authentication, they enable higher value services that require a high level of security assurance to be offered.

–National Strategies and Policies for Digital Identity Management in OECD Countries, OECD 177

পৃথিবীতে এখন এতো বেশি সিস্টেম/ডেটাসেট চলে এসেছে, যাদের একে অপরের সঙ্গে আলাদা করে যুক্ত করাটা একটা বিশাল মাথাব্যথার ব্যাপার। এই সিস্টেমগুলোর একেক অ্যাপ্লিকেশন একেকভাবে কথা বলে। এর পাশাপাশি একেক সংস্থা একেক ধরনের সফটওয়্যার সলিউশন কিনে থাকে। এ ধরনের সংস্থাগুলোর মধ্যে কথা বলিয়ে দেবার উপায় কী?

কীভাবে একে অপরের সিস্টেম না জেনেই নিজেদের ভেতরে তথ্য যাচাই করবে? প্রতিটা সংস্থার ডেটাবেইসগুলো এতটাই ভিন্ন যে এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা খুব কষ্টের। এর মধ্যে শুধু সিস্টেমগুলো নয়, এর পাশাপাশি হাজারো কিসিমের ‘কানেক্টেড ডিভাইস’ বাড়ছে গুণিতক হারে। এদের মধ্যে যোগসূত্রের উপায় কী?

এই যাচাইয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিস্টেমগুলো যাতে একে অপরের সঙ্গে কাজ করতে পারে সে জন্যই প্রয়োজন একটা এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস। এই ‘এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস’ অর্থাৎ ডেটাহাবের মধ্য দিয়ে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার অ্যাপ্লিকেশনগুলো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করবে কিছু কমন প্রোটোকলে। আসল কথা হচ্ছে, এই বাসের মতো ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়ে প্রতিটি সংস্থার ডেটাবেইসগুলো এমনভাবে যোগাযোগ করবে, যেখানে তথ্যগুলো যত ভিন্ন ধরনের ডেটাবেইসে থাকুক না কেন, সেগুলো কথা বলবে এক ভাষায়।

আলাদা করে সংযোগ, নাকি একীভূত সংযোগ?

এই এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস আসলে ভিন্নতর সিস্টেমগুলোকে একটা কমন রাস্তায় নিয়ে আসে, যেখানে সবাই একে অপরের সার্ভিস নিতে পারে। এই এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস না থাকলে বিভিন্ন সংস্থার আলাদা আলাদা ডেটাবেইসগুলোকে ‘পয়েন্ট টু পয়েন্ট’ ইন্টিগ্রেশন করতে হতো, যা প্রচণ্ড ব্যামেলাপূর্ণ।

যত ডেটাসেট বাড়বে ততই এ ধরনের ‘পয়েন্ট টু পয়েন্ট’ অর্থাৎ একের সঙ্গে আরেকজনের আলাদা করে সংযোগ দেওয়া এবং সেটাকে ব্যবস্থাপনায় রাখা খুবই কষ্টকর। সে কারণেই এই ধরনের এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস সব ধরনের অ্যাপ্লিকেশনকে সেই বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে, যাতে সেই বাস বাকি অ্যাপ্লিকেশনগুলোর সঙ্গে একটা কমন প্রোটোকলে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।

আমি নিজে অনেক সিস্টেম নিয়ে কাজ করেছি, সেখানে ‘ইনফরমেটিকা’ বেশ ভালো। তবে ওপেনসোর্সগুলোর মধ্যে ‘মার্কলজিক’ অসাধারণ ডেটাহাব সার্ভিস হিসেবে। সেদিক থেকে মূলসফটের ‘এনি-পয়েন্ট’ প্ল্যাটফর্ম পুরোনো হলেও কাজ ভালো। সবাই এখন ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে চলে যাচ্ছে, ফলে এগুলো ক্লাউডকে যুক্ত করছে একই ধারায়।

দেশের নীতিনির্ধারণী ড্যাশবোর্ড

নীতিনির্ধারণী ড্যাশবোর্ড নিয়ে কাজ

যেটাকে মাপা যায় সেটাকেই ম্যানেজ করা যায়

What gets measured gets managed.

—Peter Drucker^{১৫}

যেটাকে মাপা যায় সেটাকেই ম্যানেজ করা যায়

দেশের নীতিনির্ধারণী ড্যাশবোর্ড নিয়ে লিখেছিলাম এর আগের বইগুলোতে বারকয়েক। আমার প্রিয় বিষয় বলতে পারেন। ম্যানেজমেন্ট গুরু 'পিটার ড্রাকার' বলেছিলেন অনেক আগে, যেটাকে মাপা যায় সেটাকেই ম্যানেজ করা যায়। অনেক ভেতরের কথা, সেখানে দেশের হাজারও কাজগুলোকে কোন নিক্তিতে মাপা যায়? মাপতে হবে কেন? সরকার তাহলে কীভাবে জানবে তাদের হাজারও প্রজেক্টের অগ্রগতি?

একদম ছোট ব্যবসায় উদ্যোক্তা যেখানে তার দিনের শেষে টালিখাতায় হিসেব ঠিক করে পরের দিনের কাজের হিসেব নেন, সেখানে হাজার কোটি টাকার কাজে কী পঞ্চাশটা ড্যাশবোর্ড থাকবে না দেশের জন্য? আর কয়েকটা ইন্টিগ্রেটেড ড্যাশবোর্ড থাকবে সরকারপ্রধানের কাছে? আর কত দিন আমরা থাকব পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে, যেখানে সব ডেটা ম্যানিপুলেশন করা যায়?

১৫. ঠিক কে এ কথাটা বলেছেন এ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও কথাটা একদম ঠিক। 'হারভার্ড বিজনেস রিভিউ' উনাকে 'কোট' করেছেন ২০১০ সালে।

তথ্য আসবে সত্যিকারের শত শত সিস্টেমের ডেটাপয়েন্ট থেকে

এই কাজের অগ্রগতি/খরচের 'রিয়েলটাইম' ড্যাশবোর্ড পাল্টে দিতে পারে সামনের দিনগুলো। এখানে 'রিয়েলটাইম' বলা হচ্ছে, যেহেতু ডেটা আসবে সত্যিকারের শত শত সিস্টেমের ডেটাপয়েন্ট থেকে। কর্তব্যাক্তিদের বানিয়ে বলার সুযোগ কম। কোথায় কাজের আগে টাকা ছাড় হয়েছে, অথবা কাজে কাদের অসহযোগিতার জন্য অগ্রগতি পিছিয়ে যাচ্ছে, সেটার পরিষ্কার ইনডিকেটর চলে আসবে ড্যাশবোর্ডে। সামনে কবে কী কী হতে পারে এবং কোথায় কোথায় কী সমস্যা হতে পারে, সেটা বলে দেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

আগে কী লিখেছিলাম? ২০১৫ সালে। খুব একটা পাল্টায়নি কনটেন্ট। 'হাতেকলমে মেশিন লার্নিং' বইয়ে।

দেশের নীতিনির্ধারণী ড্যাশবোর্ড

আচ্ছা, বলতে পারবেন, একটা দক্ষ কোম্পানি কাজ করে কীভাবে? ঠিক বলেছেন। লাভ-ক্ষতির 'স্প্রেডশিট' দিয়ে। ইনভেস্টমেন্টের প্রতিটা টাকার হিসেব থাকে তাদের কাছে। কোথায় লাভ-ক্ষতি হচ্ছে সেটা জানা যায় সেই 'স্প্রেডশিট' থেকে। ছোট কোম্পানি হলে হিসেব রাখা সুবিধা। বড় হলে বাড়তে থাকে চ্যালেঞ্জ। শত শত ডিভিশন। প্রতিটার আলাদা আলাদা হিসেব। কোনোটার ২% লাভ আর কোনোটার ৮০% ক্ষতি এক কাতারের সেটা জানা দুরুর বটে। আর তাই মাল্টি-মিলিয়ন/বিলিয়ন ডলারের কোম্পানির 'চিফ এক্সিকিউটিভ'দের কাছে থাকে 'ড্যাশবোর্ড'। হাই-লেভেলের ধারণার জন্য। 'ইনফর্মড' ডিসিশনের জন্য। কোথায় কী হচ্ছে সেটার একটা 'ব্রড পারপেক্টিভ' হিসেব আসে ওখানে। আবার চাইলে ভেতরের খবর জানা যায় এক ক্লিকে।

একটা সফল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কাজ করে কীভাবে? ধরে নিচ্ছি গ্রামীণফোনের কথা। চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে আছে হাই লেভেল ড্যাশবোর্ড। প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কেপিআই'র কোথায় কে আছে—সামনের লক্ষ্য থেকে কত দূরে বা কাছে আছে কোম্পানি, তার সবকিছুই চলে আসে এই ড্যাশবোর্ডে। একটা 'ইনফর্মড' সিদ্ধান্ত নিতে যা দরকার তার সব টুল দেওয়া থাকে উনাকে। পাশাপাশি তার ড্যাশবোর্ডে থাকে টেলিগ্রামের লক্ষ্যমাত্রা, যেটা আসলে মাতৃ কোম্পানির মূল ভাবধারা। প্রতিটা কোম্পানি চলে একটা দর্শনের ওপর। দর্শনকে ধরতে দরকারি নীতিমালা ঢুকে যায় 'ক্যাসকেডিং' স্টাইলে সবকিছুই ভেতরে। আবার ভেতরের সবকিছুই 'ইন্টার-রিলেটেড'। বাংলাদেশের একটা সিম বিক্রিতে তার 'ইমপ্যাক্ট' দেখাতে পারে গ্লোবাল ড্যাশবোর্ডে। খুবই ছোট হতে পারে জিনিসগুলো। তবে, সবকিছু ইন্টার রিলেটেড। এক সুতোয় বাঁধা। সরকারের একটা নীতিমালা পাল্টালে সেটার 'ইমপ্যাক্ট' দেখায় আরও বড়ভাবে।

যেমন, সিম ট্যাক্স বাড়লে-কমলে সেটার আউটকাম দেখায় ওই জায়গায়। মধ্যম লেভেলের ম্যানেজারদের কাছেও আছে তাদের সম্পর্কিত নিজস্ব ড্যাশবোর্ড। তার লেভেলে। যেখানে সে নিতে পারে ‘ইনফর্মড ডিসিশন’।

সরকারের ড্যাশবোর্ড হলে কী হতো এখানে? ডেটার ক্ষমতা অনেক। সেটা দেখতে পারে অনেক ভেতরের জিনিস। পৃথিবীতে প্রতিটা ঘটনা একে অপরের সঙ্গে কানেক্টেড। ডেটা নিয়ে কাজ করি বলে বুঝতে পারি। অভাবের তাড়নায় কিশোরীর আত্মহত্যা থেকে শুরু করে সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু— সবকিছুর ইমপ্যাক্ট আসতে পারে ওই ড্যাশবোর্ডে। ‘ভিজিএফ’ কার্ড ঠিকমতো মাঠপর্যায়ে বিতরণে কোথায় গিয়ে আটকে গিয়েছে, সেটাও আসবে এখানে। আমাদের অত ভেতরের খবর না হলেও চলে এ মুহূর্তে। গ্রামপর্যায়ের ডেটা পয়েন্টই যথেষ্ট এখন। সরকারপ্রধান জানতে পারবেন ভেতরের অনেক খবর। ঘটার আগেই। সিঙ্গাপুরের ‘স্মার্ট নেশন’ অথবা সংযুক্ত আরব আমিরাতের ‘স্মার্ট গভ’ প্রজেক্টের ড্যাশবোর্ড এখন পৌঁছে গেছে অন্য লেভেলে। সে দেশগুলোর সরকারি সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মের প্রায় পুরোটাই চলে এসেছে অনলাইনে। আমরাও আসছি আস্তে আস্তে। সেটার শুরুটা হতে পারে এই ড্যাশবোর্ড দিয়ে।

সরকার কি চালানো সম্ভব এভাবে? কোম্পানির মতো করে? সম্ভব। এদিকে অনেক কোম্পানি এখন সরকারের মতো করে চালাচ্ছে তাদের ‘করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি’। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে। মানে লাভটাই সবসময় মুখ্য নয়। আগে বলেছি, সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করে অনেক দেশই হাতেনাতে দেখতে পাচ্ছে ডেটার ক্ষমতা। সত্যিকার অর্থে সিঙ্গাপুরে আমার একটা রেগুলেটরি প্রশিক্ষণের পর খুলে গেছে মাথা। সেসব দেশে নীতিনির্ধারণে ডেটার ব্যবহার বাঁচাচ্ছে অনেক টাকা। অপব্যয় থেকে। ভুল সিদ্ধান্ত থেকে। ডেটা সাহায্য করছে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে। একটা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বাঁচাতে পারে অনেক টাকা। না হলে প্রজেক্টের টাকা বাড়তেই থাকে দিনকে দিন।

কেমন হয় এ রকম একটা ড্যাশবোর্ড হলে? নীতিনির্ধারণী ডেটা ড্যাশবোর্ড। প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং সব আমলাদের জন্য। যার জন্য যেটা প্রয়োজ্য। ২০০-এর ওপর থাকবে বিভিন্ন ডেটা পয়েন্ট। মন্ত্রণালয়সহ। ওই জায়গাগুলো থেকে জোগান দেওয়া হবে ডেটা। এই ডেটাগুলোকে ‘কো-রিলেট’ করে মেশিন লার্নিং থেকে জানা যাবে জনগণের চাহিদা, কোথায় আসল সমস্যা এবং সাংসদদের নিজ নিজ এলাকার কাজের ‘গ্যাপ’ অথবা ‘প্রোগ্রেস’। কোথায় আটকে আছে কাজ? কী সমস্যা, ভেতরের অসংগতি— তার সবকিছুই চলে আসবে আমাদের ড্যাশবোর্ডে। ফলে সিদ্ধান্তগুলো হবে ‘ইনফর্মড’, মানে জেনে সিদ্ধান্ত দেওয়া। আমার ডেটা বলছে, ভারতে এ ধরনের ড্যাশবোর্ড মানে ‘ডেটা ড্রিভেন গভর্ন্যান্স’ চালু হয়েছে অন্ধ্র প্রদেশ, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড আর মহারাষ্ট্রে। সাহায্য করছে একটা বেসরকারি সংস্থা।

২০০৮ সালের কথা। স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটা প্রশিক্ষণে গিয়েছিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানেই প্রথম দেখলাম ড্যাশবোর্ড,

কীভাবে একটা দেশ বাতাস অর্থাৎ স্পেকট্রাম ম্যানেজ করে। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা, সব রিয়েল টাইম, সফটওয়্যারে। তিন ধরনের ড্যাশবোর্ড ব্যবহার হয় সরকারে।

তিন ধরনের ড্যাশবোর্ড

১. অপারেশনাল (যা দিয়ে সবকিছু মনিটর করা যায় রিয়েল টাইম, যেমন পুরো দেশের ট্রাফিক ড্যাশবোর্ড, যা দিয়ে ট্রাফিক, সড়ক দুর্ঘটনা, বন্যার অবস্থা, নতুন রাস্তা— যখন একটা রাস্তা বন্ধ হয়, ঈদের ট্রাফিক— বাস, ট্রেন, লঞ্চের রুট জানানো যাবে জনগণকে)
২. ট্যাকটিক্যাল (এগুলো সাধারণত মনিটরিং এবং বেঞ্চমার্কিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় অন্যান্য ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে সঙ্গে)— স্পেসিফিক কাজের জন্য
৩. স্ট্রাটাজিক (সরকারের বড় লেভেলের কৌশলগত ব্যবস্থাপনাগুলোকে ঠিকমতো মেপে সেটার কৃতিত্বগুলোকে ট্র্যাকিং করার জন্য)— হাই লেভেল

ড্যাশবোর্ড কী এবং কেন এটা দরকার?

ড্যাশবোর্ড কেন লাগবে আমাদের?

ড্যাশবোর্ড কী?

A visual display of the most important information needed to achieve one or more objectives, consolidated and arranged on a single screen so the information can be monitored at a glance.

—Few (2006)

প্রশ্ন আসতে পারে কেন ড্যাশবোর্ড দরকার? ধরা যাক, গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে আছেন আপনি। যেহেতু আপনার দায়িত্ব হচ্ছে কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই গাড়টাকে ঠিকমতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া, সেখানে গাড়ির সামনের ড্যাশবোর্ড থেকে সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত পাচ্ছেন। যেমন, গ্যাসোলিন কতটুকু আছে, এটা দিয়ে আপনার গন্তব্যস্থল পৌঁছাতে পারবেন কি না; গাড়ির ব্যাটারি লেভেল কতটুকু আছে, যা দিয়ে গাড়ি চলাকালীন গরমে এসি চালানো বা অন্ধকারে আলো জ্বালানো যাবে কি না; গাড়ির রেডিয়েটরে পানি আছে কি না, গাড়িকে ডানে-বামে নেবার জন্য তার ইন্ডিকেটর লাইটগুলো ঠিকমতো চলছে কি না, বৃষ্টি হলে ওয়াইপার অথবা স্ক্র্যা হলে গাড়ির লাইটগুলো ঠিকমতো

চলবে কি না তার সব তথ্য পাচ্ছেন গাড়ির ভেতরের একটা ড্যাশবোর্ড থেকে। উন্নত মডেলের গাড়ি হলে আরও অনেক ধরনের ইনসাইট পাওয়া যায়, যা একজন গাড়িচালককে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের যৌক্তিকতা: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

একটা ড্যাশবোর্ড কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সেটার ওপর নির্ভর করে ড্যাশবোর্ডটা ডিজাইন করা হয়। বেশ কয়েকটি দেশের ড্যাশবোর্ড দেখে যেটা বুঝছি, এর মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতায়ন করা হয়। অর্থাৎ জনগণ সরাসরি দেখতে পারেন সরকার কীভাবে তাদের বিভিন্ন কাজ করছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ভিত্তিতে।

এই ড্যাশবোর্ডগুলো একধরনের টুল, যার মাধ্যমে তথ্যের অবাধ আদান-প্রদান সম্ভব হয়, যাতে জনগণ সরকারের ভেতরে কীভাবে তাদের কাজগুলো শুরু করছেন, ওগুলো কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং কীভাবে শেষ করছেন তার একটা ভালো ধারণা দেওয়া যায়। এ ধরনের ড্যাশবোর্ড স্বচ্ছতার একটা মাপকাঠি তৈরি করে দেয়, যারা খাজনা দিচ্ছেন। উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন, অনেক দেশের ড্যাশবোর্ড সাইট, যা দেখা যায় পৃথিবীজুড়ে।

ডেটার স্টোরিটেলিং

A citizen-facing, government dashboard is a way to showcase performance and tell a story about your data, but is not a data dump. Dashboards should summarize the most important measures and goals for your organization, providing context and analysis, without overwhelming the reader with information.

—The Basics Of A Good Local Government Dashboard, ClearPoint Strategy

বর্তমানে ডেটা সায়েন্স এবং ড্যাশবোর্ডগুলো সরকারি খাতে অনেক বেশি মনোযোগ অর্জন করছে। আমরা ধারণা করতে পারি একটা ড্যাশবোর্ড কিছুটা ওয়েব পেজের মতো করে তৈরি করা হয়, যা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে দরকারি সব ধরনের ডেটা ভিজুয়ালাইজ করিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয় সরকারের কাজের অগ্রগতি। একনজরে বোঝা যায় কী হচ্ছে ভেতরে। কী হবে সামনে। কী হয়েছিল আগে। ডেটা দিয়ে ভিজুয়ালাইজেশন।

উদাহরণ হিসেবে, ২০০৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার জাতীয় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নীতি (কীভাবে সরকারি তহবিলের সঠিক ব্যবহার জনগণকে জানানো যায়) স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি লক্ষ্য করে ফেডারেল উদ্দীপনা তহবিলসহ ‘ইউএসএ-স্পেন্ডিং’ ড্যাশবোর্ড তৈরি করেছিল। ডাচ সরকার জনগণের সঙ্গে বড় আইটি প্রকল্পগুলোসহ সব বড় বড় প্রজেক্টের ভেতরের ইনসাইট দেবার জন্য ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে। ব্যাপারটা এ রকম যে তারা জনগণকে আহ্বান করছে তাদের ভুলগুলোকে শুধরে দেবার জন্য। এর ফলে, স্বচ্ছতা তৈরি করতে এবং জনগণের কাছ থেকে নিজের জবাবদিহি অর্জনের জন্য এই ড্যাশবোর্ডগুলো জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ শুরু করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠছে।

প্রাইভেট সেক্টরে ‘বিজনেস ইন্টেলিজেন্স’

আপনি গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামলে আপনার গতিসীমা নির্ধারিত হয় আপনার স্পিডোমিটার দেখে। সেই হিসেবে সরকারি প্রজেক্টের কাজের গতি কমে গেলে সেটা অন্যান্য প্রজেক্টের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অথবা ডিপেনডেন্সি সমস্যা না হয় সে রকম সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য অন্যান্য ড্যাশবোর্ডের সাহায্য নিতে হয়। প্রাইভেট সেক্টরে এটাকে বলা হয় ‘বিজনেস ইন্টেলিজেন্স’ যেটাকে ব্যবহার করে স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য পাবলিক সেক্টর তাদের অফিসের ভেতরের ইন্টার্নাল ম্যানেজমেন্ট এবং স্বচ্ছতার জন্য অফিসের বাইরে যেসব তথ্য দেওয়া প্রয়োজন, সবকিছুই আসতে পারে একটা ড্যাশবোর্ড দিয়ে।

আপনার ড্যাশবোর্ডে আলাদাভাবে অ্যানালিটিকস থাকলে কম সময়ে এবং যথার্থ কাজ করে অনেক বেশি আউটপুট দেওয়া সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এ ধরনের ড্যাশবোর্ডগুলোর মাধ্যমে সরকারি সংস্থা নিজেদের ভেতরে এবং জনগণের সঙ্গে কমিউনিকেশনের স্বচ্ছতা, তাদের দক্ষতা এবং প্রতিটা প্রজেক্টের ভেতর দায় মানে অ্যাকাউন্টবিবলিটি নিয়ে আসা যায় কয়েক মাসের মধ্যেই।

দেশের কাজগুলোর অগ্রগতি জানব কীভাবে?

ড্যাশবোর্ড দিয়ে কাজ মাপতে পারা, এর সুফল

দরকার সবারই

Dashboards are becoming an important means of tracking key performance indicators for private, nonprofit, and public organizations. Broadly, dashboards summarize ‘key performance metrics and underlying performance drivers’.

—Pauwels, et al., 2009, p. 177, (O’Reilly, 2009)

অনেক দেশের বেশ কিছু অপারেটরের ‘সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার’ দেখেছিলাম কাজের ফাঁকে ফাঁকে। একটা নেটওয়ার্ক (অনেকটাই মানুষের শরীরের মতো) কীভাবে এবং কেমন চলছে, তার ‘হেলথচেক’ দেখলে বোঝা যায় সেই নেটওয়ার্কটা কেমন ‘পারফর্ম’ করবে সামনে। কীভাবে একটা নেটওয়ার্কের ওপর বাইরে থেকে ‘অ্যাটাক’ আসছে সেটা দেখলে মনে হয় এটা একটা সামরিক কমান্ড সেন্টার। হাজারো ড্যাশবোর্ড, একেকটাতে একেকটা স্ট্যাটাস। সাধারণ মানুষমাত্রই বুঝতে পারবেন সেই ভিজুয়ালাইজেশনগুলো। যেটা দেখা যায়, সেটা মাপা যায়— ফলে সেটাকে আরও ভালো করার স্কোপ থাকে।

ধারণা করুন, আমাদের মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর গ্রামীণফোনের কথা। এই বিশাল নেটওয়ার্ক চালাতে তাদের অফিসে রয়েছে এ ধরনের ‘সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার’, যা দিয়ে উনারা দেখতে পারেন পুরো নেটওয়ার্ক কীভাবে চলছে, প্রতি সেকেন্ডে। শত শত ড্যাশবোর্ড বলছে, মানে জানিয়ে দিচ্ছে নেটওয়ার্কের প্রতি মুহূর্তের অবস্থা। সেভাবে চিন্তা করুন, একটা দেশকে চালানোর জন্য এ রকম ড্যাশবোর্ডের প্রয়োজনীয়তার কথা। যেটা দেখভাল করবে জনগণের সমস্যা প্রতিনিয়ত, এর পাশাপাশি প্রতিটা প্রজেক্ট কীভাবে চলছে, কোথায় আটকে আছে অথবা সামনে কী কী সমস্যা হতে পারে?

আমার অভিজ্ঞতায় সরকারের ভেতরে এ ধরনের ড্যাশবোর্ড এবং তার সংক্রান্ত যত অ্যানালিটিকস ব্যবহার করা দেখেছি (দেশে নয়), সেগুলোর কিছু বড় সুফলগুলো নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে।

১. সঠিক (ভুল নয়) সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা

যেহেতু সরকারি সংস্থাগুলো অনেক ধরনের প্রযুক্তির সাহায্যে প্রচুর ডেটা জেনারেট করে রিয়েল টাইমে, ফলে এ ধরনের সংস্থাগুলো বিজনেস অ্যানালাইটিকস ব্যবহার করে খুব সহজে নিজেদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে অল্প সময়ে এবং সুচারুভাবে। বর্তমানে যে ধরনের বিজনেস অ্যানালাইটিকস চলছে প্রাইভেট সেক্টরে, সেগুলো সমানভাবে সরকারের ডেটাসেটগুলোর ওপর প্রযোজ্য। সত্যি বলছি।

২. অদক্ষতা খুঁজে ‘আইডেনটিফাই’ করা এবং কমিয়ে নিয়ে আসা

সরকারের ছোট ছোট প্রশাসনিক জোন এবং স্থানীয় সরকার তাদের বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্যে আন্তঃসংযোগ এবং ‘ইন্টার ডিপেনডেন্সি’ দেখা যায়, যেহেতু সেগুলো বেশ কয়েকটা ড্যাশবোর্ড হয়ে আসছে ফাইনাল ড্যাশবোর্ডে— সে কারণে প্রজেক্টগুলোর ভেতর ‘অদক্ষতা/ডেলিভারি না দিতে পারা’ খুব সহজেই দেখা যায়। সেই অদক্ষতাকে ঠিকমতো ধরতে পারলে সেটাকে কমিয়ে আনা সম্ভব।

৩. বাহুল্য খরচ, এজেন্সিগুলোর রিসোর্সের অপব্যবহার, জালিয়াতি রোধ

বিশ্বাস এবং কাজের হিসেব

Having a publicly available performance dashboard is one the best ways that local governments can build trust with the community while engaging employees.

—8 Local Government Public Dashboard Examples, Envisio

সরকারের মধ্যে কোথায় একই কাজ কয়েক জায়গায় (ডুপ্লিকেট) হচ্ছে, সেটাকে খুঁজে বের করে তার ভেতরে প্রসেস অপটিমাইজেশন, এর পাশাপাশি ফান্ডের অপব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতির মাধ্যমে কোথায় কোথায় সরকারি টাকার শান্দ হয়, সেগুলোকে বের করা যায় এই ধরনের ড্যাশবোর্ডগুলো দিয়ে। যেসব সিদ্ধান্তগুলো আগের বছরগুলোতে টাকা-পয়সা নষ্ট করেছে এবং যেগুলো থেকে খুব একটা আউটপুট আসেনি সেগুলোকে ঠিকমতো শনাক্ত করে বাদ দেওয়া যায় এ ধরনের ড্যাশবোর্ড দিয়ে।

৪. আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বাহিনী, জরুরি সেবার অ্যানালাইটিকস

এ ধরনের ড্যাশবোর্ড নিরাপত্তা বাহিনী এবং জরুরি সেবা সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে ক্রাইম প্যাটার্ন এবং অবৈধ কাজের অনেক ধরনের অ্যাকটিভিটি শনাক্ত করতে পারে সময়ের থেকেই। এর পাশাপাশি, ড্যাশবোর্ড থেকে রিপোর্ট নিয়ে স্থানীয় সরকার সরাসরি কাজ করতে পারে নিজ নিজ এলাকায়, জনগণের স্বার্থে। ভুল মানুষকে হয়রানি না করে সঠিক অপরাধীকে বের করার জন্য প্রচুর ধারণা আসে এ ধরনের ‘স্পেশালাইজড ড্যাশবোর্ড’ থেকে।

৫. সরকারি সার্ভিস ডেলিভারিতে দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা আনয়ন

এধরনের ড্যাশবোর্ড দিয়ে যেভাবে সরকারের ভেতরের ‘ইন্টারনাল’ প্রশাসন চালানো যায় কেপিআই-ভিত্তিক, সেভাবে সরকারের ভেতরের কাজের ফলাফল প্রকাশ করা যায় জনমুখী ড্যাশবোর্ডগুলোতে। এই ড্যাশবোর্ডগুলো থেকে সরাসরি দেখতে পাবে জনগণ, যেখানে তারা পরিমাপ করতে পারবে কোন অফিসগুলো এগিয়ে আছে জনসেবায়। এভাবে তৈরি হবে একধরনের জনমুখী প্রতিযোগিতা। এটা সরকারি অফিসগুলোর কাজের ভেতরে স্বচ্ছতার প্রথম ধাপ।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ‘কী পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর’ এবং সরকারি সার্ভিস ডেলিভারি ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি সার্ভিসের ডেটা যেমন কত ট্যাক্স জমা পড়ছে প্রতিদিন, কোন কোন রাস্তা ঠিক হয়েছে সময়মতো। জনগণের বিভিন্ন সার্ভিসগুলোর স্ট্যাটাস, কোথায় কোন জায়গায় কার কোন ফাইল আটকে আছে, সরকারের আয় এবং খরচ এবং ভর্তুকির (সব জায়গায় নয়) ড্যাশবোর্ড যা স্থানীয় সরকার অনুযায়ী ভাগ করে দেখানো হবে।

একীভূত ড্যাশবোর্ড

কাজ করে তো?

When President Barack Obama took office, he said, ‘The question is not whether government is too big or too small but whether it works.’ But how do you know what works and what doesn’t?

—Use of Dashboards in Government, Fostering Transparency and Democracy Series

সরকারি একীভূত ড্যাশবোর্ডগুলো সরকারকে এমনভাবে ক্ষমতায়ন করে, যাতে সে নিজের পারফরম্যান্স ঠিকমতো হিসেব করে— এর জন্য কী কী ধরনের রিসোর্স দরকার— কোথাও কম বা কোথাও বেশি সে ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট করে ঠিক করে কীভাবে ফাইনাল আউটকামে যাওয়া যায়।

ফাইনাল আউটকাম হচ্ছে সরকার তার নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যে ধরনের উদ্দেশ্য ঠিক করে রেখেছে, সেই উদ্দেশ্যগুলো থেকে সরকারি কাজের অগ্রগতি কত দূরে বা কত কাছে আছে, সেটার একটা ভালো ভিজ্যুয়ালাইজেশন/ইনসাইট পাওয়া যায় এই ড্যাশবোর্ড থেকে।

সরকারি সার্ভিসগুলোর সহজীকরণ

সরকারি খাতে উদ্ভাবনা স্পর্শ করবে মানুষের জীবন

সরকারি খাতে উদ্ভাবনা নিয়ে আসাটা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং, তবে অসম্ভব কিছু নয়। আমি বহু দেশ ঘুরে এবং অনেক দেশি-বিদেশি কর্তাব্যক্তির কথামতো তাদের কৌশলপত্রগুলো পড়ে যেটা বুঝেছি; সরকারি খাতে উদ্ভাবনা নিয়ে আসতে পারলে এটা বিশাল একটা জনগোষ্ঠীর জীবনকে স্পর্শ করবে। মানুষের জীবনকে পাল্টে দেওয়া যাবে।

যে কারণে প্রাইভেট সেক্টর অথবা বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্ভাবনা যেভাবে পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রাকে পাল্টে দিচ্ছে, সেখানে সরকারি খাতে এ ধরনের উদ্ভাবনা মানুষকে বিশাল প্রেরণা দিতে পারে। যেহেতু আমি সরকারে আছি প্রায় ৩০ বছর, সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ে ছোট ছোট উদ্ভাবনাগুলো (যা ঘটেছে আমার চোখের সামনে) পাল্টে দিয়েছে মানুষের ভালো থাকার ছোট ছোট কিছু আকাঙ্ক্ষাকে। মানুষ এখন আশা করছে প্রশাসন তাদের ছোট ছোট আকৃতিগুলোকে ঠিক করে দেবে।

জনগণ যখন এক্সপার্ট

Innovative governments are enhancing citizen engagement and ensuring public involvement at every stage of the policy cycle: from shaping ideas to designing, delivering and monitoring services.

—Citizens as experts: redefining citizen-government boundaries, Embracing Innovation in Government Global Trends

‘দ্যা অর্গানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ অর্থাৎ ‘ওইসিডি’ এই উদ্ভাবনের নিয়ে চমৎকার কিছু ধারণা দিয়েছে।

বিশেষ করে সরকারি খাতে কীভাবে উদ্ভাবনা নিয়ে আসা যায়। তারা পৃথিবীর অনেক দেশের সঙ্গে কাজ করে একটা জিনিস বুঝেছে যে উদ্ভাবনা কখনোই একটা আলাদা বিষয় ছিল না বরং এই উদ্ভাবনা নিয়ে সরকারি খাত বিভিন্ন দেশে প্রায় চারটা পার্সপেক্টিভ নিয়ে কাজ করে দেখিয়েছে।

ক. মিশন-ভিত্তিক উদ্ভাবন: আমাদের প্রয়োজন

একটা সুস্পষ্ট ফলাফল অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মিশন। এর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়, কী ফলাফল চাচ্ছি শেষে। এই ফলাফল অর্জনের জন্য কী ধরনের উদ্ভাবনা প্রয়োজন অথবা এর মধ্যে কী কী কাজ করতে হবে— এর সবকিছুই পড়বে এ ধরনের উদ্ভাবনার মধ্যে। যেমন ধরুন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যবস্থাপনায় কীভাবে একটা ভাতা (বয়স্ক, বিধবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি) তার সুবিধাভোগীর কাছে নিশ্চিতভাবে, সঠিক সময়ে, দ্রুততার সঙ্গে সুবিধাভোগীকে কোনো ধরনের ঝামেলায় না ফেলে তার দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায়, সেটাকে মিশনভিত্তিক উদ্ভাবনা বলা যেতে পারে।

এখানে আমি যতগুলো ‘কিওয়ার্ড’ ব্যবহার করেছি, ততগুলো মাইলস্টোন অর্জনের জন্য এর মধ্যে যত ধরনের উদ্ভাবনা নিয়ে আসা দরকার, সেটা করতে পারবে শুধু সরকারি প্রশাসন। এখানে প্রতিটা পদে পদে বাধা না দিয়ে বরং কীভাবে অল্প সময়ে সব মানদণ্ড অর্থাৎ ‘ক্রাইটেরিয়া’ পূর্ণ করে সুবিধাভোগীর হাতে টাকা পৌঁছানোটাই হচ্ছে এই উদ্ভাবনার মিশন।

মিশনভিত্তিক এই ধরনের উদ্ভাবনার সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে— এর ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য যত ধরনের অভ্যন্তরীণ এবং মধ্যবর্তী উদ্ভাবনার দরকার পড়বে, সেগুলো ব্যবহার করে ফলাফল নিশ্চিত করা। যুদ্ধে যখন আমাকে একটা ‘টার্গেট’ দেওয়া হয়, তখন সেই টার্গেটকে হাতের নাগালে নিয়ে আসার জন্য যত ধরনের উদ্ভাবনার প্রয়োজন, সেটা তৈরি করতে হবে আমাকে। সমস্যার কথা বলে এই কাজ থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বিশালাকার ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

বাংলাদেশে যদি সবচেয়ে বড় ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয় তাহলে সেটা হবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প। সবচেয়ে বড় বলে ঝামেলার কাজ

হবে এই অসাধারণ প্রজেক্টে। সবচেয়ে বেশি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় দরকার এখানে। আর তাই এখানে দরকার সবচেয়ে বেশি উদ্ভাবনা। এখানে কীভাবে একটা ব্যবস্থাপনার মধ্যে একজন আসল সুবিধাভোগীকে (যিনি হতে পারেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাগ্রহণকারী ব্যক্তি) চিহ্নিত করা যায়, সেটার জন্য সত্যিকারের উদ্ভাবনা রয়েছে আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্র, সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (সিআরভিএস), জন্মনিবন্ধন যাচাই এবং শনাক্তকরণ ব্যবস্থাপনায়।

আগের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের ইনপুট এবং সরকারি এবং বেসরকারি ডেটার ভিত্তিতে বিভিন্ন ‘প্রক্সি মিনস’ এবং সেই এলাকার সরেজমিনে তথ্য-উপাত্ত এক জায়গায় নিয়ে এসে একজন আসল সুবিধাভোগীকে শনাক্ত করা করা যাবে মেশিন লার্নিং দিয়ে। সেখানে সুবিধাভোগীর পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের ধারণা পাওয়া যাবে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ডেটা সেটে।

সে কারণে লাগবে রুলসেট, প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে। সেটাকে ট্রান্সলেট করতে হবে মনুষ্যবিহীন সিদ্ধান্ত নেবার অ্যালগরিদম। বানাবে মানুষ, তবে সেটা সিদ্ধান্ত নেবে মানুষের সাহায্য ছাড়াই। শেষ অংশে থাকতে পারে মানুষ, বড় ধরনের ভুল আটকাতে। এটার একটা ভালো মডেল দেখতে পারেন ফিনল্যান্ডের ‘কেলা’ থেকে, যা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম।

খ. ‘এনহ্যান্সমেন্ট’ অর্থাৎ বর্ধনমুখী ভিত্তিক উদ্ভাবন

এই উদ্ভাবনাগুলোতে আগের কাজের ধারা পদ্ধতিগুলোকে আপগ্রেড করবে বিদ্যমান কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। এটা একটু কষ্টকর, তবে বর্তমানের নতুন প্রজন্মের প্রশাসনের কর্মকর্তারা এই বিদ্যমান কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে উদ্ভাবনা বের করে নিয়ে আসছেন, যা আসলেই তাক লাগানোর মতো। তারা নিজেদের উদ্যোগে অনেক কিছু করেছেন সরকারের বাড়তি টাকা বরাদ্দ ছাড়াই।

স্কেলে কাজ করতে পারা

One of the trickiest aspects of government involves scale. In terms of innovation, this means establishing how to scale an innovation initiative from small to large once it has demonstrated its value.

—Scaling government, Embracing Innovation in Government
Global Trends

এই উদ্ভাবনাতে দক্ষতা এবং আরও ভালো ফলাফল অর্জন করার জন্য যত ধরনের উদ্ভাবনা দরকার, সবই এখানে করা সম্ভব এবং সব ধরনের উদ্ভাবনা হচ্ছে বিদ্যমান কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। ব্যাপারটা এ রকম যে বর্তমান যে কাঠামোগুলো আছে, সেই কাঠামোগুলোকে ব্যবহার করে যত ধরনের উদ্ভাবনা নিয়ে আসা যায় একটা কাজ করতে।

এটা অবশ্যই আগের মিশনভিত্তিক উদ্ভাবনার মতো কঠিন না হলেও যেহেতু বিদ্যমান কাঠামোকে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, সে কারণে এখানে উদ্ভাবনার কিছু কিছু অংশ সীমিত হয়ে আসে। তবে, আমাদের মতো সীমিত আয়ের দেশগুলোতে এ ধরনের উদ্ভাবনার বেশি প্রয়োজন। এবং সেটাই হচ্ছে আজকের প্রশাসনে। ভূমি নিয়ে প্রচুর বর্ধনমুখীভিত্তিক উদ্ভাবন হয়েছে, যা পরে প্রশাসনের পোর্টালে আনুষ্ঠানিকভাবে এসেছে।

ইলেকট্রনিক সেবা, ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টেশনের জন্য আইনগত ভিত্তি

সরকারের যত ধরনের সেবা রয়েছে, সেগুলোকে যখন আমরা ইলেকট্রনিক সেবাতে নিয়ে যাই তখন সফটওয়্যারে সেবাগুলোকে সহজীকরণ করলেও সরকারি নথিপত্রে সেই সহজীকরণ করা বেশ কষ্টকর। সে কারণে বর্তমানে সরকারি যত ধরনের ইলেকট্রনিক সার্ভিস আছে, সেই সার্ভিসগুলোর ‘ব্যাক এন্ড’ হিসেবে প্রশাসনিক নথিপত্রগুলোকে সহজীকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই সহজীকরণ প্রক্রিয়া হচ্ছে, বর্তমান যে প্রক্রিয়াগুলো আছে, সেই প্রক্রিয়াগুলো থেকে ‘এনহ্যান্সমেন্ট’-ভিত্তিক উদ্ভাবনায় বাড়তি স্টেপগুলোকে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। কারণ, সেগুলো ছিল নথিভিত্তিক।

এখন কাজগুলো সফটওয়্যারে এলেও কাগজের কাজগুলোকে আইন দিয়ে কমিয়ে আনতে হবে। আইন বলে দেবে এই সফটওয়্যারের রিপোর্ট কাগজের নথির মতো পরিগণিত হবে এবং আস্তে আস্তে একটা সময় পর সব নথি

ইলেকট্রনিক হয়ে যাবে। আইন তখন ইলেকট্রনিক নথিকেই আসল ধরে নেবে। তখন আসবে ডিজিটাল সিগনেচার, যা আইন হয়ে আছে অনেক দিন থেকে। প্রেরক ও প্রাপককে শনাক্ত করতে। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই যুগান্তকারী আইনগুলোর কথা বলা যেতে পারে।

টেন্ডারিং প্রক্রিয়া: কেনাকাটাকে ‘রুল বেইজড’ সিস্টেমে ম্যাপিং

ধরা যাক, আগে সরকারি অফিসগুলোতে যে ধরনের টেন্ডারিং প্রক্রিয়া ছিল, সেগুলোকে সফটওয়্যারের ধারণা থেকে পরিবর্তন করে আনা হয়েছে বেশ আগেই। এখানে যারা ক্রয় সেবা গ্রহণকারী এবং যারা কিনছেন, তাদের মধ্যে সংযোগ সূত্র হিসেবে কাজ করছে সেই পোর্টালটি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেটা কতটুকু স্বচ্ছতা নিয়ে এসেছে? যারা টেন্ডার পাচ্ছেন না, তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে কি? সেখানেই আসবে ওয়ার্ক-ফ্লোর জন্য গণশুনানি, কীভাবে হওয়া দরকার, ওয়েবসাইটে দিয়ে। এখন যে কাজ হয়েছে, সেটা প্রশংসার যোগ্য। তবে এখানে আরও কাজ আছে সামনে। আর সেটাই উদ্ভাবনা কীভাবে আরও জনগণের কাছে পৌঁছানো যায়।

এখন উদ্ভাবনার ব্যাপারটাতে আসি। এখানে ‘ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স প্রকিউরমেন্ট’ অর্থাৎ ‘ই-জিপি’ পোর্টাল দিয়ে সব ধরনের কাজ হলেও এই কেনাকাটার প্রক্রিয়াকে ‘রুল বেইজড’ সিস্টেমে পরিবর্তন করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেবে অ্যালগরিদম। একজন মানুষ অথবা টেন্ডার ইন্ডালুয়েন্স কমিটি যেভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে একজনকে কাজ দিত, সেই প্রক্রিয়াকে ‘রুল বেইজড’ সিস্টেমে ম্যাপিং করে দিলে অ্যালগরিদম সেই কাজটা অনায়াসে এবং আরও ভালোভাবে করতে পারবে।

এখানে মানুষের যে ‘বায়াস’ সেটা কাজ করবে না বলে পূর্ণ স্বচ্ছতা আসবে। আমাদের ভয় হতে পারে পুরো জিনিসটাকে যন্ত্রের ওপর ছেড়ে দিতে, তবে সেটা দেখার জন্য কয়েকটা পাইলট করলেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। শেষে মানুষ অনুমোদন দেবে তবে অ্যালগরিদমের আউটপুট না পাল্টে। ভুল হবার কারণ নেই। কারণ, মানুষ বানিয়েছে রুলসেটগুলো।

অনলাইনে টানতে কিছু শতাংশ ভর্তুকি কাজ করেছে সব দেশে

সেবার ভেতরের গল্প

Innovative governments have realised that a citizen should not have to know the internal workings of complex bureaucracies to obtain the services they require.

—Mass or personalised services: Embracing Innovation in Government Global Trends

কেনাকাটার প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সহজীকরণ করার পূর্বশর্ত হিসেবে এখানে কীভাবে একটা সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান তাদের জিনিসপত্র কিনছে, সেটাকে ফ্লোচার্টে ফেলে কার কোথায় অনুমোদন প্রয়োজন সে জিনিসটাকে রুলসেটে পরিবর্তন করলে এই সিদ্ধান্তে মানুষের স্পর্শ অনেক কমে আসবে। এর পাশাপাশি জনগণকে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে সবকিছু করার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে চাইলে যেই সার্ভিসটির দাম সাধারণভাবে ১০০ টাকা ধরা হলে সেটাকে কয়েক শতাংশ কমিয়ে ৯৭ টাকা করা যেতে পারে অনলাইনে সেবাটা দেবার সময়।

সরকারের প্রচুর অফিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেশজুড়ে, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অনেক বেশি। সেদিক থেকে প্রায় সবকিছুই অনলাইনে নিয়ে এলে দেশজুড়ে সেই অফিসগুলো লাগছে না ধীরে ধীরে। সেই খরচটাকে দেওয়া যায় ভর্তুকি হিসেবে সবাইকে অনলাইনে টানার জন্য। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর এভাবেই সবাইকে নিয়ে এসেছে সরকারি একটা মাথায়। সরকারের একটা মাথা, হতে পারে সেটা একটা পোর্টাল, কলসেন্টার অথবা চিঠির মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ। প্রতিটা যোগাযোগ রেকর্ডেড, যাতে ট্র্যাক করতে পারে সরকার ও জনগণ।

সেবা সহজীকরণ দৃষ্টান্ত (টিসিভি, টাইম, কস্ট, ভিজিট) কমিয়ে আনা ইতিমধ্যে এই 'ইলেকট্রনিক গভার্নেন্স প্রকিউরমেন্ট' একধরনের সংশোধনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলেও সেটাকে আরও স্বচ্ছ এবং সহজীকরণ করার জন্য ইন্টারনেটে গণশুনানি করা যেতে পারে। এ ধরনের অনেক গণশুনানি করেছিলাম বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অফিসে থাকাকালীন। বিষয়টা অনেক স্বচ্ছ, কারণ এখানে পুরো পদ্ধতির পক্ষে ও

বিপক্ষে সবার মতামত নিয়ে সেগুলোকে ওয়েবসাইটে রাখা হয়। ফলে এ ধরনের গণশুনানির শেষে ভালো আউটকামগুলো বের হয়ে আসে।

এই পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম (পিপিআর) প্রোগ্রামের আওতায় এই সম্পূর্ণ ই-জিপি সলিউশনটাকে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে আসছে। ব্যাপারটাকে সব সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক করা হলে এখানে আরও অনেক সংশোধনী আসবে বলে আশা করা যায়। এখানে বিদ্যমান যে ধরনের নীতিমালা আছে, সেই নীতিমালাকে আরও সংশোধন করা সম্ভব যখন এটাকে সফটওয়্যারের প্রসেস-ফ্লো'র ধারণা থেকে দেখা হবে। সেটাই উদ্ভাবনা। আগে অ্যানালগ পদ্ধতিতে যেকোনো কেনাকাটার প্রক্রিয়া দশটা টেবিল ঘুরলে সে ব্যাপারটিকে বর্তমান প্রশাসন গণশুনানি মাধ্যমে সফটওয়্যার ধারণা থেকে অনেক প্রক্রিয়া কমিয়ে আনা সম্ভব।

সরকারের এই সেবা সহজীকরণ দৃষ্টান্তের মধ্যে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে জনগণের সুবিধার্থে (টিসিভি, টাইম, কস্ট, ভিজিট) কত অল্প সময়ের মধ্যে সার্ভিসটা ডেলিভারি দেওয়া যাবে, কত কম খরচে দেওয়া সম্ভব এবং কত কম সেবাগ্রহীতা সেই অফিসে আসতে হবে, সেগুলোকে সেবা সহজীকরণ দৃষ্টান্তের মতো করে তৈরি করলে পুরো প্রসেসের জন্য দুপক্ষের কাজের মধ্যে ‘অপটিমাইজেশন’ চলে আসবে। তবে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মটিতে দরদাতাদের/দরপত্রদাতাদের সমান প্রবেশাধিকার বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

প্রান্তিক পর্যায়ে দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা কমবে

এই সংশোধনী ক্রয় প্রক্রিয়াতে একজন যিনি সরকারি সংস্থায় কোনো কিছু সরবরাহ করবেন, তাদের প্রক্রিয়া এবং সরকারের ভেতরে যারা এই ক্রয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বাছাই করবেন, এ সবকিছু যে ফ্লোচার্টের মাধ্যমে হবে, সেগুলোকে সরকার এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে ওয়েবসাইটে গণশুনানি করা যেতে পারে। এতে একেকটা টেবিলে যতটুকু স্বচ্ছতার প্রয়োজন, তার পাশাপাশি সরকার সর্বনিম্ন দামে সঠিক দ্রব্যাদি পেতে পারে। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এ ধরনের প্রক্রিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলছে বলে অন্য দেশের কিছু ‘বেস্ট প্রাকটিস’ আমাদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নেওয়া যায়। ‘রুল বেইজড’ প্রক্রিয়াতে মানুষের যে সময়, খরচ এবং

সেই অফিসে যাওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়া সেগুলোকে কমিয়ে আনতে পারে খুব সহজেই। ভবিষ্যতে প্রান্তিক লেভেলের সরকারি অফিসগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে এই ধরনের অটোমেশনের প্রভাবে। এই জিনিসটাই ঘটেছে পুরো পৃথিবীতে। এখানে সরকারি প্রচুর টাকা বেঁচে যাবে যার বেশির ভাগই যাবে সামাজিক নিরাপত্তা হিসেব বিবরণীতে।

গ. অ্যাডাপ্টিভ অর্থাৎ অভিযোজিত উদ্ভাবনা

আমাদের এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য অভিযোজিত উদ্ভাবন ছাড়া গতি নেই। সে কারণে আমাদের নতুন পরিবেশ পরীক্ষা করে নতুন পদ্ধতি বের করার নাম হচ্ছে অ্যাডাপ্টিভ অর্থাৎ অভিযোজিত উদ্ভাবনা। সত্যি বলতে মানুষ যে জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, সেটার নাম হচ্ছে পরিবর্তন। আর এ কারণেই ‘চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট’ বলে আলাদা একটা বিষয় খোলা হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশেষ করে জানতে, কীভাবে পরিবর্তনকে ‘ম্যানেজ’ করতে হয়।

মানুষের স্বার্থে নীতিমালা

Internal regulations, procedures and structures – and the behaviours they generate – may inhibit innovation in the public sector. Innovative governments are finding ways to overcome these barriers by using approaches ranging from problem-oriented innovation teams to crossgovernment innovation networks, and from user-centred design to fostering the free-flow of data and information across and beyond the public sector.

—Overcoming bureaucratic barriers, Embracing Innovation in Government Global Trends

সেভাবে আমাদের আশেপাশে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেলেও সরকারি নীতিমালাগুলো যখন সেই পরিবর্তনকে ‘অভিযোজন’ বা ‘অ্যাডাপটেশন’ করতে পারে না বা করতে দেরি করে, তখন সেখানে প্রশাসন উদ্ভাবনা হারায়। আমি যখন প্রতিবছর সঞ্চয়পত্র কিনি, তখন জাতীয় পরিচয়পত্র, ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বরের ফটোকপি এবং ব্যাংক কর্তৃক সঞ্চয়পত্রের আবেদন পূরণ করে জমা দিতে হয়। এখন যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং রাজস্ব বোর্ডের ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বরের ডেটাবেইসের সঙ্গে সরাসরি ‘অ্যাপ্লিকেশন

প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস’ দিয়ে যুক্ত আছে, সে কারণে আবেদনপত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর এবং ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর জুড়ে দিলেই কাজটা হয়ে যাওয়ার কথা।

তবে, ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে আবেদনপত্রের সঙ্গে ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি জমা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে যে ব্যাপারটা ঘটেছে যে ব্যাংক আগের মতো করেই আবেদনপত্র রাখছে ফটোকপিসহ অথচ এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দুটো ডেটাসেটের সঙ্গে সরাসরি অনলাইনে যুক্ত হয়ে পদ্ধতিগতভাবে সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে রয়েছে।

এর পাশাপাশি সঞ্চয়পত্র অধিদপ্তর যেখানে একটি ‘ইউনিফাইড’ আবেদনপত্র তাদের ওয়েবসাইটে রেখে দিয়েছে, সেই ফরম পূরণ করে ব্যাংকে আবেদন করলে ব্যাংক তাদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে বলে। এর অর্থ হচ্ছে, যিনি নীতিমালা বানিয়ে একটা ফরম তৈরি করে দিয়েছেন আর যারা ফরমটাকে ব্যবহার করবেন, এই দুই পক্ষের মধ্যে কোনো এক পক্ষ ‘অভিযোজিত’ হননি।

এর পাশাপাশি আবেদনপত্রে দেওয়া এ দুটো তথ্যের জন্য ফটোকপি দুটো বাহুল্য হিসেবে কাজ করেছে। যেহেতু যিনি সঞ্চয়পত্রটি ইস্যু করছেন, তিনি আবেদনপত্রের লিখিত তথ্য দিয়ে যাচাই করে নিতে পারার কথা। কারণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিস্টেম দুটো ডেটাসেটে সরাসরি যুক্ত। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন পদ্ধতি তৈরি করেছে, তবে ব্যাংকগুলো সেই উদ্ভাবনায় অভিযোজিত হতে পারেনি। অর্থাৎ, ব্যাংকগুলো সেই পরিবর্তনকে অ্যাডাপ্ট করতে পারেনি।

এই উদাহরণটা সব ব্যাংকের জন্য পুরোপুরি ঠিক না হলেও এ ধরনের অনেক অসংগতি আছে পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে। সরকারি অনেক সিস্টেম অনলাইনে যুক্ত হয়ে নতুন উদ্ভাবনা নিয়ে এসেছে, তবে কাগজের নথিপত্র ও ফটোকপি জমা দেবার ব্যাপারে কিছু কিছু সংস্থার শাখাগুলো সেই উদ্ভাবনার সঙ্গে অভিযোজিত হতে পারেনি। আমার এই উদাহরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের এ ধরনের অনেক উদ্ভাবনা হবার পরও প্রশাসনের মাঠকর্মীরা সেভাবে অভিযোজিত হতে পারেননি। সে কারণে

প্রত্যাশিত উদ্ভাবনগুলো ‘অনুসন্ধানী’ ধারণায় কাজ করলে ভবিষ্যতের সব প্রতিশ্রুতিগুলো ভালো আকার দিতে পারে।

ঘ. অ্যান্টিসিপেটরি অর্থাৎ প্রত্যাশিত উদ্ভাবন, সামনে কী হতে পারে?

হাজারো চোখ

Algorithms are developed to automatically detect situations that require government action, ranging from inappropriate behaviour in the street, key words on social media, traffic congestion or increased use of an online government service.

—Human and machine: pairing human knowledge with innovative tools, OECD Docs

এই ধরনের উদ্ভাবনা ডেটার ভবিষ্যৎ দেখার সঙ্গে মিলে যায়। কারণ, সামনে কি ঘটবে সেটা ধারণা করে নীতিমালা তৈরিতে নতুন নতুন উদ্ভাবনা নিয়ে আসা যায়। ধরা যাক বেসরকারি খাতে যেসব নতুন নতুন উদ্ভাবনা সামনে ঘটবে, সেটাকে ‘প্রত্যাশিত’ অথবা আগে থেকে ধারণা করে (অন্য দেশ থেকেও দেখা যেতে পারে) সেটার জন্য নীতিমালায় উদ্ভাবনা আনতে পারে সরকার। আমাদের সামনে কী কী ঘটতে পারে অথবা সামনে কী কী সমস্যা আমাদের বিপদে ফেলতে পারে সে ধরনের রিসার্চ করে সেই সমস্যাগুলোকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, সে ধরনের উদ্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে যেকোনো দেশের সরকার।

এখন যেভাবে ‘ব্লকচেইন’ প্রযুক্তি পুরো পৃথিবীতে নতুন আশা দেখাচ্ছে, সেখানে আমরা এই প্রযুক্তির কিছু অবৈধ ব্যবহার দেখে এই নতুন প্রযুক্তিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করি তাহলে দেশের এই ব্লকচেইন-ভিত্তিক নতুন নতুন উদ্যোক্তা সেই রাস্তায় হাঁটার সাহস করবে না। অথচ, এই এখনকার বাস্তবতাভিত্তিক ‘ডিস্ট্রিবিউটর লেজার’ প্রযুক্তি দিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে অর্থনৈতিক খাতে বিশেষ করে ‘ফিনটেক’ অর্থাৎ ‘ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলজি’ সেখানে প্রচুর উদ্ভাবনা চলে এসেছে। নতুন প্রযুক্তির ব্যাপারে অবশ্যই আমরা সাবধানে থাকব, তবে তার মানে এই নয় যে তাকে অবৈধ ঘোষণা করতে হবে। প্রতিটা প্রযুক্তির ভালো ও খারাপ দিক রয়েছে। অনলাইন জুয়া সব সময় ছিল এবং সামনেও থাকবে। একে কমিয়ে আনার জন্য দরকার সামাজিক সচেতনতা। প্রযুক্তিকে বন্ধ করে নয়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কোনো প্রযুক্তিকে লম্বা সময়ের জন্য বন্ধ করা যায় না।

আমরা দেখছিলাম ‘শেয়ারিং ইকোনমি’র জোয়ারে উবার অনেক দেশেই তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। এখানে আমার প্রস্তাবনা ছিল, উবার বাংলাদেশে আসার আগেই আমাদের একটা খসড়া নীতিমালা তৈরি করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা উচিত ছিল। এটা সাহায্য করত আমাদের ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তাদের, যারা উবারের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারত। হয়তোবা একটা গ্লোবাল কোম্পানি মিলিয়ন ডলার দিয়ে তাদের কেনার চিন্তা করত। এ ধরনের কাজ করেছিলাম আমি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে বসে। যেহেতু, আমরা গ্লোবাল ট্রেন্ডে উবারকে দেখছিলাম বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে, তখনকার একটা খসড়া নীতিমালা অনেক সমস্যাই কাটাত।

শুরুতে সেই খসড়া নীতিমালা তৈরি করে গণশুনানির জন্য ওয়েবসাইটে রাখলে সেখানে যারা ভবিষ্যৎ কোম্পানি হিসেবে বাংলাদেশে (দেশীয় উদ্যোক্তাসহ) আসত তারা, তখন একটা ব্যবসায়িক ধারণা তৈরি করতে পারত। কিছু বিষয়ে মতের মিল না হলে সে ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে বসার একটা খসড়া ডকুমেন্ট সব সময় থাকা উচিত। এটাই অ্যান্টিসিপেটরি উদ্ভাবনা। যে কারণে এ ধরনের অ্যান্টিসিপেটরি উদ্ভাবনা দরকার, যখন নতুন ধরনের উদ্ভাবনা আমাদের দেশে এখনো আসেনি। তবে, আমরা সেটাকে ধারণা অর্থাৎ ‘অ্যান্টিসিপেট’ করে সেই উদ্ভাবনাকে নীতিমালায় নিয়ে আসার জন্য আরেকটা উদ্ভাবনা করা যায় সরকারের পক্ষ থেকে।

এখন আসি আসল ‘প্রসেস-ফ্লো’-এর প্রস্তাবনায়। যার অনেকটাই এসেছে আমার ৩০ বছর সরকারে থাকার ধারণায়।

ডিজিটাল প্রসেস-ফ্লো এবং অ্যানালগ কর্মপন্থা

কাগুজে ডকুমেন্ট ও সফটওয়্যার

১৯৯২-৯৪ সালের কথা। পোস্টিং তখন সৈয়দপুরে। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে আইবিএমের একটা কম্পিউটার ছিল আমার অফিস এবং অবসরের সঙ্গী। মাইক্রোসফট ডসের ওপর ওয়ার্ড পারফেক্ট এবং লোটাস ১২৩-এর ম্যানুয়ালগুলো পড়তে ভালোই লাগত সন্ধ্যায়। ব্রিগেড সিগন্যাল কোম্পানির (যোগাযোগ দেবার একটা ইউনিট) কোম্পানি অফিসার, অটোমেশনে খুব ঝাঁক।

সেনাবাহিনীতে গাড়ি-ঘোড়া যাতে অপব্যবহার কম এবং সঠিক মেইনটেন্যান্স হয় তার জন্য বেশ কয়েকটা ডকুমেন্ট মাসিক ভিত্তিতে পূরণ করতে হতো। এই ডকুমেন্টগুলোকে চেক করার জন্য বসলে বেশ কমপ্লেক্স মনে হতো শুরুতে। হাজারো জিনিসের ফিরিস্তি। গাড়ির মাইলোমিটারের পাশাপাশি গাড়ির অন্যান্য লুব্রিকেন্টসহ গাড়ি প্রতিদিন কত মাইল চলেছে, ওয়ার্কশপের নির্ধারিত ‘মাইল পার লিটার’, কখন গাড়ি বের হয়েছে বা গ্যারেজে ফিরেছে এ সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব থাকত এই ‘ভিডিআরএ’ অর্থাৎ ‘ভেহিকেল ডেইলি রানিং অ্যাকাউন্ট’ বলে একটা মোটাতাজা বই এবং আরও কয়েকটা কানেক্টেড ডকুমেন্ট দিয়ে।

ইন্টেলেকচুয়াল ডিসট্যান্স

The design process should reduce the gap between real-world problems and software solutions for that problem meaning it should simply minimize intellectual distance.

—Minimize Intellectual distance, Principles of Software Design, GeeksforGeeks

সাধারণ যেকোনো কাগজে ডকুমেন্টের মতো প্রতিটা পাতার গাড়ির হিসেবের একটা যোগফল অথবা কম্পাইলেশন টেনে নিয়ে যেতে হতো আরও অন্যান্য পাতায়। অ্যানালগ মানে কাগজে ধারণায় এটাই স্বাভাবিক; কারণ হিসেব মেলাতে এই পাতার যোগফল যোগ হতো আরও অন্যান্য পাতায়, যার ফলাফল আবার যোগ-বিয়োগ হয়ে চলে যেত শেষের সামারি পাতায়। অর্থাৎ প্রতিটা পাতার সঙ্গে লিংক করা ছিল তার পরের পাতা এবং সেই লিংকগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো সর্বশেষ সামারি পাতায়।

এর মানে হচ্ছে, একই জিনিস লিখতে হতো বেশ কয়েক জায়গায় কাগজের ডকুমেন্ট হিসেবে। লোটারাস ১২৩-এর কাজের ধারা দেখে মাথায় ভূত চাপল এই ডকুমেন্টকে স্প্রেডশিটে নেওয়া যায় কি না? একটা অ্যানালগ অর্থাৎ কাগজের ডকুমেন্ট থেকে স্প্রেডশিটে হুবহু তুলতে গিয়ে ধারণা পেলাম কয়েকটা জিনিস। সেটাই পাল্টে দিয়েছে অটোমেশন সম্বন্ধে আমার ধারণা, জীবনের শুরুতে।

কাগুজে ডকুমেন্ট এবং ওয়ার্ক-ফ্লো

১. কাগজের ডকুমেন্টকে সফটওয়্যারে ছুবুহু মানে সরাসরি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, কাগজের ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে ওই সময়ের চিন্তাধারণার সীমাবদ্ধতার কথা লক্ষ্য করে। কাগজ মানে অ্যানালগ, সেটাতে সীমাবদ্ধতা অনেক বলেই সেটা কাগজ। কাগজ কখনোই সফটওয়্যার হবে না।
২. সফটওয়্যারের দক্ষতা সেখানেই, যা মানুষের কাগজের ধারণা থেকে সফটওয়্যারে নেবার সময় অনেক বাড়তি ‘বাহুল্য’ প্রসেস গায়েব অর্থাৎ ‘এলিমিনেট’ করে দেয়। এটা অন্য ধরনের ডিজাইন থিংকিং। যেটা সবাই ধরতে পারেন না। ফাইনালি কী আসবে সেটাই বিবেচ্য, মধ্যের ধারণা মানে কাজ কীভাবে হচ্ছে, সেটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। সেটা কাগজের কাজ।
৩. কাগজে যেভাবে প্রতিটা পাতার সঙ্গে লিংক করতে গিয়ে একই তথ্য অনেকবার লিখতে হয় সম্পর্কিত জায়গায়। এ ব্যাপারটা সফটওয়্যারে নিষ্পয়োজন, তবে ম্যানেজমেন্টের নীতিনির্ধারকদের জন্য কাগজের পৃষ্ঠার সংখ্যার সঙ্গে অনেক সময়ে সফটওয়্যার ট্যাবের একটা সিমুলেশন মানে সম্পর্ক তৈরি করি। তবে সেটা একটা মাইগ্রেশন স্ট্র্যাটেজি হতে পারে, দীর্ঘস্থায়ী সলিউশন নয়।

এর অর্থ হচ্ছে আমরা সনাতন ডকুমেন্টের প্রসেসকে ডিজিটাল করতে গেলে সেটার ডিজিটাল প্রসেসের ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কারণ, কাগজের প্রসেসের চিন্তাধারণা এবং ডিজিটাল প্রসেসিং চিন্তাভাবনা দুটো দুই মেরুর জিনিস। সেটা ডিজাইনে বোঝা যায়। মানুষের বোঝার সুবিধার্থে একটা মধ্যপন্থা ধরে স্বল্প সময়ের জন্য একটা মাইগ্রেশন স্ট্র্যাটেজি নেওয়া যেতে পারে। তবে, সফটওয়্যারের ইন্টারনাল ডিজাইন ছেড়ে দেওয়া উচিত সফটওয়্যার আর্কিটেক্টের ওপর, যিনি পুরো অ্যানালগ প্রসেসটা বুঝেছেন।

ডিজাইন ‘থিংকিং’ অর্থাৎ চিন্তাভাবনা প্রসেস

বাইরের চিন্তা

Design thinking takes the next step, which is to put these tools into the hands of people who may have never thought of themselves as designers and apply them to a vastly greater range of problems.

—Change by Design, Tim Brown

এই প্রসেসে ব্যবহারকারী অথবা কাস্টমার হিসেবে আমরা শেষ পর্যায়ে কী আশা করছি সেটা বলে দিলেই হলো। ‘ইন্টারমিডিয়েট’ অথবা মাঝখানে

কী হবে সে ব্যাপারে ডিজাইনারকে ‘ডিকটেট’ করলে তার ‘অপটিমাল ডিজাইন প্রসেস’ ব্যাহত হয়। আমরা সর্বশেষে কী পাব অর্থাৎ আমরা সফটওয়্যার থেকে কী আশা করছি, সেটা নিয়ে কাজ করলে সেখান থেকে ‘ব্যাক ক্যালকুলেশন’ করে অনেক কিছুই পাওয়া সম্ভব, তবে আমাদের চিন্তাধারণার সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে কাগজের ফরম্যাট সরাসরি সফটওয়্যারে নেবার যৌক্তিকতা নেই। বোঝার জন্য ডিজাইন চিন্তাভাবনা একটা নন-লিনিয়ার, আইটেরেটিভ অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া, যা ব্যবহারকারীদের বোঝার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি। এটা ব্যবহার করা যেতে পারে— ১. অনুমানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে, ২. সমস্যাগুলোকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে এবং ৩. প্রোটোটাইপ, পরীক্ষার উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করতে। যে সমস্যাগুলো ঠিকমতো সংজ্ঞায়িত করা নেই অথবা অজানা; সেগুলোকে ঠিক করতে এটা সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এটাই লাগবে আমাদের, যখন কাগজে ডকুমেন্ট থেকে সফটওয়্যারে আসব।

সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ এবং প্রসেস ম্যাপ তৈরি

বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং

‘Business Process Re-engineering’ is the fundamental rethinking and radical redesign of business process to achieve dramatic improvement in critical, contemporary measures of performance such as cost, quality, service and speed.

—Hammer & Champy: p.32, 1993

‘রুল বেইজড’ সিস্টেম তৈরির আগে কী দরকার?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বশর্ত হিসেবে আমাদের প্রয়োজন ‘রুল বেইজড’ সিস্টেম। ব্যাপারটা এমন, এটা হলে ওটা হবে, প্রোগ্রামিংয়ের ‘ইফ, দেন, এলস’-এর মতো। মানুষের বানানো ‘রুল বেইজড’ সিস্টেম যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অথবা বাছাইয়ে মানুষের কোনো স্পর্শ থাকবে না। তবে একটা কার্যকর ‘রুল বেইজড’ সিস্টেম তৈরির আগে প্রয়োজন কাগজে বিদ্যমান পদ্ধতির সহজীকরণ প্রক্রিয়া। সেখানে কোথায় আছি আমরা?

জনগণের জন্য সরকারি সব সেবাগুলোকে ‘সহজীকরণ’ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেটার বাস্তবায়নে যে দীর্ঘসূত্রতা এবং তার ফলে যে দুর্নীতি হয়, সেটা থেকে বের হবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন স্তরগুলোকে কমিয়ে নিয়ে আসার কাজ চলছে।

এর পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং জনগণের সরকারি দপ্তরে যাওয়ার পর যত হয়রানি হয়, সেগুলোকে বন্ধ করার জন্য ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতির উন্নতিসাধন— বিশেষ ক্ষেত্রে যখন যেখানে প্রয়োজন তার জন্য আইন এবং পদ্ধতির পরিবর্তন— এর একটা বড় কাজ। আইন তো বাইবেল নয় যে মানুষের সুবিধার জন্য সেটা পাল্টানো যাবে না। এর পাশাপাশি লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কার সঙ্গে যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধনের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো এই অংশের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ প্রসেস ম্যাপ বিশ্লেষণ

২০১৪ সালের সচিবালয় নির্দেশমালায় ২৬০ নম্বর নির্দেশনায় নাগরিক এবং সেবা গ্রহণকারীদের সব সেবার পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে সহজ ও সেবা প্রদানের বিভিন্ন মাপকাঠির একটা সহজীকরণ প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে বলে সেটার নির্দেশনা দেখেছি আমরা। এর সঙ্গে ২০১৫ সালে সেবা-গ্রহিতার ভোগান্তি কমানোর জন্য এবং এর সঙ্গে সব ধরনের সেবাগুলোকে সহজীকরণের জন্য বেশ কয়েকটি নির্দেশনা আছে। সরকারি কয়েকটা প্রজ্ঞাপনে দেখা যায় যে নাগরিক সেবা সহজীকরণ এবং জনবান্ধব সরকারি সেবাপ্রত্যাশীদের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছানোর জন্য সব ধরনের সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের জন্য অনেক উদ্যোগ এ মুহূর্তে দৃষ্টান্তমূলক হিসেবে ডকুমেন্টেশন করা হয়েছে।

তবে সে ব্যাপারে সেবাপ্রদানকারী সরকারের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, তাদের সেবাগুলোকে ঠিকমতো শনাক্ত করে সেই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণ এবং সরকারি পর্যায়ে কী কী ধরনের সমস্যা আছে, সেগুলোকে চিহ্নিত করতে হচ্ছে আগে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে যে কাণ্ডজে কর্মপদ্ধতি আছে, সেগুলোর সমস্যাগুলোকে না বুঝে বর্তমান অর্থাৎ বিদ্যমান পদ্ধতিতে হঠাৎ করে ‘সহজীকরণ’ কাজ করতে গেলে সেটার ফলাফল ভালো আসে না। এই বিদ্যমান পদ্ধতিকে আমরা বলছি ‘অ্যাজ ইজ’।

প্রসেস-ফ্লো নিয়ে কাজ

যেখানে কার্যকর এবং নাগরিকবান্ধব সেবা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য বর্তমানে যেই ধাপগুলো নিয়ে সংস্থাগুলো কাজ করছে, সেটার ‘ফ্লো-চার্ট’ দিয়ে ভেতরের বিশ্লেষণ না করলে অ্যানালগ পদ্ধতির সমস্যাগুলোকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কনভার্ট করলেও সমস্যাগুলো দূর হবে না। সেখানে যেই ‘ওয়ার্ক-ফ্লো’ নিয়ে কাজ করা দরকার, সেই প্রসেস ম্যাপ নিয়ে কাজ শুরু করেছে সরকারের বেশ কয়েকটি সংস্থা।

সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়ায় আগে কতগুলো ধাপ ছিল এবং বর্তমানে কতগুলো ধাপ নিদেনপক্ষে প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে পুরো ব্যাপারটিকে ডিজিটালি অর্থাৎ সফটওয়্যারে মাইগ্রেট করলে কতগুলো ধাপ কমিয়ে আনা যাবে, সেটার একটা প্রমিত পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে বর্তমান পদ্ধতিতে। এরপরে আসবে রুল-বেইজড সিস্টেম, সেখানে মানুষ আস্তে আস্তে বের হয়ে যাবে সিদ্ধান্তের ‘লুপ’ থেকে।

সেবা সহজীকরণ ম্যানুয়াল^{১৬}

এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে এই সহজীকরণ উদ্যোগের প্রাথমিক পর্যায়ের অংশ হিসেবে একটা ভালো ডকুমেন্টেশন তৈরি হয়েছে। সেই ডকুমেন্টেশন অনুযায়ী, বিশেষ করে তার কিছু তাত্ত্বিক অংশ রয়েছে, যেখানে বেশ কয়েকটা ধাপের কথা বলা হয়েছে। যেমন ১. নাগরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলোকে ঠিকমতো চিহ্নিতকরণ, ২. বর্তমানে যে সেবা পদ্ধতিগুলো চলমান আছে, সেগুলোর সঠিক বিশ্লেষণ, ৩. এর পাশাপাশি প্রস্তাবিত পদ্ধতির জন্য নতুন ডিজাইন, ৪. বর্তমান ও প্রস্তাবিত নতুন পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ যেখানে জনগণ এবং সরকারের সময়, খরচ ও সরকারি দপ্তরে যত কম ‘ভিজিট’ অর্থাৎ আসতে হবে, ৫. দুটো পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করে তার সুপারিশ প্রণয়ন, ৬. সেই সুপারিশমালা অনুযায়ী যথাযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শেষে ৬. সেটার বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরি।

১৬. সেবা সহজীকরণ ম্যানুয়াল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আমার দেখা একটা ‘অসাধারণ’ ম্যানুয়াল, সাহায্য নেওয়া হয়েছে এই চ্যাপ্টার লিখতে। আমি ধারণা করছি, সেটা আরও পরিমার্জন হবে সামনের ‘রুল-বেইজড’ পদ্ধতির সঙ্গে কাজ করতে।

বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তৈরি সেবা ‘সহজীকরণ’ ম্যানুয়ালে সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের বেশ কিছু ধারণা দেওয়া আছে। এর একটা বড় অংশ এসেছে ব্যবসায়িক পৃথিবী থেকে। বিশেষ করে দক্ষতার ‘পার্সপেক্টিভ’ থেকে। সেখানে, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ বলতে গ্রাহকের সন্তুষ্টি বিধান, তার প্রক্রিয়ার খরচ কমানো এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিযোগীদের সঙ্গে টিকে থাকার ধারণায় পৃথিবীর বেসরকারি সংস্থাগুলো অনেক আগে থেকেই ‘বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং’ ব্যবহার করছে। ‘ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি’ অর্থাৎ এমআইটির অধ্যাপক মাইকেল হ্যামার এই ‘বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং’ নিয়ে প্রথম কথা বলা শুরু করেন।

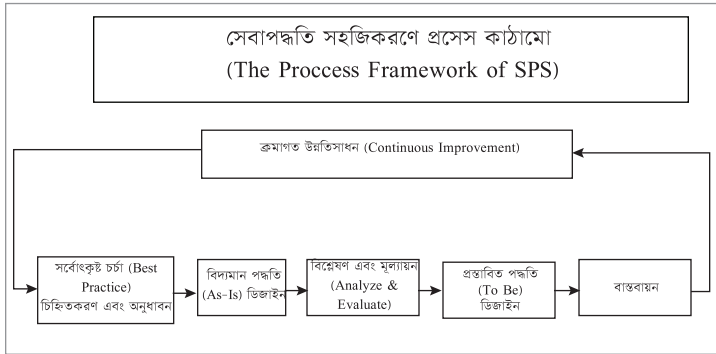
তার যুক্তি ছিল, বেশির ভাগ জায়গায় বিশেষ করে আমরা যেভাবে কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন ধাপে যে কাজগুলো করি, তার একটা বড় অংশ গ্রাহক পর্যায়ে কোনো ধরনের ভ্যালু আনে না। সেই জায়গার ‘বাহুল্য’ ধাপগুলোকে অটোমেশনে না নিয়ে এসে সরাসরি বাদ দেবার বিভিন্ন যৌক্তিকতা বলেছেন তার রিসার্চ পেপারে। যেহেতু বেসরকারি খাতে এই ‘বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং’ অনেক সুফল দিয়েছে, সে কারণে বর্তমান প্রশাসন বাংলাদেশের জন্য এই সেবা পদ্ধতি সহজীকরণকে ‘সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন’ অর্থাৎ ‘এসপিএস’ হিসেবে ব্যবহার করছে।

সরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে এই সেবা প্রদানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সঙ্গে বসে সেই কাজগুলোর ‘ফ্লো-চার্ট’ নিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করে, এর মধ্যে কোন ধাপ অথবা নিয়ম এবং এর সঙ্গে বিদ্যমান চর্চাগুলোকে (প্র্যাকটিস) বের করে তার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ধাপগুলোকে কীভাবে কমিয়ে আনা যায়, সেটাই আলাপ করছি এখানে।

সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন (এসপিএস)

এর সঙ্গে সরকার যতগুলো সেবা ‘সহজীকরণ’ করার জন্য প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, সেগুলোর বর্তমান বাস্তব এবং সামনের সম্ভাব্য সমস্যা, কোথায় কোথায় প্রতিবন্ধকতা হতে পারে— সেটাকে খুঁজে বের করা, পদ্ধতিগতভাবে কোনো ব্যাপারটাকে কমিয়ে সেবার বিদ্যমান পদ্ধতিতে

‘আপগেড’ করে তার মানোন্নয়নে কার্যকরী পদ্ধতি বের করার এই সেবা পদ্ধতিকে ‘সেবা সহজীকরণ’ অথবা ‘সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন’ বলা যেতে পারে। এখানে তার একটা ছবি দিলে ব্যাপারটা আরও সহজ মনে হবে।



চিত্র ৫: সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশনের ধাপ^{১৭}

সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের প্রসেস ফ্রেমওয়ার্ক

আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সরকারি কাজের সব ধরনের অটোমেশনের ব্যর্থ উদাহরণগুলো দেখে কেন এগুলোর শুরুতে বর্তমান সেবা পদ্ধতিগুলোর সহজীকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো কাজ করেনি সেগুলো জানলে আমাদের এগোনো সুবিধার হবে। যেকোনো সেবা পদ্ধতিকে সহজীকরণ করতে গেলে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখানে আলাপ করতে পারি। বর্তমান সেবা পদ্ধতির অবস্থা এবং সামনে আমরা কোথায় যেতে চাই সেই ‘রুল বেইজড’ অ্যালগরিদম ব্যবহার করার পদ্ধতি পর্যন্ত জানা জরুরি।

সেবা পদ্ধতি সহজীকরণে বেশ কয়েকটা ধারণা আপনাদের কাজে লাগতে পারে। আপনারা যারা সরকারি দপ্তরে গিয়ে বিভিন্ন সেবা নিয়েছেন, সেটার ধারণা থেকে কয়েকটা ব্যাপার আলাপ করা যায়। নিচের ধাপগুলো দেখুন।

১৭. সেবা সহজীকরণ ম্যানুয়াল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক. অনেকগুলো ধাপকে এক জায়গায় নিয়ে আসা

আমরা যখন একটা বিদ্যমান প্রসেস-ফ্লোকে ঠিকমতো বিশ্লেষণ করি, তখন দেখা যায় যে অনেক ছোট ছোট কাজকে এক জায়গায় এনে কয়েকটা ধাপ এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা কমানো যায়। এতে মূল বিষয়টি ঠিক থাকে এবং সর্বশেষ ধাপ শেষে একজন সেবাগ্রহীতা তার ফলাফল পেয়ে যান।

খ. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ক্ষমতায়ন

সেবা গ্রহীতাদের প্রতিটি আবেদনপত্র শীর্ষ কর্মকর্তার কাছে না প্রেরণ করে বিভিন্ন সেবার গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ক্ষমতায়ন করতে হবে। এতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানো সম্ভব এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করে সেবা দ্রুত দেওয়া যায়। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি বেশ কিছু সংস্থায় এই ব্যাপারটি অনেকটা নির্ভর করে সংস্থাটির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকের ওপরে।

অনেক সংস্থায় নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যারা আছেন, তারা পুরো সংস্থার সব খোঁজখবর রাখতে চান, ফলে প্রতিটা চিঠি এবং আবেদনপত্র সরাসরি সর্বোচ্চ পদের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। এক্ষেত্রে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনে কোন কোন সেবা কোন পর্যায়ের কর্মকর্তার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব, সেটাকে নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করলে এ ধরনের ক্ষমতায়ন প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা সম্ভব। এ ধরনের ক্ষমতায়ন পরিপত্রের মাধ্যমে না হলে সেটা বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করে না।

গ. সেবা-গ্রহীতার মতামত বিশ্লেষণ করা

প্রতিটি সেবার জন্য একজন সেবাগ্রহীতা কীভাবে সেবাটা পেতে চান, বিশেষ করে সেই সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দাপ্তরিকভাবে কী কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন সে ব্যাপারে গণশুনানি হলে পুরো প্রসেস ডিজাইনে সবার কাজে লাগবে। এই প্রসেস ফ্লোতে একজন সেবাগ্রহীতা কীভাবে সেই প্রসেসকে সহজীকরণের ধারণায় দেখেন সেই ব্যাপারে সেবা গ্রহীতাদের মতামত নিলে ব্যাপারটাকে আরও গ্রাহকবান্ধব করা সম্ভব।

ঘ. সেবার ধাপ নির্ভর করবে সেবা প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ক্রমানুসারে

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সব কার্যক্রম ‘একটার পর একটা’ অর্থাৎ ‘ক্রম’ অনুসারে করতে হবে- এই বিষয়টি নিরুৎসাহিত করতে হবে। বর্তমান ডিজিটাল প্রসেসে একই সঙ্গে অনেক কার্যক্রম সমান্তরালভাবে চলতে পারে। ফলে সেবাগ্রহীতার সুবিধার কথা চিন্তা করে সেই সেবা প্রদানপ্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে হবে সমান্তরালে। একই সঙ্গে অনেক আবেদনপত্র নথিতে দেওয়া যেতে পারে এক নোটে। তবে একটা নির্দিষ্টসংখ্যক আবেদনপত্র না হলে সেটাকে প্রসেস করা যাবে না, সেটাও নয়।

ঙ. সেবা প্রদানের জন্য একাধিক পদ্ধতি প্রণয়ন

এখানে সেবাগ্রহীতার চাহিদা প্রয়োজন এবং তার সুবিধার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে একই সেবা প্রদানের একাধিক পদ্ধতি বা উপায় থাকতে পারে, যাতে সেবাগ্রহীতা অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুসারে তার সুবিধা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা যায়।

চ. বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাক্ষর এবং অনুমোদনের সংখ্যা কমানো

আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক সংস্থার বিদ্যমান পদ্ধতির ‘প্রসেস ম্যাপ’ পর্যালোচনা করে দেখেছি যে অনেক ধাপে যে স্বাক্ষর এবং অনেক অনুমোদনকারীর ধাপ রাখা হয়েছে শুধুমাত্র আবেদনপত্রকে অগ্রগামী ও নিম্নগামী করার জন্য। এই পদ্ধতিতে মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি ড্যাশবোর্ড থাকলে সেখানে পুরো দপ্তরের কোথায় কীভাবে এবং তার নিজের অনুমোদনে কোন কোন আবেদনপত্রগুলো অনুমোদন হচ্ছে, সেটার একটা ভালো ধারণা পাওয়া যায়। সেখানে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কর্মকর্তাদের শুধুমাত্র স্বাক্ষর (অগ্রগামী ও নিম্নগামী করার জন্য অর্থাৎ স্বাক্ষরের জন্য স্বাক্ষর) নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনা যায়।

শুরুর দিকে সবার স্বাক্ষর এবং অনুমোদন ডিজিটাল প্রসেসে অর্থাৎ ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবহার করে শুরু করা যেতে পারে। যেহেতু সেবাগ্রহীতা সেবাপ্রাপ্তির শর্তাবলি মেনেই আবেদন করছেন, সেখানে শুধু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করার জন্য দুটো ধাপে যাচাই এবং অগ্রগামী করা যেতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে সবার ডিজিটাল সিগনেচার দিয়ে

সফটওয়্যারে অগ্রগামী করা যেতে পারে। যিনি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার অনুমোদন দিতে পারবেন না অর্থাৎ উনি অথবা উনার অনুপস্থিতিতে যিনি কাজ করছেন, তার ব্যাপারে প্রশাসন নিয়মমাফিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

ছ. আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

আমার সরকারি পর্যায়ে অনেক জাতীয় ডেটাসেটের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, প্রতিটি কাগজপত্র সত্যায়িত অথবা মূল কপি যা জমা দেওয়া হয়, সেগুলো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে খুব সহজেই জাল করা যায়। এ কারণে সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার’ অর্থাৎ ‘বিএনডিএ’ (ডেটাহাব অথবা ই-সার্ভিস বাস, ‘ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো’ ইত্যাদি যেখানে সব ধরনের ডেটাসেটগুলো নিজেদের অথোরাইজেশনের ভিত্তিতে ডেটা এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ আদান-প্রদান করতে পারে) অর্থাৎ যেখানে সব ধরনের ডেটাসেটের ‘অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস’ দিয়ে সব সংস্থা তাদের কাগজপত্রগুলো জমা নেবার সময়ই যাচাই করে নেবে অনলাইনে। একটি আবেদনপত্র তখনই প্রসেস হবে যখন প্রসেসিং সফটওয়্যার প্রতিটা সংস্থার ডেটাসেট থেকে নিশ্চিত হবে। এতে খুব বেশি রিসোর্সের প্রয়োজন পড়ে না।

ঝ. প্রয়োজনীয় সেবাকেন্দ্র স্থাপন এবং আবেদনপত্রের প্রত্যয়ন প্রদান

যে সেবাটি গ্রহণের জন্য সরাসরি একটি সেবা কেন্দ্রে (যেমন, হাসপাতাল) যেতে হবে সেখানে সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা যায়। তবে সরকারি বেশির ভাগ নিবন্ধন, সনদপত্র, পারমিট, অনাপত্তিপত্র, ছাড়পত্রগুলোর জন্য ইলেকট্রনিক্যালি একটা পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ এবং ফিরতি ইমেইল অথবা ‘এসএমএসে’ তার প্রত্যয়ন পত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এই প্রত্যয়নপত্র ব্যবহার করে একজন সেবাগ্রহীতা তার সেবার কার্যক্রম ‘ট্র্যাকিং’ করতে পারবেন।

ঞ. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতা তৈরি

সিটিজেন চার্টার এবং সংস্থাটির কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি সেবার জন্য একটি নির্দিষ্ট টাইমলাইন উল্লেখ থাকবে, যা সেবা প্রদানকারী সাক কর্মকর্তার জন্য প্রযোজ্য হবে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান করা

সম্ভব না হয় তখন নির্দিষ্ট সময়ের আগে সেবাগ্রহীতাকে জানাতে হবে তার কারণসহ।

ট. যে পদ্ধতিতে নাগরিকের প্রত্যাশা পূরণ হয় তাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া সেবা প্রদানের জন্য সেবা গ্রহণকারী অর্থাৎ নাগরিক যাতে তার প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবাটি পায়, সেই প্রক্রিয়াকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এতে একটি বিদ্যমান পদ্ধতিকে যদি মানোন্নয়ন অথবা ‘আপডেট’-এর প্রয়োজন হয়, সেটা সংস্থাপ্রদানের অনুমোদনক্রমে পদ্ধতিকে পাল্টানো যেতে পারে।

ড. সেবার সহজীকরণে পরিপত্র/আইন/বিধি/বিধানের পরিবর্তন

যেকোনো সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া চিরন্তন নয় বলে একটি সেবা দেওয়ার প্রেক্ষিতে যখন নতুন কোনো ধারণা চলে আসে, যার মাধ্যমে সেবা প্রক্রিয়াটি সহজ, বামেলামুক্ত এবং কম সময়ে দেওয়া সম্ভব, তখন সেই সেবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা পরিবর্তন করতে হবে। এর সঙ্গে তার অপ্রয়োজনীয় কাজ ধাপ অথবা যেই পুরোনো চর্চাগুলো (প্র্যাকটিস) যা এখনো রয়ে গেছে, সেগুলোকে কমিয়ে আনতে হবে।

ঢ. সেরা এবং লাইসেন্সবিহীন ওপেনসোর্স প্রযুক্তির ব্যবহার

সেবা প্রদান পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীর সেরা প্রযুক্তি, অথচ যার বাস্তবায়ন খরচ কম, সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতে হবে। আমার অভিজ্ঞতায় পৃথিবীব্যাপী এখন ওপেনসোর্স অথবা মুক্ত কোডের প্রচুর সফটওয়্যার আছে, যেগুলোকে ব্যবহার করে অনেক বড় বড় প্ল্যাটফর্ম তাদের সার্ভিস দিচ্ছে। গুগল, ফেসবুক, আমাজন থেকে শুরু করে সব বড়-ছোট কোম্পানি আস্তে আস্তে ওপেনসোর্স সফটওয়্যারে চলে আসছে।

সেখানে লাইসেন্সধারী সফটওয়্যার যা আমাদের মতো দেশে ব্যবহারের জন্য এখন প্রযোজ্য নয়। প্রচুর দেশীয় কোম্পানির দাঁড়িয়ে গেছে যারা ওপেনসোর্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাৎসরিক ভিত্তিতে সার্ভিস দিতে পারে। লাইসেন্সধারী সফটওয়্যার এবং প্ল্যাটফর্মের জন্য প্রতিবছর ‘অ্যানুয়াল মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট’র নামে যত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়, তার সিকিভাগ খরচ করে দেশীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দিয়ে একই স্কেলের সফটওয়্যার তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। আমার ৩০ বছরের সরকারি অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। সফটওয়্যারের লাইসেন্স যদি পুরো ইনভেস্টমেন্টের একটা

বিশাল অংশে চলে যায়, তাহলে সেই ইনভেস্টমেন্টে গলদ রয়েছে। আমার ভালো লাগছে এ কারণে, প্রশাসন বাংলাদেশি অনেক কোম্পানিকে দিয়ে গভর্নেন্ট ‘ইআরপি’ অর্থাৎ ‘জিআরপি’ তৈরি করেছে, যার সুফল পাচ্ছে বর্তমান প্রশাসন।

সেবা সহজীকরণের একটা সচিত্র উদাহরণ

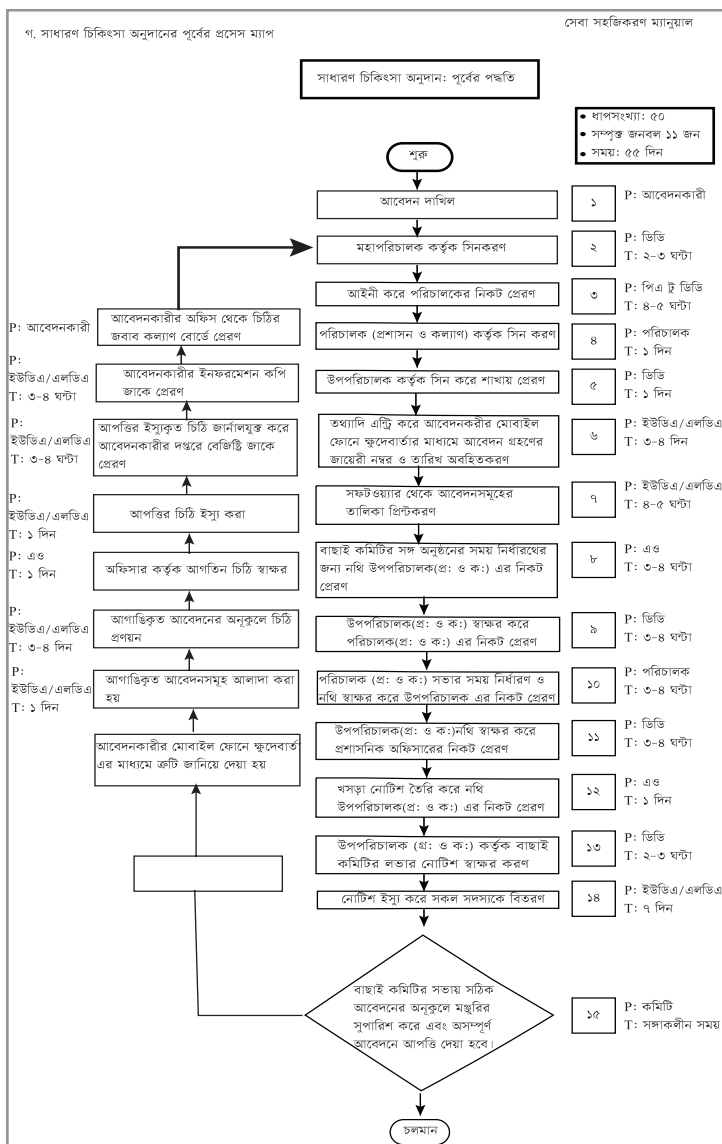
আমলাতন্ত্র এবং বুলডোজার

Bureaucracy is an obstacle to be conquered with persistence, confidence, and a bulldozer when necessary.

—Peter’s Laws #15

আমরা অনেক গল্প করেছি, তবে এর ভেতরের সহজীকরণ কীভাবে আসছে, সেটা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। প্রসেস অটোমেশন, সার্ভিস সিমপ্লিফিকেশনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যে কাজ হাতে নিয়েছে, তা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল এর অসাধারণ কাজটা দেখে। খুব সহজ, তবে সেটা করতে লেগেছে বহু বছর। এখানে সেবার নাম ছিল: সাধারণ চিকিৎসা অনুদান। আপনি আগের অনুমোদন প্রক্রিয়াটা দেখুন। খুব কষ্ট লাগবে। অথচ, মানুষ মানুষের জন্য।

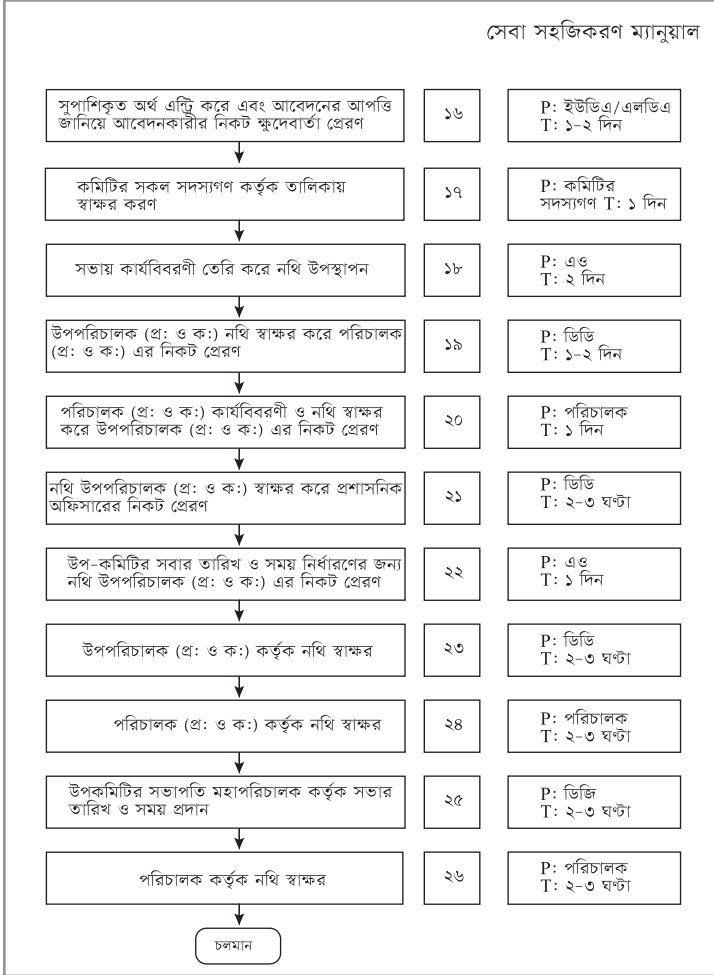
চিকিৎসা অনুদানের মতো জরুরি কাজে ৫০ ধাপ লাগলে সেটার সুফল আসবে কীভাবে? আমলাতন্ত্র সব জায়গায় আছে। সামরিক বাহিনী এবং সচিবালয়ের অনেক কাজে ভালো আউটপুট পেতে আমি অনেক ‘অসাধারণ’ নীতিনির্ধারকদের আমলাতান্ত্রিক এই ব্যাপারগুলোকে ‘বুলডোজ’ করে ঠিক করে ফেলতে দেখেছি, যখন মানুষের জীবনের অগ্রাধিকার সবার আগে। কাজগুলো হয়েছে একদম নিয়মনীতিমালায় মধ্যে থেকে। সেখানে সামরিক-বেসামরিক দুই ফুটিংয়ে কাজ করে দুই পাশের ভালো-খারাপ বিষয়গুলো বুঝতে পারি। এই জায়গাগুলোতে মাইন্ডসেট ঠিক করে এগোলে যেকোনো কিছু করা সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি, নীতিমালা মানুষের জন্য। নীতিমালার জন্য মানুষ নয়।



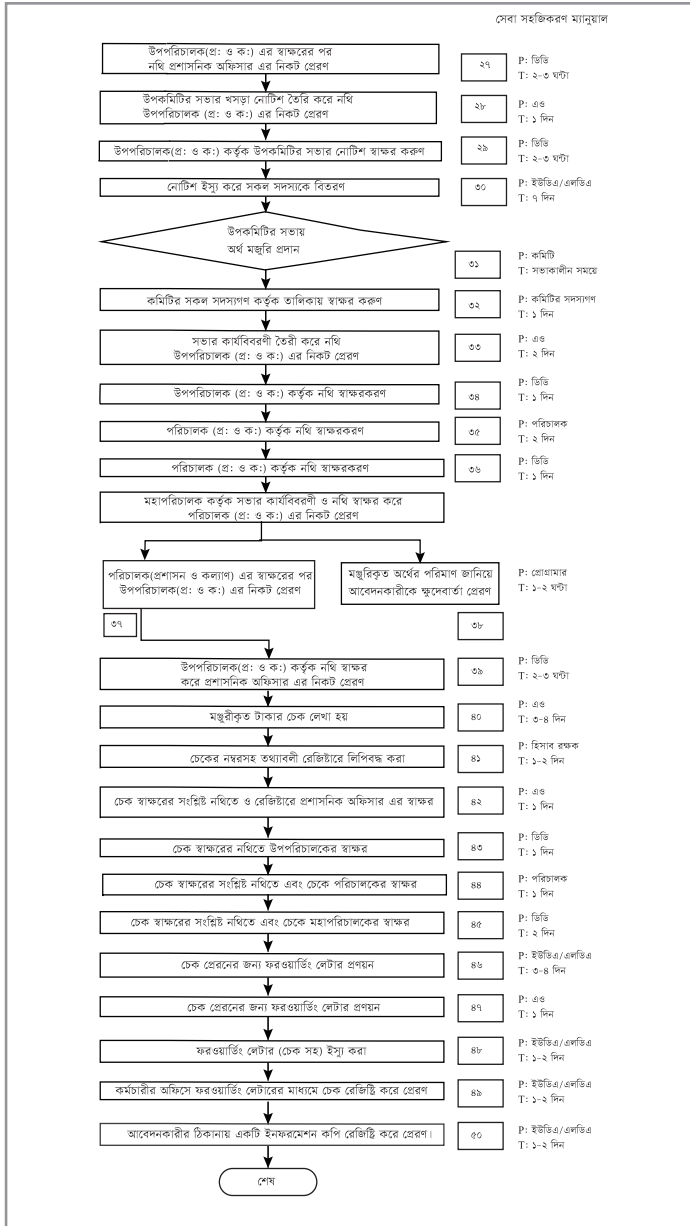
চিত্র ৬: সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের ধাপ-১ম পৃষ্ঠা

*** মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের ‘সেবা সহজীকরণ ম্যানুয়াল’ থেকে—

সেবা সহজিকরণ ম্যানুয়াল

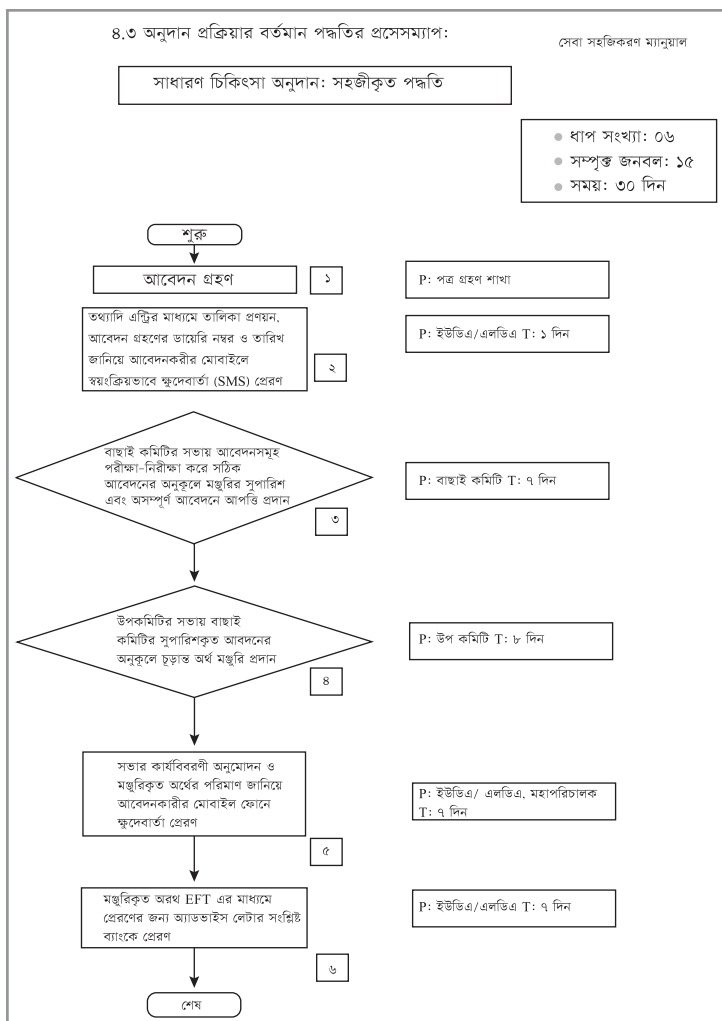


চিত্র ৭: সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের ধাপ-২য় পৃষ্ঠা



চিত্র ৮: সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের ধাপ-৩য় পৃষ্ঠা (৫০ ধাপ)

বর্তমান ধাপ কী হতে পারে? ৫০টা ধাপের জায়গায় মাত্র ৬টা ধাপ। এভাবে সব সেবা অফিসগুলোতে ধাপ কমানো সম্ভব। পুরোপুরি অটোমেশনের আগেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অটোমেশনে রাষ্ট্র নিজে থেকেই জানবে আপনার কখন কীভাবে সাহায্য দরকার, চাওয়ার আগে। সেটার রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। আমি বাড়িয়ে বলছি না। যেহেতু ডেটা নিয়ে কাজ করছি এতগুলো বছর, এটা সম্ভব। তবে, সেই পর্যায়ে যাওয়ার আগে একটা দক্ষ অ্যানালগ সিস্টেম তৈরি করা, যাতে সেটাকে দক্ষ ‘রুল বেজড’ সফটওয়্যারে নিয়ে আসা যায়।



চিত্র ৯: সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের সেবা সহজীকরণের পরের নতুন ফ্লো-চার্ট

সফটওয়্যার ‘প্রসেসফ্লো’ কথা বলবে কমন ইন্টারফেসে

আমাদের হাজারো সমস্যার সমাধান একটাই। ইন্টিগ্রেটেড ‘সফটওয়্যার’ সল্যুশন। না হলে এ ধরনের আরও যে ৫০ ধাপের সার্ভিস চলছে বাংলাদেশজুড়ে, সেগুলোকে আলাদা করে সমাধান করা দুষ্কর। এদিকে

যতই সফটওয়্যার ব্যবহার করি না কেন, সেই অ্যানালগ প্রসেসগুলোকে (অদক্ষ পদ্ধতি) ঠিকমতো ডিজিটালে না পাট্টালে সবাই দুষবে এই সফটওয়্যার সিস্টেমকে। আমি সেটা দেখেছি কয়েকটা জায়গায়। কিছু হলেই বলেন, সফটওয়্যার ঠিকমতো কাজ করে না। সফটওয়্যারে ঠিকমতো ইনপুট না দিয়ে সেটার দোষারোপ করা সহজ। সফটওয়্যারগুলোতে যাতে বেশি ইনপুট না দিতে হয় সে জন্য দরকার বুদ্ধিমান পদ্ধতি।

বর্তমান পদ্ধতিতে, এখনকার প্রসেসগুলোকে কনভার্ট করতে হবে এমনভাবে, যেখানে ‘প্রসেসফ্লো’ দিকনির্দেশনা দেয় ফাইনাল আউটকামকে। আগে যেখানে ১২টা ‘স্বাক্ষর/অগ্রগামী’ করতে হতো লাগত (কারণ, আমরা সেখানে মানুষকে ব্যবহার করছিলাম), সেখানে ৪টা ডিজিটাল সিগনেচারই পুরো সার্কুল ঘুরিয়ে আনতে পারে নিমেষে। এখানে সব সিস্টেম কথা বলবে কমন ইন্টারফেসে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেছে অনেক আগেই। একে ঠিকমতো ‘ড্রাইভ’ করতে দরকার ডেটা এবং সফটওয়্যার। এবং সেই ডেটা আছে আমাদের কাছে। দরকার বুলডোজার এবং স্পেসিফিক টাইমলাইন।

সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের দৃষ্টান্ত এবং সিঙ্গাপুর

সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের একটা দৃষ্টান্ত

এখানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের বেশ কয়েকটা দৃষ্টান্ত থেকে একটা নিয়ে কথা বলতে পারি আমরা। সেবা সম্পর্কিত যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে কাজ হয়েছে, সেগুলোর কিছুটা ধারণা এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন সেবাগুলোকে সহজীকরণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে, সেটার কয়েকটা ধারণা দেখা যাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে।

এর মধ্যে সহজীকরণের জন্য যেগুলো সেবা নির্বাচন করা হয়েছে, তার বেশ কয়েকটা ম্যাট্রিক্স আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন সেগুলো নিয়ে বেশ ভালোই কাজ হয়েছে। তবে, সেবা সহজীকরণের দৃষ্টান্তের জন্য যে সেবাগুলো নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলোর বিদ্যমান সেবা কার্যক্রমের বিশ্লেষণ দেখলে সেই সেবার প্রাথমিক ধারণা এবং পরের অভিনব ধারণার সেবাটা দেখলে তার ‘অপটিমাল’ ধারণা পাওয়া যাবে।

এর পাশাপাশি ধাপভিত্তিক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীভিত্তিক সেবা কার্যক্রমের যে বিশ্লেষণগুলো আছে, সেগুলো আমাকে ভালো ভাবিয়েছে। সেবা প্রদান কর্ম ব্যবস্থায় যে ধরনের ডকুমেন্ট এবং সেই অফিস কর্তৃক বাড়তি যে দলিলাদি চাওয়া হয় তার একটা ভালো ধারণা পাওয়া যায় ওই দৃষ্টান্ত হিসেবে দেওয়া সেবার ডকুমেন্টগুলোতে। তবে, আমি নিজে যেহেতু ‘প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং’ নিয়ে কাজ করছি, সেখানে যেকোনো সেবাপ্রাপ্তির শর্তাবলিকে একজন নাগরিক তার নির্ধারিত ফরমে আবেদনের সময় অঙ্গীকার করলে মানুষের মধ্যে ‘ইন্টার-অ্যাকশন’ না হলেও চলে। অর্থাৎ অ্যালগরিদম নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বাকি থাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের যাচাই। সেখানেও সফটওয়্যার ওস্তাদ।

এখনি অটোমেশন সম্ভব, মানুষের স্পর্শ ছাড়াই

এই অংশে সেবা প্রদানকারী সংস্থার চাহিত কাগজপত্রের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ‘অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস’-এর মাধ্যমে ভেরিফিকেশন হয়ে গেলে এখানে মানুষের কোনো স্পর্শ লাগছে না। একটা উদাহরণ দিয়েছি সামনে। ধরা যাক, কাগজপত্র যাচাইয়ের জন্য ট্রেড লাইসেন্সের মূল অথবা সত্যায়িত কপি, টিআইএনের কপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের অথবা পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি, সম্পর্কিত ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ সদস্যতা সনদের সত্যায়িত কপি ইত্যাদি ইত্যাদি সেই আবেদনপত্রে ‘ট্রেড লাইসেন্স’ অথবা ‘পরিচয়পত্রের নম্বর’, ‘ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের প্রদত্ত নম্বর’ ইত্যাদি অনলাইন ফরমে যোগ করে দিলেই সেবা প্রদানকারী সংস্থার ভেরিফিকেশন সিস্টেম বাকি সংস্থাগুলো থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেরিফাই করে নিয়ে আসতে পারবে মুহূর্তের মধ্যে। আমি নিজে ব্যাপারগুলো করেছি অনেক সরকারি ডেটাসেটে। অনেক ঝামেলা হয়েছে শুরুতে, তবে হয়েছে শেষে।

এর মানে হচ্ছে, খুবই সাধারণ একটা অ্যালগরিদম এই পুরো আবেদনপত্রের অনুমোদন দিয়ে দিতে পারে। তবে, শুরুতে মানুষের স্পর্শ বাদ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, পুরো ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করছি না বলে। পাইলটে স্বাক্ষরগুলোকে এক জায়গা নিয়ে ধাপে ধাপে ঢুকিয়ে অনুমোদনের ‘সিমুলেশন’ করা যেতে পারে।

যে ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়েছে, সেখানে বিদ্যমান সেবার প্রসেস ম্যাপ তৈরি করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারছিলাম বর্তমান সরকারের অনেক

অফিসেই এ ধরনের প্রসেস ম্যাপ তৈরি করতে পারা উচিত এর মধ্যেই। সেই প্রসেস ম্যাপগুলোকে গণশুনানির জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করলে এখানে সেবাগ্রহীতা এবং সেবা-প্রদানকারীদের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন হতে পারে, যা আমার অভিজ্ঞতায় বেশ সুখপ্রদ।

এই সেবা গ্রহণ এবং তার প্রাসঙ্গিক পদ্ধতির সমস্যা চিহ্নিত করতে গিয়ে সেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা এবং সেবাগ্রহীতা যে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলোকে ‘প্রসেস ফ্লো’তে ফেললে বেশ ভালো একটা ধারণা চলে আসে। সেটার একটা উদাহরণ আমরা নিচে দেখব। এর পাশাপাশি বিদ্যমান সেবা প্রদান ব্যবস্থার বর্তমান সমস্যাসমূহকে নিয়ে আলাপ করলে সেগুলোকে বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুসারে ভাগ করে আন্তে আন্তে ‘প্রসেস অব এলিমিনেশন’-এর ধারণায় বাদ দেওয়া যায়।

নিজের আবেদনপত্র নিজে তৈরি করলে সমস্যা কমে আসে

নিজেদের অ্যাপ

The Moments of Life app enabled users to register the births of their children, access their immunization records, navigate healthcare and childcare options eligible for benefits, and apply for the Baby Bonus Scheme.

—How Singapore is harnessing design to transform government services, McKinsey Insights

এরপর সেবা সহজীকরণ প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে কর্মকর্তা এবং সেবাগ্রহীতার প্রস্তাবনাকে প্রসেস ম্যাপে ফেলে দিলে সেখানে বেশ কয়েকটা ধাপ কমিয়ে আনা যায়। আমার অভিজ্ঞতায় এর ভেতরে ‘এসএমএস’ এবং ‘ওয়েবসাইটকে’ সংযুক্ত করলে সেখানে কয়েকটা প্রসেসিংয়ের অংশ কমে আসে। সেবাগ্রহীতা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজের সমস্ত তথ্য পূরণ করে পাঠালে সেখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে আসে। কারণ, সেটা নিজের জিনিস এবং নিজের তথ্য সবাই ঠিকভাবে পূরণ করে।

এর পাশাপাশি দাপ্তরিকভাবে একজন সরকারি কর্মকর্তার মাধ্যমে সেই তথ্যকে নতুন করে সিস্টেমে ঢোকানোর প্রয়োজন পড়ে না। যারা সেবা গ্রহণ করছেন, তারা অন্যকে দিয়ে একটা সার্ভিস ফি দিয়েও সেটা করাতে

পারেন। সেটাও হয়ে আসছে অনেক দিন ধরে। সেখানে সাহায্যকারীদের নাম থাকতে পারে সেই অনলাইন ফরমে।

প্রয়োজন প্রজ্ঞা, দূর-দৃষ্টিভঙ্গির সংস্থা-প্রধান এবং সাহসী কর্মকর্তাদের

সরকারি অনেক অফিসে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দেখেছি, যাদের সামান্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান না থাকলেও প্রজ্ঞা দিয়ে সে জিনিসগুলোকে ঠিক করে দেন। উনি যেহেতু সামগ্রিক ধারণাটা ভালো বোঝেন, সেখানে প্রযুক্তিগত জ্ঞান সেভাবে না থাকলেও চলে। সেখানেই আমরা দেখেছি নতুন প্রস্তাবনার সম্ভাবনার কথা মনে রেখে অনেক সংস্থাপ্রধান ব্যাপারটিকে সহজ করে দিয়েছেন, উনারা অনেক প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তবে, অনেকে (প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন মেধাবী কর্মকর্তা) এ ধরনের সহজীকরণ ব্যাপারটি পুরোনো ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেভাবে সহজ করতে পারেননি। সেখানেও কাজ করতে হবে আমাদের, আরও বেশি ফোকাস করে। নষ্ট করা যাবে না সময়। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

অনেক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত, কে সমন্বয়ের দায়িত্ব নেবে?

তবে আমি যেহেতু নিজে সরকারি কাজের প্রসেসের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেখানে বিভিন্ন সংস্থার সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াগুলোকে সংস্কার করতে গিয়ে সেখানে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে অনেকে বলেন ‘বর্তমান প্রক্রিয়ায় সবকিছু ঠিকঠাক চলছে’ অথবা ‘যেহেতু আইনে আছে সে কারণে এই ধাপগুলো বাদ দেওয়া যাবে না’ অথবা ‘কোনো সমস্যা হলে কে দায়িত্ব নেবে?’ অথবা ‘এখানে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত, কে এখানে সমন্বয়ের দায়িত্ব নেবে?’

আমার কথা একটাই। সেখানে ‘রুল’ ঠিকমতো তৈরি করলে সমস্যা হবার কথা নয়। আর, সবকিছুতেই ‘পাইলট’ সম্ভব। ভুল হতেই পারে শুরুতে। সেটা বোঝার জন্য ‘পাইলট’। সমস্যা হলে অগ্নির ওপর দিয়ে যায়। তবে, সবাই আন্তরিক হলে এ ধরনের সমস্যা কোনো সমস্যাই নয়। সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব যখন একটা দপ্তরের সবাই চাইবেন প্রক্রিয়াগুলোকে সহজীকরণ করতে।

সরকারি কাজের খরচের হিসেব কীভাবে আসবে?

সবচেয়ে ভালো ব্যাপারটা এসেছে যখন বিদ্যমান সেবার প্রসেস ম্যাপ এবং সেবা সহজীকরণের জন্য অভিনব প্রস্তাবের প্রসেস ম্যাপকে আমরা পাশাপাশি দেখেছি, তখন সেখানে বেশ কিছু জিনিস বাহুল্য মনে হয়েছে। অনেকে সহজীকরণ ব্যাপারটার পেছনের দর্শনটিকে ধরতে পারেননি। তবে তুলনামূলক বিশ্লেষণ, বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত প্রক্রিয়ার ধাপগুলোকে তুলনা করলে আমার অভিজ্ঞতা বলছে, সামনে আরও ধাপ কমে আসবে। একটু সময় লাগছে এই যা। বিশেষ করে, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যখন ক্ষমতায়ন করা হবে।

এর পাশাপাশি একটা জিনিস না বললেই নয়, সেবাগ্রহীতার এবং যারা সেবাটা দিচ্ছেন, অর্থাৎ সেবাকে প্রসেস করতে কেমন খরচ হচ্ছে, সবগুলোকে মিলিয়ে সেই সেবাটির জন্য সর্বশেষ খরচের হিসেব পদ্ধতি বের করা দরকার। এখানে পুরো অফিসের খরচের বিভিন্ন কম্পোনেন্টগুলোকে যোগ করলে সেই অংশগুলোর আলাদা আলাদা খরচের হিসেব যাকে ‘লং রান ইনক্রিমেন্টাল কস্ট’ হিসেবে ‘বটম আপ’ হিসেবে সেই সেবার প্রকৃত খরচ বের করে প্রতিটি গ্রাহকের কাছে তার কত অংশ যাবে, সেটা বের করা জরুরি। এটাকে আমরা ‘অপরচুনিটি কস্ট’ হিসেবে বলতে পারি।

সিঙ্গাপুরের ‘অনলাইন বিজনেস লাইসেন্সিং সিস্টেম’

বানিয়েছে নিজেরা

At the national level, design is . . . a core element of our nation-building. Singapore is a nation by design. Nothing we have today is natural, or happened by itself. Somebody thought about it, made it happen. Not our economic growth, not our international standing, not our multiracial harmony, not even our nationhood. Nothing was by chance.

—Singapore’s Prime Minister, Lee Hsien Loong, 2018

তবে এ ব্যাপারে আমি বেশ কিছু দেশের ব্যবসায়িক লাইসেন্সের ব্যাপারে পড়াশোনা করেছিলাম ২০১০ সালে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে থাকার সময়। আমার সুযোগ হয়েছিল সিঙ্গাপুরে ‘ইনফোকম ডেভেলপমেন্ট অথরিটি’র একটা রেগুলেটরি এক্সিকিউটিভ প্রশিক্ষণে

যাওয়ার জন্য। সিঙ্গাপুরের ‘অনলাইন বিজনেস লাইসেন্সিং সিস্টেম’ দেখে মনে হলো তারা সবকিছুকে নিয়ে এসেছে একটা জায়গায়। একটা ‘ট্রানজাকশন’ দিয়েই সরকারের সব অফিসকে যুক্ত করে জনগণের সব আবেদনপত্র এক রাস্তায় প্রসেসিং করার সুন্দর রাস্তা।

বিশ্বব্যাংকের ‘ডুইং বিজনেস’ ইনডেক্সে আমরা কোথায়?

আর সে কারণেই বিশ্বব্যাংকের ‘ডুইং বিজনেস’ ইনডেক্সে বহু বছর ধরে এক নম্বর পদ ধরে রেখেছিল তারা। এ বছর সেটা গিয়েছে নিউজিল্যান্ডের হাতে। তবে বিশ্বব্যাংকের এই র‍্যাংকিংয়ের পেছনে সিঙ্গাপুরের বর্তমান ‘লাইসেন্স-ওয়ান’ এবং ‘গো-বিজনেস’ একীভূত প্ল্যাটফর্ম অনেক সহায়তা দিচ্ছে। বড় ব্যাপার হচ্ছে, সরকারি ২৬০ ধরনের লাইসেন্স দেওয়া হয় এই একীভূত প্ল্যাটফর্ম দিয়ে, যার পেছনে যুক্ত রয়েছে ৩০টা সরকারি সংস্থা।

এর মধ্যে ৮০% বেশি লাইসেন্সগুলো পেতে যেতে হয় না তাদের সরকারি অফিসে। এর পাশাপাশি যেকোনো লাইসেন্সের পূর্ণ প্রক্রিয়া, সেগুলোর আপডেট এবং লাইসেন্স বন্ধ করার সবকিছুই এই একই প্ল্যাটফর্মে করা সম্ভব। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, ব্যবসায়ীরা এই সিস্টেমের রেটিং ৮০ শতাংশের বেশি দিয়েছে তাদের সার্ভিসগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে। আমার পরিচিত অনেক দেশি উদ্যোক্তা এখন সিঙ্গাপুরে কোম্পানি খুলতে আগ্রহী।

একটা উদাহরণ, আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র

একীভূত অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল

ধারণা করছি, বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা একীভূত অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল তৈরি করা খুব একটা সমস্যা হবার কথা না। সেগুলো করার আগে আমাদের বিদ্যমান এবং সামনের লাইসেন্সিং সেবাগুলোকে কীভাবে সহজ করা যায় সেটার প্রসেস ম্যাপ নিয়ে কাজ করতে হবে। সেটার শুরুর ধাপ হচ্ছে সেবা সহজীকরণ প্রসেস ম্যাপ। সেবা সহজীকরণ নিয়ে আমরা একটা উদাহরণ দেখি, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের জন্য আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ প্রসঙ্গে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশের বাইরের থেকে আমদানির ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী যেকোনো আমদানিকারকের জন্য আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক। এখানে যেটা দেখা গেছে, বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনকারী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং যারা এখানে বাইরের দেশের পণ্য বিক্রি করছেন, সেখানে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র নিয়ে আমদানিকারকগণ ব্যাংকে ঋণপত্র খুলে আমদানিপ্রক্রিয়া করে থাকেন। এখানে ৬ ধরনের ক্যাটাগরি থাকলেও বাৎসরিক মোট আমদানির মূল্যসীমা, প্রাথমিক নিবন্ধন ফি এবং বার্ষিক নবায়ন ফি সঙ্গে নবায়ন বই ফি বাবদ ছক মোতাবেক টাকা সরকারি ট্রেজারিতে চালান হিসেবে দিলে প্রতিটা সনদপত্র নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া একই।

মূল শর্ত আসলে একটা চেকবক্স

সেবাপ্রাপ্তির জন্য এই প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করার জন্য সবচেয়ে প্রথম যে জিনিসটি নিয়ে কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে এই সেবাপ্রাপ্তির জন্য যে শর্তাবলি বিদ্যমান, সেগুলো মেনে আবেদন করা। ব্যাপারটা অনেকটাই বিভিন্ন সফটওয়্যারের ‘অ্যাগ্রিমেন্ট’ পড়ে ‘আমি মানছি’ অর্থাৎ ‘আই অ্যাগ্রি’ বাটনটাকে ‘প্রেস’ করার মতোই অনেকটা। অন্যান্য যেকোনো সরকারি শর্তাবলির মতো এখানে শর্তাবলি খুবই সহজ। এখানে দুটি মূল শর্ত। নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি করা যাবে না এবং শর্তযুক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। যেমন, কীটনাশক আমদানি করতে গেলে তার জন্য বর্ণিত আলাদা শর্তাবলি মানতে হবে।

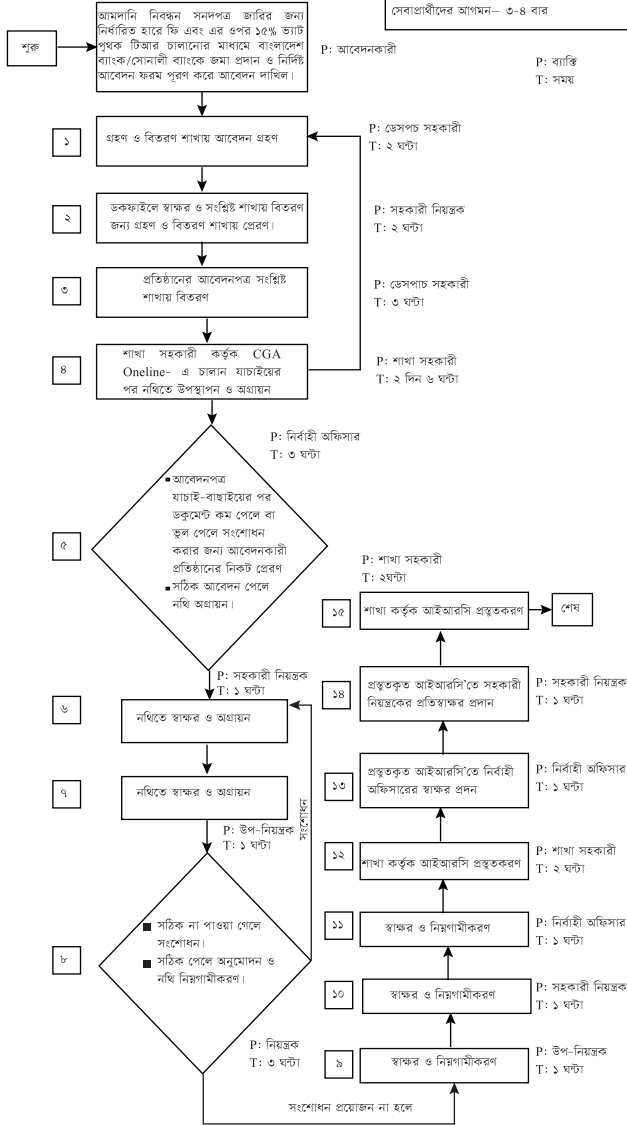
১৫ ধাপ থেকে ১০ ধাপ

এই সেবাটি পাওয়ার জন্য আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের অধীনস্থ আঞ্চলিক দপ্তরে নির্ধারিত আবেদনপত্র ফরম ব্যবহার করে দশটি কাগজ জমা দিতে হবে। এই কাগজগুলোকে নিয়ে আলাপ করছি সামনে। এই কাগজগুলোর মধ্যে নির্ধারিত নিবন্ধন ফি জমা দেবার জন্য ট্রেজারি চালানের মূল কপিসহ আবেদন করতে হবে। বাকি নয়টা কাগজ এবং শুধু ট্রেজারি চালানের ডকুমেন্টকে অনলাইনে কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই করে সংস্থার নথিতে উপস্থাপন করার পরে সংশ্লিষ্ট অফিসপ্রধানের অনুমতির ভিত্তিতে এই বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র জারি

করা হয়ে থাকে। বিদ্যমান ১৫ ধাপের মধ্যে অনেক ভাগ নথিকে শুধু স্বাক্ষর এবং অণায়ন এবং নিয়গামীকরণ ব্যাপারটা রয়েছে। এখানে শ্রেণিবিন্যাস অর্থাৎ ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ বেশি। এত ‘হাইয়ারার্কি’ দরকার নেই সামনে। যাচাইয়ের ধাপ কম। তবে প্রস্তাবিত ধাপ হচ্ছে ১০টা। এখন ১০ ধাপেই চলছে।

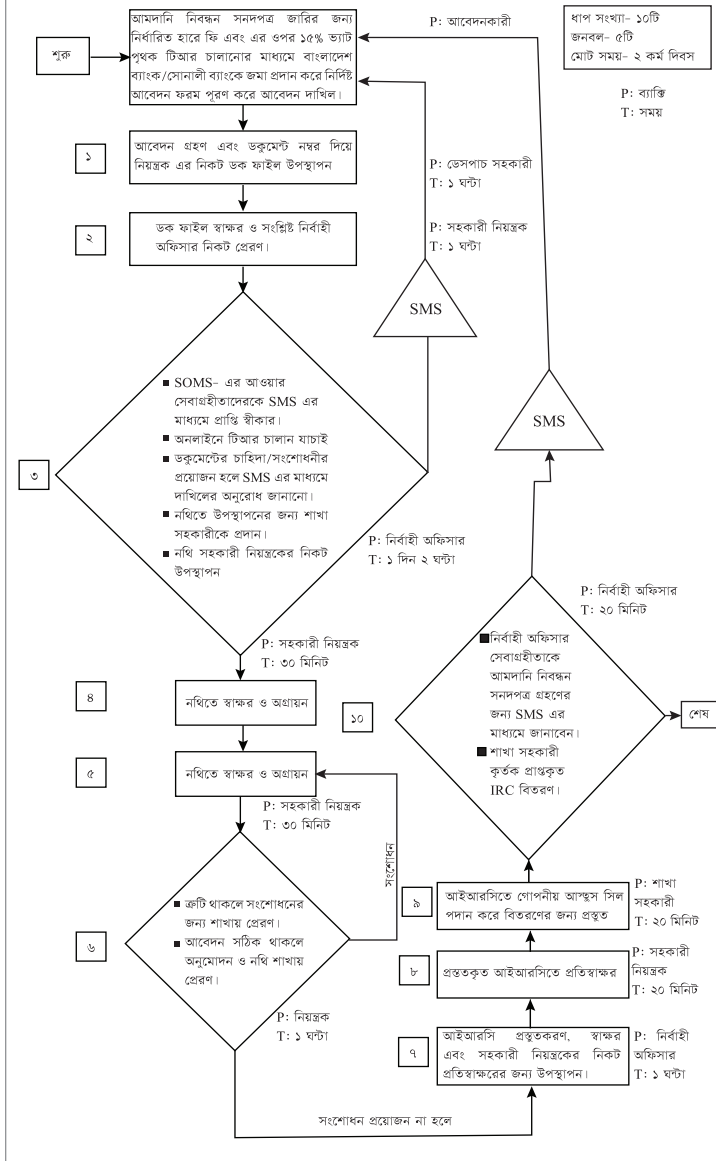
২.২ বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

বিদ্যমান পদ্ধতিতে ধাপ সংখ্যা— ১৫টি
জনবল— ৫জন
মোট সময়— ৫ কর্মদিবস
সেবাগ্রাহীদের আশ্রয়— ৩-৪ বার



চিত্র ১০: আগের ১৫ ধাপ

৩.২ প্রস্তাবিত আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (IRC) জারির প্রসেস ম্যাপ



চিত্র ১১: এখন ১০ ধাপ

প্রসেস ম্যাপগুলো নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভা পরিষদের সমন্বয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সেবা সহজীকরণ দৃষ্টান্ত থেকে। আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (IRC)

সেবার ধারণা ও কাগজপত্র

যে কাগজপত্রগুলো জমা দিতে হবে তার বিবরণ:

কাগজপত্র	রুল-সেট তৈরির ধারণা	কি হতে পারে?
১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন	এই একটি অনলাইন ফর্মে সব কাগজের তথ্য থাকবে সংখ্যায়	একটাই ফর্ম
২. ট্রেড লাইসেন্সের মূল/সত্যায়িত কপি	ট্রেড লাইসেন্সের একটা ইউনিক সংখ্যার মাধ্যমে সেই সংস্থা থেকে যাচাই হবে	সংখ্যা
৩. চেম্বার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ সদস্যতা সনদের মূল/সত্যায়িত কপি	ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ সদস্যতা আসবে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' উত্তরের মাধ্যমে, এপিআই দিয়ে	হ্যাঁ/না যাচাই
৪. ব্যাংক সচ্ছলতার সনদপত্রের মূল/সত্যায়িত কপি	ব্যাংক/বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' আউটপুট	হ্যাঁ/না যাচাই
৫. টিআইএন এর মূল/সত্যায়িত কপি	রাজস্ব বোর্ড থেকে 'টিআইএন' সংখ্যা দিয়ে যাচাই	সংখ্যা
৬. আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি-১ কপি	ছবি চলে আসবে জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট সংস্থা থেকে	ছবি আপলোড নয়
৭. আবেদনকারীর জাতীয়তার সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের মূল/সত্যায়িত কপি	জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের নম্বর দিয়ে হ্যাঁ অথবা না যাচাই	হ্যাঁ/না যাচাই

৮. অংশীদারী মালিকানার ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড অংশীদারী দলিলের মূল/সত্যায়িত কপি	রেজিস্টার্ড অংশীদারী দলিল প্রদানকারী সংস্থা থেকে হ্যাঁ অথবা না যাচাই	হ্যাঁ/না যাচাই
৯. লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন ও সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশনের মূল/সত্যায়িত কপি	মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন ও সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশনের জন্য ‘আরজেএসসি’ থেকে ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ যাচাই	হ্যাঁ/না যাচাই
১০. নির্ধারিত ফি জমা দেবার ট্রেজারি চালানের মূল কপি	ট্রেজারি চালানের নম্বর এবং টাকার পরিমাণ	সংখ্যা

এখানে আমার প্রস্তাবনা হচ্ছে সেবাগ্রহীতা অনলাইনে ক্রম ১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবেন, যেখানে ক্রম ২ থেকে ১০ পর্যন্ত সফটওয়্যার ‘অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস’ (এপিআই) দিয়ে সব কাগজপত্র যাচাই হবে সিস্টেম থেকে। যাচাই না হলে আবেদনপত্র সম্পূর্ণ হবে না। অর্থাৎ, ইনপুট দেবেন সেবাগ্রহীতা, অথবা উনি সাহায্যকারীর সহায়তা নেবেন। এখানে একজন সেবাগ্রহীতা, উনার জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট এবং টিআইএনের সংখ্যাগুলো বসাবেন আবেদনপত্রে। এর পাশাপাশি ট্রেড লাইসেন্সের সাংকেতিক অথবা শনাক্তকরণ সংখ্যাটি ঢুকিয়ে দেবেন অনলাইন আবেদনপত্রে।

যাচাই হবে ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ এবং সংখ্যা দিয়ে

একটু চিন্তা করুন, সেবাগ্রহীতার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর আবেদনপত্রে যোগ করে দিলেই সেবাপ্রদানকারী সংস্থার সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার ব্যাংকের স্টেটমেন্টের ওপর ভিত্তি করে সফটওয়্যারে একটা ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ আউটপুট আসবে, যা থেকে সেবাগ্রহীতা ব্যাংকের সচ্ছলতা বোঝা যাবে। একেকটা সেবার জন্য একেক ধরনের পরিমাণের ব্যাংকে টাকা থাকলেই সেটা ‘হ্যাঁ’ বলবে সিস্টেমে। লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে ‘মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল অব

অ্যাসোসিয়েশন' অথবা অন্যান্য যত ধরনের সনদপত্র প্রয়োজন, সব যাচাই করা যাবে তার জন্য বরাদ্দকৃত সাংকেতিক চিহ্ন অথবা সংখ্যার মাধ্যমে।

পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ এবং ব্যবসায়িক সংস্থাকে ইউনিকভাবে শনাক্ত করার জন্য এই সংখ্যার ব্যবহার। এখানে 'চেম্বার' অথবা ব্যবসায় প্রতিনিধিত্বকারী 'ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনে'র বৈধ সদস্যতা চলে আসবে সেই ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের সফটওয়্যার থেকে- একটা 'হ্যাঁ' অথবা 'না' আউটপুট দিয়ে। আপনি এখন যেভাবে সিমকার্ড কেনেন হাতের আঙুলের ছাপ দিয়ে। এখানে যেটা বলতে চাইছি, কোনো ধরনের কাগজের স্ক্যান কপি আপলোড করার প্রয়োজন নেই। কারণ, সেই সব তথ্য নির্দিষ্ট সংস্থা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই হয়ে আসবে তার জন্য বরাদ্দকৃত সংখ্যার মাধ্যমে। আমাদের প্রয়োজন সেবাগ্রহীতাকে ঠিকমতো চিহ্নিত করা এবং সে কারণেই এত কাগজপত্রের জায়গায় সংখ্যার ব্যবহার।

কাগজ মানেই জাল হবার আশঙ্কা বেশি

যখনই কাগজপত্রের মাধ্যমে একটি জিনিস যাচাই করার প্রয়োজন পড়ে, তখন সেখানে জাল হবার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। আমরা কি জানি, সেই কর্মকর্তার সিগনেচার এটাই? সেজন্য সেবাগ্রহীতা এই কাগজপত্রের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কাগজের জায়গায় উনি সংখ্যা দিয়ে ইনপুট দেবেন। বাকিটা সিস্টেম থেকে যাচাই হয়ে আসবে।

এর পাশাপাশি সেবাপ্রাপ্তির জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলোর জন্য একটি চেকবক্স-ভিত্তিক অঙ্গীকারনামা নেওয়া যেতে পারে, যেখানে শর্তগুলো লেখা থাকবে। উনি এটা মেনেছেন বলে একটা চেকমার্ক বক্স 'টিক' করে দিলে সেই শর্তগুলো মানার বাধ্যবাধকতা চলে আসবে। এরপরে সেবাগ্রহীতা সেই শর্তগুলোর কোনো ধারা ভঙ্গ করলে তার ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

ডেটা শেয়ারিং চুক্তিনামা

এখানে যে ব্যাপারটা বলা হচ্ছে, একজন সেবাগ্রহীতাকে ঠিকভাবে যাচাই এবং তার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসপ্রধানের অনুমোদনের জন্য সংস্থাক্ষরিত মাধ্যমে সংযোগ থাকলেই চলবে। গত চার বছর ধরে এই কাজ করেছি আমি। ডেটা শেয়ারিংয়ের চুক্তিনামা এবং কে কোথায় অ্যাক্সেস পাবে,

সেটাকে নির্ধারণ করা। এখানে একজন অফিসপ্রধানের অনুমোদন সবশেষে নেওয়া যেতে পারে, তবে সেটা না হলেও সকল নীতিমালা অনুসরণ করে একজন সেবাগ্রহীতাকে ঠিকভাবে ‘বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন প্রত্যায়নপত্র’ দেওয়া যেতে পারে। এটা নির্ভর করছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে। ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এ ব্যাপারগুলোই ঘটবে।

বিশ্বব্যাংকের ‘ডুইং বিজনেস’ ইনডেক্সে আসতে হবে ওপরে

নিয়ন্ত্রণ

BIDA and Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) have been trying to improve and also took steps but this was not welcomed warmly by concerned ministries as they do not want to lose their control on these issues. This mindset has to change.

—(PRI) Executive Director, Why can't Bangladesh attract private investment? Dhaka Tribune

এ জিনিসগুলো আমি দেখেছি বেশ কয়েকটা দেশে, যারা বিশ্বব্যাংকের ‘ডুইং বিজনেস’ ইনডেক্সে খুব ভালো করছে। আমাদের দরকার একজন সেবাগ্রহীতাকে ঠিকমতো যাচাই করে সেই সংস্থার শর্তাবলি মেনে বাণিজ্যিক আমদানি করা, সেখানে মানুষের দ্বারা যাচাই এবং সংস্থাপ্রধানের অনুমোদনের জন্য মানুষের সরাসরি কোনো সংযোগের প্রয়োজন নেই।

এভাবেই আস্তে আস্তে বের হয়ে যাবে মানুষ লুপ থেকে। যেভাবে মানুষ চলে গেছে বর্ডার কন্ট্রলের ই-গেট থেকে। যখন কোনো সেবাগ্রহীতা শর্তাবলি ভঙ্গ করবেন, তখন তার ব্যাপারে সরাসরি আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তবে, এই মুহূর্তে সংস্থাপ্রধানের অনুমোদন আমাদের বিদ্যমান প্রসেসে আছে বলে এ ধরনের নিবন্ধনপত্র জারি করার পূর্বমুহূর্তে একটি সভায় সবার সঙ্গে বসে আলোচনা করে প্রত্যায়নপত্র জারি করা যেতে পারে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধা বণ্টন ব্যবস্থাপনা

মানবিক রাষ্ট্র থেকে কত দূরে বাংলাদেশ?

দরকার মানব সক্ষমতা

The focus of this support has been on making the programs more pro-poor. This is being achieved by building and enhancing administrative systems to help identify the most vulnerable objectively, deliver benefits and services timely and efficiently, and strengthen citizen engagement. Investments in human capacity building and technology have been critical in this process.

—World Bank April 29, 2019

সংবিধান, সামাজিক নিরাপত্তার (সোশ্যাল সিকিউরিটি) সংজ্ঞা

একটা দেশের বয়স যখন বাড়তে থাকে, তখন সেই দেশটা আস্তে আস্তে জনকল্যাণমুখী কাজে মনোযোগ দেয়। এককথায় বলতে গেলে দেশটা তখন মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত হবার জন্য যেটা দরকার, সে ধরনের কৌশলপত্র তৈরি এবং সেটাকে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে কাজ শুরু করে। এদিক থেকে সর্বজনীন ন্যূনতম আয়ের ধারণা অতটা পুরোনো নয়। সেটার একটা ভালো উদাহরণ তৈরি হয়েছে এই অতিমারির সময়।

সাম্প্রতিককালে, কাজের সিস্টেমের দক্ষতা এবং অটোমেশনের ফলে অনেক চাকরি প্রতিস্থাপন হবার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান রাষ্ট্রের একটি আবশ্যিকীয় কর্মসূচি।

১৯৭২ সালে যখন আমাদের সংবিধানের কার্যকারিতা শুরু হয়, তখনই ১৫-এর ঘ-এ সামাজিক নিরাপত্তার (সোশ্যাল সিকিউরিটি) সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

যে জিনিসটা দেখা গেছে, প্রতিটি দেশের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে, সে দেশের অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এর সংজ্ঞা হিসেবে ১৫-এ উল্লেখ আছে, ‘রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তৃগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন’। সেই জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধনে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অনেক কাজ হলেও সেটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এখনকার একটা কৌশলপত্রে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী অর্থাৎ ‘সোশ্যাল সেফটি নেট’

কৌশলপত্র

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলের লক্ষ্য হলো বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচিগুলোর পরিমার্জন ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোকে আরও নিখুঁত, দক্ষ ও কার্যকর করে তোলা এবং ব্যয়িত অর্থ থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জন নিশ্চিত করা। এটি সনাতনি ধারণার পরিবর্তে একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিধির আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার প্রচলন ঘটাবে। এই নতুন ব্যবস্থায় ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের (যখন অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা হবে ৫ শতাংশের চেয়ে কম) বাস্তবতায় কর্মসংস্থান নীতি ও সামাজিক বিমাব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

—জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তাকৌশল: বাংলাদেশ

এ ধরনের কাজের শুরুতে প্রশাসন দেশের দারিদ্র্য এবং বৈষম্য কমিয়ে আনতে বেশকিছু পরিকল্পনা নিয়ে আসে। সে হিসেবে ২০১৫ সালের দিকে জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নে একটা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী অর্থাৎ ‘সোশ্যাল সেফটি নেট’ তৈরির কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে। এই কৌশলপত্রটি একটা বড় দিক হচ্ছে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচির ব্যাপারগুলোকে আরও দক্ষ এবং কার্যকর করে এর জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে, সেটার সর্বাধিক সুবিধা অর্জন নিশ্চিত করা।

আইনের মধ্যে যোগসূত্র

সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ, অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষাকে আইনি বলয়ের আওতায় আনার জন্য এ মুহূর্তে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তাকৌশল, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১, শিশু আইন ২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন ২০১৯ আইনগুলোর মধ্যে কতগুলো কার্যকর আর কতগুলো এই মুহূর্তে কার্যকরী করা যাচ্ছে না, সেগুলোকে বের করা যাবে পলিসি সাইকেল বলে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে। সেখানেও সাহায্য করতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

চলুন একটু ভেতরে যাই।

(এই অধ্যায়ের একটা বড় সাহায্য এসেছে নিচের লেখাগুলো থেকে)

তথ্যসূত্র

১. সামাজিক নিরাপত্তায় বিশেষ নজর: বরাদ্দ ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা, ১২ জুন ২০২০ সমকাল
২. সামাজিক নিরাপত্তাকৌশল ও আসন্ন বাজেট ২০১৬, প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০১৬
৩. সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান: ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার, প্রথম আলো, ১৭ মে ২০২০
৪. সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীতে যত উদ্যোগ, বাংলা ট্রিবিউন, মার্চ ১৪, ২০১৯
৫. বাড়ছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বলয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জুন, ২০১৯

সুবিধাবঞ্চিতদের শনাক্ত করব কীভাবে?

সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাকৌশল বাস্তবায়নের কৌশলপত্র এককথায় বলতে গেলে, সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তাকৌশল বাস্তবায়নের কৌশলপত্র তৈরি করা হয়েছে। ওই কৌশলপত্রটি বিবেচনায় এনে এ সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের কীভাবে নিরাপত্তা প্রদান করা যায়, তা নিয়ে অনেক কাজ শুরু হয়েছে। সরকারের দারিদ্র্য কমাতে অনেক কর্মসূচি থাকলেও জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো দারিদ্র্য ঝুঁকিতে রয়ে গেছে। তবে, এদের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে

যে অংশটা আছে এবং এর পাশাপাশি দারিদ্র্যসীমার কিছুটা ওপরে থাকা মানুষজন প্রায় সময়ই দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন।

তবে মোটা দাগে বয়স্ক, বিধবা, দুস্থ মহিলা, দুগ্ধদানকারী দরিদ্র মা, অসচ্ছল, প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধা, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী (যেমন, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি) এ সুবিধার মধ্যে পড়বে। এর সঙ্গে যারা ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকজনিত প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদ্রোগীরাও এ সুবিধা পাবেন।

সরকারি ডকুমেন্টগুলো ঘেঁটে দেখা গেছে, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈষম্য হ্রাসকরণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তাকৌশলপত্র বাস্তবায়ন অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৬-২১ অনুমোদিত হয়েছে আগেই। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে সরকার দরিদ্র জনগণের অবস্থা উন্নয়নে প্রতিবছর এ খাতে বরাদ্দ বাড়চ্ছে। সরকারের তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

তবে, আমার অভিজ্ঞতায় মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে, মোবাইল ব্যবহারকারীদের তথ্য এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর ‘প্রক্সি ডেটা’ ‘নামবিহীন’ অর্থাৎ ‘অ্যানোনিমাস’ হিসেবে ব্যবহার করে সুবিধাবঞ্চিতদের শনাক্ত করা সহজ। সেখানে ব্লকচেইন এখন আশীর্বাদের মতো। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এ ব্যাপারে কাজ করে দেখেছি ব্যাপারটা সম্ভব। ব্যাপারটা কমিয়ে আনবে সামাজিক অসংগতি।

বর্তমানে বাজেটের ১৭ শতাংশ, ২৫-এ দাঁড়াবে

এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এটাকে বাজেটের সঙ্গে মেলালে সেটা ১৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ এবং জিডিপির ৩ দশমিক ০১ শতাংশ হয়। গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৮১ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা। করোনা মহামারির কারণে আরও ১২ লাখ মানুষ নতুন উপকারভোগীতে যোগ হবে।

তবে, অন্যান্য মধ্যম আয়ের দেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে সামাজিক সুরক্ষার জন্য যতটুকু বরাদ্দ, তা আসলে প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। এটা ঠিক যে কাউকে পেছনে রেখে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে যত ডকুমেন্টেশন পড়েছে, সেখানে সবাই বলছেন দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো ও অব্যবস্থাপনা দূর করা প্রয়োজন। পুরো ব্যবস্থাপনাকে ঠিকমতো সিনক্রোনাইজেশন করতে গেলে সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই বামেলা অনেকটা দুবাই এয়ারপোর্টের মতো। প্রচুর সেখানে সাহায্য লাগবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার।

নিচের কিছু তথ্য দেখি, এনএসএসএস, উন্নয়ন বাজেট ২০১৫-১৬, জনগণনা ২০১১, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং প্রথম আলো ২০১৬ থেকে

- ক. সামাজিক নিরাপত্তা-সেবার নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় ৩৩.৫% উপকারভোগী সঠিকভাবে নির্বাচিত হন না
- খ. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি ২.১৯% এবং উন্নয়ন বাজেটের ৩.৮% সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ছিল
- গ. দেশে জনসংখ্যার ৭.৭% বয়স্ক মানুষ
- ঘ. ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি ২.০২% বা বাজেটের ১৩% সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় হয়েছে
- ঙ. দেশে ৮৩% কর্মসংস্থান হয় অনানুষ্ঠানিক খাতে
- চ. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো সাধারণত গ্রামাঞ্চলেই পরিচালিত হয়। অথচ শহরে উচ্চ বাড়িভাড়া, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি খেটে খাওয়া মানুষের জীবন অসহায় করে তুলছে। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শহরে তেমন মনোযোগ পাচ্ছে না।
- ছ. বর্তমানে প্রায় ১৪৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ২৩টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়। কিন্তু এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়া, টানাটানি, সমন্বয়হীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব রয়েছে।
- জ. বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, অদক্ষতা, ঘুষ-দুর্নীতিসহ অব্যবস্থাপনার জন্য প্রকৃত গ্রাহকেরা এর সুফল পাচ্ছেন না। সামাজিক সুরক্ষার জন্য নির্ধারিত ব্যয়ের ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ অর্থ প্রাপকের কাছে পৌঁছায় না।
- ঝ. অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত দরিদ্ররা এই কর্মসূচির মধ্যে ঢুকতে পারছে না। আবার সচ্ছল মানুষ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। তাই একজন সচ্ছল মানুষকে বের করে দিলে সেখানে একজন দরিদ্র মানুষ প্রবেশ করতে পারে।
- ঞ. পেনশনকে সর্বজনীন করার বিষয়টি ভাবতে হবে; বিশেষ করে যাঁরা কর দেন, তাঁদের সবার জন্য পেনশনের বিষয়টি আরও গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে।

ফ্রেমওয়ার্কের আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে সুবিধা প্রদান

ফ্রেমওয়ার্কের আধুনিকায়ন এবং ব্যবস্থাপনা

তবে এই ২০২০ সালে অনেক সমস্যাই মিটে গেছে। তবে সুবিধাভোগীর কাছে যথাযথভাবে সুবিধা না পৌঁছানো, সুবিধাভোগী নির্বাচনে সমস্যা ও পুনরায় তদারকি কর্মসূচিতে এখনো সমস্যা আছে। এর পাশাপাশি পুরো ফ্রেমওয়ার্কের আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা বেশ কিছু এলাকায় পৌঁছে দেবার মাধ্যমে সরকার এই সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পেরেছে। একটা কথা বারবার আসছে, অনেকেই ভাতা পাওয়ার উপযোগী না হয়েও তা নিচ্ছেন। এতে সরকারের অপচয় হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কিছু ধারণা দিয়ে এই ‘অ্যানামলি’ অর্থাৎ অস্বাভাবিকতা বের করা সেরকম সমস্যা নয়।

আবার ব্যাংকের মাধ্যমে ভাতা সংগ্রহ করতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীরা সমস্যায় পড়েন। পুরোপুরি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে কিছু সমস্যা মেটানোর গেলেও বায়োমেট্রিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগকারীর কাছে সুবিধা পৌঁছাতে গেলে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে, সেটা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এ মুহূর্তে, মোবাইল সিম কেনার মতো বায়োমেট্রিক পদ্ধতি দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতাগুলো দেওয়া সম্ভব। আমাদের সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি এখন। ব্লকচেইন প্রযুক্তি আছে এখনই, হাতের নাগালে- দরকার আইনগত ভিত্তি। সেটার খসড়া তৈরি করা যাবে অল্প সময়ে।

এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, ব্লকচেইন এবং পেছনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

এ ধরনের বিশালাকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো চালাতে গেলে তার দক্ষ পরিচালনার জন্য একটা ‘এন্ড টু এন্ড’ এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিংয়ের মতো সফটওয়্যার সলিউশন প্রয়োজন। এর ‘ব্যাকএন্ডে’ কাজ করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। সেই ২০১৫ সালে যখন কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়, তখন সেখানে একক রেজিস্ট্রি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে একজন সুবিধাভোগীকে সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য একটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, যেটি আমরা আলাপ করেছি ‘ইউনিক আইডেনটিফিকেশন’ ধাপে। এখনো কিছু

হতদরিদ্র পরিবার আছে, যারা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাইরে আছে। তাদেরকে ঠিকভাবে শনাক্ত করে কোনো না কোনো কর্মসূচিতে সংযুক্ত করতে হবে। আমরা ধারণা করছি, ২০২৫ সালের মধ্যে সব দরিদ্র মানুষ আমাদের সামাজিক নিরাপত্তাকৌশলের মধ্যে চলে আসবে। এখনো একটা বড় রকমের সমস্যা আছে— সুবিধাভোগী নির্ধারণ। পত্রপত্রিকায় দেখেছি, দরিদ্র নয় এমন ২৭ শতাংশ পরিবার ভাতা ভোগ করত।

সূত্রের পত্রিকাগুলোর বেশকিছু গোলটেবিল বৈঠকের সুপারিশ নিয়ে যদি আমরা দেখি, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে শনাক্তকরণ একটা বড় সমস্যা বটে। তাদের মতে, ‘সকল উপকারভোগীর তথ্যসমৃদ্ধ একটি একীভূত কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার প্রণয়ন করা প্রয়োজন’, এর অর্থ হচ্ছে এই একীভূত শনাক্তকরণ পদ্ধতি তৈরির পেছনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ছাড়া গতি নেই।

এ ছাড়া, ১৫০টি কর্মসূচির মধ্যে ‘বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় কারা ভাতা পাচ্ছেন, তা নির্ধারণ করা জরুরি’ এবং যারা ভাতা পাচ্ছেন আর তার পাশাপাশি যারা সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর বাইরে আছেন, তাদের মধ্যে যোগসূত্র করার জন্য দরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং বিভিন্ন ধরনের ডেটা অ্যানালিটিকস। সুবিধাভোগীর কাছে ভাতা সঠিক সময়ে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে একটা বিশালকার সফটওয়্যার সলিউশন ছাড়া গতি নেই। সেটা করা সম্ভব দেশেই।

সঠিক সময়ে সঠিক সুবিধাভোগীর কাছে ভাতা পৌঁছানো

অনেক পত্রিকায় বলেছেন, সঠিক সময়ে সঠিক সুবিধাভোগীর কাছে ভাতা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য সেবা সংস্থাসমূহের সমন্বয় প্রয়োজন, এ ধরনের সমন্বয় পদ্ধতি তৈরি করতে বিভিন্ন সেবা সংস্থাসমূহের মধ্যে ‘অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস’ স্থাপন করে তার মাধ্যমে কোন মানুষের সাহায্য ছাড়াই সেই সমন্বয়গুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এখানে কোন ধরনের প্রচারণামূলক কার্যক্রম এ ধরনের সিস্টেম থেকে খুব সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব। তবে এ ধরনের ডেটাসেটকে ভালো আউটপুট দেওয়ার জন্য শুদ্ধ ডেটার ইনপুট প্রয়োজন।

‘মিস টার্গেটিং’ এবং সুবিধা বণ্টনের ভারসাম্য

অনেক সময় দেখা গেছে এ সুবিধাভোগী অংশ ও জনগোষ্ঠীর অনুপাতগুলো লক্ষণীয়ভাবে কম অপেক্ষাকৃত দরিদ্র উল্লিখিত বিভাগগুলোয়। কৌশলপত্রে বলা হয়েছে যেহেতু এ ধরনের কর্মসূচি ২৩টা এবং তারও বেশি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত এবং বাস্তবায়ন হচ্ছে সেখানে যারা বাস্তবায়ন করছেন, তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য বিনিময়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সেটা সামগ্রিকভাবে ড্যাশবোর্ডে কোথায় বেশি/কম পরছে সেটার পর্যালোচনা সেভাবে হচ্ছে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, এতে সামাজিক সুবিধা বণ্টনে যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সামগ্রিক উন্নয়ন ভারসাম্যেও একধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের মতো দেশে ডেটার ওপর সেরকম নির্ভরশীলতা না আসায় এ ধরনের অসংলগ্নতা অথবা ভারসাম্যহীন ব্যবস্থাপনা চলতে পারে শুরুর দিকে। আর সে কারণেই আমাদের এই মুহূর্তে প্রয়োজন কিছু ‘রুল বেইজড সিস্টেম’, যেগুলো আমরা তৈরি করে ফেলেছি কৌশলপত্রে। এই মুহূর্তে অ্যালগরিদমের প্রয়োজন নেই, তবে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যে ধরনের ‘রুলসেট’ সুবিধা গ্রহণকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে সেখানে মানুষ সেই নীতিমালাগুলোকে যাতে ভেঙে না ফেলতে পারে সে কারণে কিছু সফটওয়্যার তৈরি করা যেতে পারে শুরুতে। খুবই সাধারণ সিস্টেম, ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’-এর মতো। তবে কেন না, সেটা বলে দিতে পারে সিস্টেম।

একটা পত্রিকা বলেছে, সামাজিক নিরাপত্তা বেট্টনী কর্মসূচির সুবিধা বণ্টনের বেলায় ‘মিস টার্গেটিং’ এক বড় সমস্যা। আমাদের দেশে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ডেটার ব্যবহার সেভাবে শুরু হয়নি। এই ডেটা’র ব্যবহার শুরু হয়েছে কিছু সংস্থায়, তবে সেটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। খেয়াল করা দরকার, দারিদ্র্য নির্মূলে যে ধরনের পরিসংখ্যানগত সুবিধা থাকলে নীতিনির্ধারণে সুবিধা হয়, তার ঘাটতি রয়েছে দেশে। এটা একটা বড় সমস্যা।

ফলে নীতিনির্ধারণকরা যেসব জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাদি দেবার টার্গেট করেন, সেগুলো উপযুক্ত হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। তবে, সবচেয়ে বড় সমস্যা রয়েছে তৃণমূল পর্যায়ে। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে অনেক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। তাই লেখক বলেছেন পত্রিকায়, ‘এর

মধ্য থেকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঠিক সুবিধাভোগী নির্ধারণ মোটেও সুবিধাজনক নয়; আরও কঠিন সবাইকে একসঙ্গে সত্ত্বষ্ট করা'। এখানে আমাদের কাজ করা জরুরি। ব্লকচেইন একটা ভালো সমাধান।

তথ্যসূত্র

১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও কল্যাণকর রাষ্ট্র, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

২. সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা বন্টনে বৈষম্য দূর হোক, শেয়ার বিজ্ঞ, অক্টোবর ৩০, ২০১৭

সর্বজনীন ন্যূনতম আয়, ব্লকচেইন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বাংলাদেশে বিশালাকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

এসব সমস্যার সমাধান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং তার অ্যানালাইসিস। আমরা যখন ডিপ লার্নিং-এর নিউরাল নেটওয়ার্ক চালাই সেখানে হাজার কোটি প্যারামিটার থাকতে পারে। সে হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় আমাদের ১৬ কোটি মানুষের জন্য হাজারো প্যারামিটার কোনো সমস্যা নয়। আমরা সঠিক প্যারামিটার এবং রুলসেটগুলো ঠিকমতো ধরিয়ে দিলে বাকিটা চালিয়ে নেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আগের ডেটা থেকে। এখন 'ওপেন-এআই'-এর 'জিপিটি-৩' 'ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং'য়ের মডেলের যদি ১৭৫০ কোটি প্যারামিটার নিয়ে কাজ করতে পারে, সেখানে বাংলাদেশের মতো বিশালাকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, তার জন্য সমস্যা নয়। আমি বলছি!

আমরা যেভাবেই মডেলকে ট্রেন করি না কেন, সেই মডেল ধীরে ধীরে সূচারুভাবে কাজ করতে পারবে, ডেটা প্রাপ্তি সাপেক্ষে। এভাবেই চালানো যাবে এই বিশালাকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে। যেকোনো দেশের সরকারের পক্ষে বিশালাকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা চালানো সম্ভব নয়, ডেটার ব্যবহার ছাড়া। সেখানে, শুরুতে ব্লকচেইন, সবাইকে শনাক্ত করে একজন দুষ্টকে তার প্রাপ্যতা বুঝিয়ে দেবার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ছাড়া গতি নেই।

মানুষকে সেখানে ব্যবহার করলে দেরি, অন্যায় সুবিধা দেওয়া, অনলাইনেই লাইন ভাঙা এবং সেই 'দলাদলি' শুরু হবে। সত্যি বলতে মানুষের বায়াস আছে, আমারও থাকবে- আমরা তাই মানুষ। যন্ত্রের বায়াস কম, আর

তাই আমরা যন্ত্রের ওপর নির্ভর করি ‘ফেয়ার-প্লেতে’। আমি-আপনি একটা সাইটে অর্ডার দিলে সিস্টেম সেটাকে একটা সিরিয়ালে ফেলে দেয়। আমরা সেটা চাই প্রায় সব জায়গায়। যন্ত্রের কাজ যন্ত্র করবে, তবে মানুষ সেখানে ‘ওভাররাইড’ করতে পারবে, দরকারি ক্ষেত্রে।

সর্বজনীন ন্যূনতম আয়, কত দূরে আমরা?

জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম খরচ

The state gives everyone a set amount of money every month, no matter who they are or what they do. The income cannot be reduced, nor do the recipients have to earn the money in any way. They may, of course, work to earn more money.

—Universal basic income: An option for Europe? DW News

পৃথিবী যেহেতু প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছে, সে কারণে মানুষের প্রচুর কাজ চলে যাবে যন্ত্রের কাছে। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ যন্ত্র এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষ আসছে মানুষের সহায়তায়। ধরুন, আমাদের বাসায় কাপড়চোপড় ধোয়ার জন্য আলাদা কারও সাহায্য না নিয়ে ‘বুদ্ধিমান’ ওয়াশিং মেশিন (যে তার কাজটা ভালো জানে) এ ধরনের কাজগুলো করে ফেলছে বহুদিন আগে থেকে। মানুষের ভুলের কারণে প্রতিনিয়ত যত সড়ক দুর্ঘটনা হয়, তার জন্য ‘সেলফ ড্রাইভিং’ প্রযুক্তির গাড়িগুলো কমিয়ে আনবে সড়ক দুর্ঘটনা মৃত্যুহার। মানুষের কাজ হারানো থেকে মৃত্যুহার কমিয়ে আনা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বটে।

জনগণকে তার চাওয়ার কাছাকাছি আনতে পারা

প্রযুক্তি যেভাবে মানুষের ‘কায়িক’ কাজ কেড়ে নিচ্ছে, সেভাবে এই প্রযুক্তি মানুষের জন্য খুলে দিচ্ছে নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র। মানুষের কাজ প্রযুক্তি কেড়ে নিচ্ছে বলে নয়, তবে একজন মানুষ একটা দেশে জন্মগ্রহণ করলে তার ন্যূনতম আয়-ব্যয়ের হিসেব রাষ্ট্র নিয়ে নিলে সেই মানুষটি তার নিজের স্বপ্নের পেছনে দৌড়াতে পারে। মানুষকে যদি তার প্রতিদিনের খরচের একটা ন্যূনতম অংশ যদি রাষ্ট্র থেকে দেওয়া হয়, তাহলে কি হতে পারে? পৃথিবীব্যাপী ‘ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম’ অর্থাৎ ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়’কে ঘিরে অনেক কাজ হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী। মানুষ কাজ হারালে যেভাবে উন্নত দেশগুলোতে একটা মানুষের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম

সংস্থান রাখে, সেভাবে কাজ করতে শুরু করেছে এই ‘ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম’ ধারণাটি।

বর্তমানের ইউটোপিয়া^{১৮}

তবে ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়’ ধারণাটি নতুন নয়। ইংরেজ দার্শনিক ‘টমাস মোর’ তার এক উপন্যাসে সেই ১৫১৬ সালে একই ধরনের ধারণা দেখিয়েছিলেন। উপন্যাসটির নাম শুনলেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা, তবে সেই জিনিসটা এখন ঘুরে আসছে বারবার। ‘ইউটোপিয়া’ উপন্যাসটার নাম হলেও পুরো ব্যাপারটা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা চিন্তাভাবনা শুরু করেন ১৯৬০-৭০ সালের দিকে। এর প্রয়োগ নিয়ে মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান ১৯৬২ সালে ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়’ সম্পর্কিত ধারণাটাকে একটা ‘নেতিবাচক অথবা ঋণাত্মক আয়কর’ নাম দিয়েছিলেন, যার ফলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের নিচের উপার্জনকারীরা কর পরিশোধের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে পরিপূরক খরচ পাবেন।

সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা এই ঋণাত্মক আয়কর এবং বাৎসরিকভাবে একটা টাকা দেবার বিষয়ে বিভিন্ন শহরে পাইলট স্টাডি চালিয়েছিল। ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে পুঁজিবাদের ধারণায় সেই ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। ভালো কথা হচ্ছে, ১৯৮২ সাল থেকে আলাস্কা তাদের জনগণের বয়স, কর্মসংস্থান বা অন্য কোনো বিধিনিষেধ-নির্বিশেষে, তেল উত্তোলন থেকে লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। ব্যাপারটা এ রকম যে রাষ্ট্রে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে, যাতে জনগণ তার জীবনের সব চাওয়ার কাছাকাছি যেতে পারে। সেটার জন্য সেই মানুষটাকে ‘এনাবল’ করতে যা করা প্রয়োজন, সেটা করবে রাষ্ট্র।

শুরুটা আসতে পারে ‘ঋণাত্মক আয়কর’ দিয়ে

তবে ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়’ এবং ‘ঋণাত্মক আয়কর’- দুটো দুই ধরনের প্রেক্ষিতে কাজ করে।^১ যেহেতু, ‘ঋণাত্মক আয়কর’র একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের নিচের উপার্জনকারীরা কর পরিশোধের পরিবর্তে সরকারের কাছ

১৮. Pandemic speeds largest test yet of universal basic income, Carrie Arnold, Nature

থেকে টাকা পাবেন, সেখানে ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়’-এর জন্য কোনো ধরনের শর্ত থাকবে না।

উদাহরণ হিসেবে, বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকার ওপরে আয় হলে যদি কর দিতে হয়, সেখানে এই সীমার নিচে একজন মানুষ যত টাকা কম আয় করবেন, তত টাকা ওই ব্যক্তি সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত পাবেন। কারণ যদি বাৎসরিক ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আয় হয়, তাহলে উনি বছর শেষে ৯০ হাজার টাকা ফেরত পাবেন।

‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়’-এর পাইলট প্রজেক্ট

শুরু হয়েছে কাজ

Guaranteed income, reconceived as basic income, is gaining support across the spectrum, from libertarians to labor leaders. Some see the system as a clean, crisp way of replacing gnarled government bureaucracy. Others view it as a stay against harsh economic pressures now on the horizon.

— Who really stands to win from universal basic income, Newyorker, Nathan Heller, 2018

বর্তমানে, যেহেতু অটোমেশন মানুষের অনেক চাকরিকে প্রতিস্থাপিত করেছে, ফলে এই ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়’ ব্যাপারটা আবার ফিরে আসছে অনেক জায়গায়। এই ধারণাটা নিয়ে বেশ বড় অ্যাডভোকেসি গ্রুপ কাজ করছে পৃথিবী ঘিরে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই ধারণার প্রচুর পাইলট হয়েছে পৃথিবীব্যাপী। কেনিয়া, ভারত, নামিবিয়া, ব্রাজিল, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট, ফিনল্যান্ড এবং আরও বেশ কিছু দেশ এই সর্বজনীন ন্যূনতম আয় নিয়ে ছোট ছোট প্রজেক্ট করে ভালো আউটপুট পেয়েছে।

নামিবিয়াতে যেমন ১০০০ মানুষের জন্য প্রতিমাসে ১০০ নামিবিয়ান ডলার দিয়ে দেখা গেছে স্কুলের উপস্থিতি ৯২ শতাংশে পৌঁছেছে। বাচ্চাদের অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো ৪২% থেকে কমে নেমে এসেছে ১০ শতাংশে। একই ধরনের ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে ক্যানাডিয়ান একটা স্টাডিতে। সেই স্টাডিটার নাম ছিল ‘মানিটোবা বেসিক অ্যানুয়াল ইনকাম এক্সপেরিমেন্ট’। সেখানে প্রেইরি এলাকার দুস্থ পরিবারগুলোর মধ্যে এ ধরনের পরীক্ষায় মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে অনেক। এর পাশাপাশি বাচ্চাদের

স্কুলে থাকার সময় বেড়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার শতাংশ কমে ছিল প্রায় ৮.৫ শতাংশ।

কোভিড-১৯ এর শাপে বর, স্পেন

কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের শিথিয়েছে অনেক। এই মহামারির সময় স্পেনের সরকার পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনৈতিক একটা পরীক্ষা শুরু করেছে। এই সময়ে স্পেনের দুস্থ পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য প্রতিমাসে ১ হাজার ইউরোর মতো খরচ পাঠানোর জন্য একটি ওয়েবসাইট দিয়ে সেবা শুরু করেছে। এই প্রোগ্রামের আওতায় প্রায় সাড়ে ৪ লাখ পরিবারকে সহায়তা প্রদান করার জন্য এই প্রকল্পটির চালু করেছে।

এই পদক্ষেপটি বিশেষ করে মহামারির সময় অর্থনৈতিকভাবে খারাপ অবস্থায় পড়া দুস্থ পরিবারগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা অসাধারণ পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছে। এই মহামারির সময় প্রচুর মানুষ তাদের চাকরি হারিয়েছে এবং এর ফলে দারিদ্র্যের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে বেশির ভাগ নাগরিক।

এই ব্যবস্থায় বিশেষ করে, মহামারির সময়- আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছে নতুন করে ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়ের ব্যাপারটাকে ঘিরে। আমার ধারণা, এই মহামারির সময় আমাদের মতো অনেক দেশই তাদের ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়’-এর কাছাকাছি ‘ভ্যারিয়েন্ট’ কিছু ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেছে এর মধ্যেই।

তবে, মহামারির আগে থেকেই ওই দেশের বামপন্থী কোয়ালিশন সরকার ‘সর্বজনীন ন্যূনতম আয়’র মতো আরেকটা স্কিম নিয়ে প্রস্তাবনা দিয়েছেন। এই নতুন পদ্ধতিতে প্রতিটি যোগ্য পরিবারের জন্য একটি নির্দিষ্ট মাসিক টাকা বরাদ্দ থাকবে, যার সঙ্গে কোনো আলাদা বিধিনিষেধের সংযোগ থাকবে না। যাকে আমরা বলি ‘নো স্ট্রিং অ্যাট্যাচড’। এতে যাতে এই ভাতার প্রাপকগণ দারিদ্র্যে আটকে না থাকে, তাদের প্রাথমিক চাহিদা মেটানোর জন্য যতটুকু দরকার, সেগুলো তারা পাবে সেই তহবিল থেকে। এতে স্পেন সরকারের প্রতিবছর প্রায় ৩ বিলিয়ন ইউরো খরচ হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লাখ দরিদ্র পরিবার, ২৫০০ টাকা

মহামারির মধ্যে আমাদের দেশি-বিদেশি প্রচুর ডেটার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। অন্য দেশগুলো কী পারছে, আর আমরা কেন পারছি না, সেটার একটা ভালো ধারণা এসেছে এর মধ্যে। তবে, সর্বজনীন ন্যূনতম আয় অথবা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য কিছু ধারণার ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে এগিয়েছে আমাদের দেশ। সে কারণে বর্তমানে সরকার এই মহামারির জন্য বেশকিছু প্রকল্প, বিশেষ করে মহামারিতে যারা সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল থেকে আড়াই হাজার টাকার ভাতা নিয়ে শুরু হয়েছে কাজ। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

এই করোনার কারণে, সারা দেশের ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লাখ দরিদ্র পরিবারকে এককালীন আড়াই হাজার টাকা করে দেবার জন্য শুরুতেই ১ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা ছাড় করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এই বছরের ১১ মে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের দুই শাখা থেকে এ অর্থ ছাড় করা হয়েছে। যেটা ভালো হয়েছে, দ্রুত টাকা পৌঁছানোর জন্য পরিবারগুলোকে টাকা দেওয়া হয়েছে মূলত মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে। এখানে এমএফএস সার্ভিসের জন্য সরকারকে খরচ করতে হবে সাড়ে সাত কোটি টাকা।^{১৯}

ডেটা সায়েন্স এবং অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী

মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা

বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নব্যবস্থার অভাব। জাতীয় পর্যায়ে বা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মসূচি পর্যায়ে কোনো ক্ষেত্রেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কর্মসম্পাদন নিয়মিত পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন শীর্ষক কিছু সমীক্ষা সীমিত পরিসরে দাতাদের সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে। এসব সমীক্ষার ফলাফল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের জন্য সুগঠিত ও কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে।

—জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তাকৌশল: বাংলাদেশ

১৯. কারা পাচ্ছেন সরকারের দেওয়া ২৫০০ টাকা, সময় টিভি, ১২-০৫-২০২০

এই মুহূর্তে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খুঁজে বের করতে হলে যা প্রয়োজন, তার অধিকাংশ তথ্য আছে বিভাগীয় কমিশনার এবং ডিসি অফিসে। এর পাশাপাশি প্রতিবছর উপজেলা ত্রাণ কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসে এ ধরনের লিস্ট যাচাই-বাছাই হয় প্রয়োজন পড়লে। আমি সেসব তথ্যকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ডেটা দিয়ে ক্রস-ম্যাচিং করিয়ে এই অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঠিকমতো বেছে নেওয়া সম্ভব। এই ডেটা অ্যানালাইসিস আগের সব তথ্যগুলোকে আরও ‘ফলপ্রসূ’ করার জন্য ব্যবহার করা হবে। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এখন মোবাইল ফোন পৌঁছে গেছে। এটা একটা বড় ডেটা পয়েন্ট।

এ ছাড়া বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের ‘ইউনিভার্সাল সার্ভিসেস অব্লিগেশনস ফান্ড’-এর আদলে ‘সোশ্যাল অব্লিগেশনস ফান্ড’ থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এ ধরনের মোবাইল ফোন কিনে দেওয়া সম্ভব। ফলে, সেই মোবাইল ফোনের বেনামী ডেটা (অর্থাৎ সেই ডেটাতে গ্রাহকের ফোন নাম্বারগুলো থাকবে না শনাক্তকরণ চিহ্ন হিসেবে) ব্যবহার করে একটা ফোনের প্রতিদিনের কার্যপরিধি, যেমন কখন চালু হয়, কখন বন্ধ হয়, উনার বাসা থেকে কত দূর পর্যন্ত যান, উনার ফোনে কতগুলো কল আসে এবং কতগুলো কল যায়, ফোনের রিচার্জ ভ্যালু এবং কত দিন অন্তর টপ আপ করা হয়, মোবাইল ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস ব্যবহার করেন কি না, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবহার করে আমাদের ক্রাইটেরিয়ামাফিক ‘যোগ্য’ মানুষকে বের করা কোনো সমস্যাই নয়। এ ধরনের বেশ কয়েকটি কাজ করেছি এবং দেখেছি বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশে। এর ফলাফল অবিশ্বাস্য।

বুদ্ধিমান ভর্তুকি বণ্টনব্যবস্থা

উদীয়মান অর্থনীতিতে শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং কৃষি ভর্তুকি

কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ভর্তুকি

কয়েকটি খবর। আমাদের দেশে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ২০০ কোটি টাকা প্রণোদনার কয়েকটা প্যাকেজ নেওয়া হয়েছে।

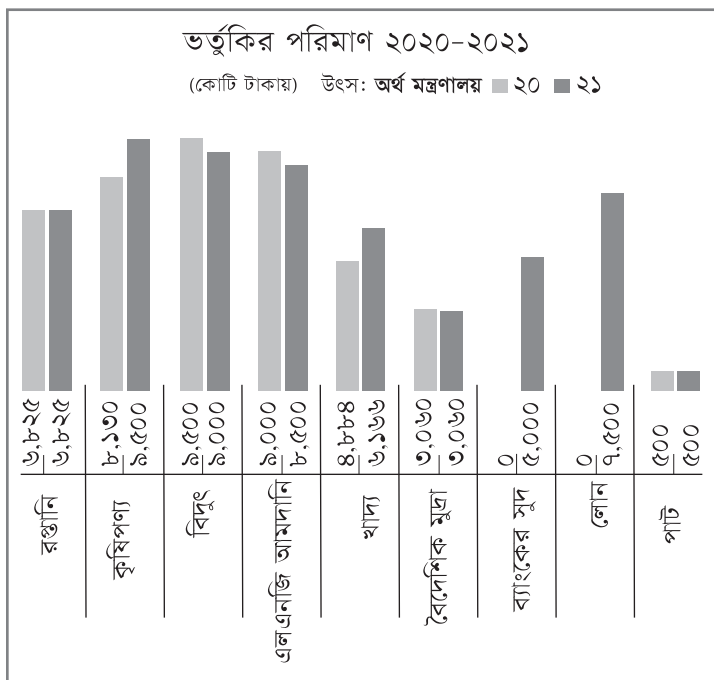
আচ্ছা ভর্তুকি কাকে বলে? এবং প্রণোদনা কেন দেওয়া হয়? অথবা, ভর্তুকি দেবার খাতগুলো নির্দিষ্ট কি না?

আমরা এভাবে বলতে পারি, কোনো জিনিসের মূল্য নির্ধারিত করার পর যদি সেই মূল্য পূর্ণভাবে কোনোভাবে আদায় না হয়, তাহলে যতটুকু বাকি থাকল সেটা নিজ থেকে পরিশোধ করার নামই ভর্তুকি। এ ব্যাপারটি একজন মানুষের জন্য চিন্তা না করে সেটাকে সরকারের পক্ষে হলে সেটাকে আরও বড় ফ্রেমওয়ার্কের নেওয়া যেতে পারে। তবে, সরকারি ভর্তুকি কীভাবে দেওয়া যেতে পারে, সেটা নিয়ে প্রচুর গবেষণা আছে খ্যাতিমান জার্নালগুলোতে।

যেহেতু, ভর্তুকি বণ্টনব্যবস্থা একাই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মতো একটা বড় ব্যবস্থাপনা, সে কারণে এই ব্যবস্থাপনায় পেছনের ডেটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা ছাড়া পুরো ব্যাপারটা নিয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করা ঝামেলাপূর্ণ।

উদীয়মান অর্থনীতিতে শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও কৃষি ভর্তুকি

বাংলাদেশের মতো উদীয়মান একটা অর্থনীতি যেখানে শিল্প বিদ্যুৎ জ্বালানি এবং কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে সরকার প্রতিবছর একটা বিশাল টাকা ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে ২৬ শতাংশ যা প্রায় ৫৭ হাজার কোটি টাকার মতো।^{২০} তবে, এই ভর্তুকির মধ্যে কীভাবে কোন খাতে কোন নীতিমালার আঙ্গিকে বিভিন্ন ভর্তুকিগুলো যাচ্ছে, সেটা নিয়ে একটা নীতিমালা থাকতেই পারে। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অবকাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন এসেছে, যার মধ্যে ভর্তুকির পরিমাণ অনেকখানি ছিল। এখানে একটা ছবি দেখি এই বছর এবং ২০২১ সালে কী হতে পারে?



চিত্র ১২: খরচের একটা ধারণা, ২০২০-২১

^{২০}. Subsidy spending climbs for crisis-related expenditure, ১৯ জুন ২০২০, দ্য ডেইলি স্টার

রপ্তানি, খাদ্য, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও কৃষি—এই পাঁচ খাতে সরকার প্রতিবছর কী পরিমাণ ভর্তুকি দেয়, তার একটি তুলনামূলক ধারণা তৈরি করা যায় গত বছরগুলোর ডেটা থেকে। তবে এখানে আমার ধারণা হচ্ছে, এই ভর্তুকি কীভাবে কোন খাতে এবং কোন নীতিমালায় যাচ্ছে, সেই ভর্তুকির বণ্টনব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা যায় পেছনের সব ডেটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে। যেহেতু, সমাজে বৈষম্য এবং দারিদ্র্য দূর করার জন্য সরকার বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি দিয়ে থাকে, সে কারণে এ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে আমাদের পেছনের ডেটা ব্যবহার করতে হবে।

ভর্তুকিতে দরকার ‘সরবরাহ থেকে প্রান্তিক’ পর্যায় পর্যন্ত ম্যাট্রিক্স

একটা উদাহরণ নিয়ে কথা বলি। সারের ভর্তুকি আমাদের প্রায় জিডিপি’র ১ শতাংশের সমান। এই বছরে অনেক পত্রপত্রিকা দেখে যা বুঝলাম, কৃষকের খরচ কমিয়ে আনতে গত এক দশকে সারের মূল্য কমানো হয়েছে পাঁচবার। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে, প্রান্তিক পর্যায়ে সারের প্রয়োজনীয়তার আসল গণনা করতে পারলে এই ভর্তুকি কমানো সম্ভব। তবে এটা একটা বিশাল কাজ। এর জন্য সরকারের পাশাপাশি সার প্রস্তুতকারক ও আমদানিকারক উভয়কেই আমাদের বিভিন্ন এলাকার জলবায়ু, পরিবেশগত ধারণা, এর প্রাসঙ্গিক নীতিমালা এবং মূল্য ম্যাট্রিক্সের পর্যালোচনা করে সঠিক হিসেব প্রয়োজন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ছাড়া এ ধরনের ডিটেইল লেভেলে হিসেব করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এদিকে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলোর চাপ উপেক্ষা করে অব্যাহত রেখেছে এই ভর্তুকি সব সরকার। গত এক যুগে শুধু সারেরই প্রায় ৭৪ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। এটার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন একটা ‘এন্ড টু এন্ড’ ডেটাভিত্তিক অপারেশন। আসল ভর্তুকির হিসেব বের করতে।

তবে এ ধরনের সিস্টেমে আরও দক্ষতা ও নির্ভুলতা তৈরি করতে সরকারি ডেটার ইনপুট ব্যবহার করে এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে জলবায়ু, পরিবেশভিত্তিক বিষয়গুলোকে একসঙ্গে আনতে সবার সাহায্য দরকার। এগুলো বিবেচনা করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে সমন্বয় প্রয়োজন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেমগুলোর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ম্যাট্রিক্সের পাশাপাশি প্রস্তাবিত এবং আসলে কতটুকু

ভর্তুকি লাগবে, যা মাসিক ও জেলাভিত্তিক সারের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করতে পারে।

এই ব্যবস্থাপনা মানুষের সময় কমাবে এবং সিস্টেমের হিসেবের খানুলারিটি বাড়িয়ে তার পাশাপাশি নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারবে। জেলাভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের পরে, প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত সার পরিবহনের জন্য সংস্থাগুলোকে সেই কৃষিভিত্তিক দ্রব্যের সরবরাহ করতে কতটুকু ভর্তুকি লাগবে, সেটাও হিসেবে আসবে সেই ড্যাশবোর্ডে।

নবায়নযোগ্য শক্তি এবং এর ভর্তুকি

তবে, ইদানীং নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে পুরো পৃথিবীতে বিশাল কাজ চলছে। এখানে সৌর এবং বিদ্যুৎশক্তি নিয়ে দেশগুলো অনেক ভর্তুকি দিচ্ছে। কারণ, পৃথিবীজুড়ে ‘কার্বন এমিশন’ বেড়েছে বহুগুণ। এই সমস্যাকে মনে রেখে তৈরি হয়েছে জলবায়ুবিষয়ক বিশাল ফান্ড। এরপরও একটা বিশাল ভর্তুকি চলে যাচ্ছে এই নবায়নযোগ্য শক্তি জেনারেশনে। কারণ, এখনই এটা ঠিক না হলে বিপদে পড়বে মানব সভ্যতা।

যেহেতু বাংলাদেশেও এই শক্তি জেনারেশনের প্রচুর ভর্তুকি যাচ্ছে, এখানে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ খুব ভালোভাবে সাহায্য করতে পারে এর ব্যবস্থাপনায় এবং প্রেডিকশনে। তবে, এটা ঠিক যে নবায়নযোগ্য শক্তি ‘জেনারেট’ করতে আমাদের বসে থাকতে হয় আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে। সেটার জন্য দরকার ভালো প্রেডিকশন সিস্টেম।

বাংলাদেশে যদিও এই নবায়নযোগ্য শক্তিকে পুরোপুরি গিড়ে আনতে সময় লাগছে, তবে সামনের বছরগুলোতে এই নবায়নযোগ্য শক্তি, বিশেষ করে সৌরশক্তি ভালো কাজে দেবে এবং এখন দিচ্ছে। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে কবে, কখন, পুরো সূর্যের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, সেই প্রেডিকশন নবায়নযোগ্য শক্তি সেক্টরকে ইনভেস্টরদের ভালো ধারণা দিতে পারে।

অন্যান্য দেশে এই নবায়নযোগ্য শক্তি সেক্টরে এই মুহূর্তে ভর্তুকির প্ল্যান ঠিকমতো কাজ করলেও লম্বা সময় ধরে এই জিনিসটা কাজ করবে না। আর সে কারণেই প্রেডিকটিভ অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে বিশেষ করে ১২

থেকে ২৪ মাসের ‘স্কাডা’ তথ্য নিয়ে পুরো দেশের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ‘নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর গ্রিড সিস্টেম’ তৈরি করা যায় আমাদের এখানেই।

ভর্তুকি বণ্টন নীতিমালা এবং তার ব্যবস্থাপনার ড্যাশবোর্ড

ভর্তুকি বণ্টন নীতিমালা এবং তার ব্যবস্থাপনা^{২১}

এই ভর্তুকি বণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে খাতভিত্তিক যখন ভর্তুকি বণ্টন হচ্ছে, সেখানে একই ভর্তুকি বারবার কয়েকটা খাতে গেলে সেখানে ভর্তুকির অপচয় হবার আশঙ্কা থেকে যায়। এর পাশাপাশি রপ্তানি খাতে- বিশেষ করে, রপ্তানি বাড়তে যে ভর্তুকিগুলো দেওয়া হয়, সেগুলো কার্যকর কি না এবং তা বিনিয়োগের থেকে ভালো ফলাফল নিয়ে আসছে কি না, সেটার বেশ ভালো ধারণা দিতে পারবে পেছনের ডেটা ও মডেল সিমুলেশন। তবে এটা ঠিক যে, খাতভিত্তিক যখন ভর্তুকি যাচ্ছে সেখানে বিভিন্ন খাতে কত ভর্তুকি হলে কতটুকু অর্জিত হচ্ছে, সেটা জানার জন্য ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আনা যেতে পারে।

আমরা কী চাচ্ছি এই ব্যবস্থাপনায়?

বিভিন্ন খাতে কত ভর্তুকি হলে কতটুকু অর্জিত হচ্ছে, সেটা জানা জরুরি।^{২২}

এতে শুধু ভর্তুকি ব্যবস্থার উন্নতি নয়, এর পাশাপাশি খাতগুলোর মধ্যে সমতা এবং স্বচ্ছতা বাড়বে, বিশেষ করে যেগুলো দেখা যাবে সরকারি নীতিনির্ধারণী ড্যাশবোর্ডে। একটা জিনিস দেখা গেছে যে যদিও সামগ্রিক অর্থনীতিকে ভর্তুকি মাঝেমধ্যে চাপে ফেললেও এই ভর্তুকি আবার অন্যান্য অনেক খাতের চাপ কমাতে সাহায্য করে।

ভর্তুকি বণ্টনব্যবস্থার দুই ভাগ

এখন কথা আসতে পারেন কীভাবে এই ভর্তুকি বণ্টন করা যেতে পারে? ধরে নিই, আমরা বিদ্যুৎ খাতের কথা বলছি। দুভাবে এই ভর্তুকি বণ্টনব্যবস্থা চালু থাকতে পারে বিদ্যুৎ খাতকে নিয়ে। প্রথমত, বিদ্যুৎ জেনারেশন করার জন্য যত কাঁচামাল রয়েছে, সবগুলোকে ভর্তুকি দেওয়া

২১-২২.

জাতীয় ভর্তুকি নীতিমালা তৈরির আহবান, ৩ মে ২০১৫, ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে সিপিডির সংলাপ, প্রথম আলো

যেতে পারে। যেমন, বিদ্যুৎ জেনারেশনে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, ডিজেল, ফার্নেস তেল ইত্যাদিতে ভর্তুকি প্রদান করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভর্তুকি চলে আসবে। দ্বিতীয় ব্যাপারটা জনপ্রিয় অনেক দেশে। বিশেষ করে জনগণের কাছে সরাসরি ভর্তুকি বণ্টন ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করেছি একটু পরেই। এই বণ্টনে প্রত্যক্ষ সুবিধা পাবে জনগণ।

শস্য ও ফসল উৎপাদনে ঋণের সুদহার ৪ শতাংশ

ধান, গম, আলু, ভুট্টাসহ সব ধরনের শস্য ও ফসল উৎপাদনে ঋণের সুদহার ৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন ঋণের পাশাপাশি আগের ঋণেও এই রেয়াতি সুদহার কার্যকর হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক আজ সোমবার এ নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

কৃষিঋণের সাধারণ সুদহার ৯ শতাংশ, এর ৫ শতাংশ ভর্তুকি দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে কৃষকের সুদ কমে হবে ৪ শতাংশ। ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত এ সুবিধা পাবেন কৃষকেরা।

এর ফলে কৃষি খাতে সব ধরনের ঋণের সুদহার কমে ৪ শতাংশ হলো। এর আগে ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, করোনাভাইরাসের কারণে কৃষকের জন্য দেওয়া ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের সুদহার হবে ৪ শতাংশ। ওই তহবিল থেকে চলতি মূলধন পাবে মৌসুমভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মাছ চাষ, পোলট্রি ও ডেইরি এবং প্রাণিসম্পদ খাত। তবে শস্য ও ফসল খাত এর বাইরে ছিল। এ ছাড়া আগে থেকে আমদানি বিকল্প ফসল, ডাল, তেলবীজ, মসলা-জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ৪ শতাংশ সুদে কৃষকেরা ঋণ পাচ্ছেন।

—কৃষকের সব ঋণে সুদ ৪ শতাংশ, প্রথম আলো ২৮ এপ্রিল ২০২০

ভোক্তাকে সরাসরি ভর্তুকি প্রদানের ধারণা, শনাক্তকরণ পদ্ধতি

জনগণের একটা অংশ, যারা এই ভর্তুকির মধ্যে পড়বেন, সেই ভোক্তাদের বিদ্যুৎ কিনতে হবে আসল দামে। পরবর্তী সময়ে সরকার সেসব ভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকির টাকা পাঠিয়ে দেবে, যারা সেই ভর্তুকি পাওয়ার যোগ্য, নীতিমালা অনুযায়ী। এই দ্বিতীয় পন্থায় সরকারের কাছে সত্যিকারের ডেটা থেকে দেখা যাবে, কারা কারা এই ভর্তুকির মধ্যে পড়েছেন, তাদের বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যতে তারা সেই ভর্তুকির মধ্যে পড়বেন কি না।

পাশাপাশি, যদি কোনো এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে তাহলে সরকারের কাছে ডেটা অনুযায়ী কারা কারা ভর্তুকি পাবেন এবং কাদের

আসল সাহায্য দরকার, তাদের সব ডেটা চলে আসবে ড্যাশবোর্ডে। এখানে প্রয়োজন আগের শনাক্তকরণ পদ্ধতি।

ভোক্তাকে সরাসরি ভর্তুকি প্রদান

‘Direct Benefit Transfer’ (DBT) is an attempt to change the mechanism of transferring subsidies to the end consumers and not to route them through utilities. It shall be designed to provide cash subsidies to lifeline customers, rural and poor families for the use of electricity and avoid subsidy leakage. Cash payments are made from the government directly to families covered under the electricity subsidy programme so as to decrease overheads and corruption.

Large fuel subsidies make the country’s fiscal position highly vulnerable to changes in global energy prices, which in a way provides benefits to low-, medium- and high income groups. Energy subsidies are provided in order to help the poor and low-income household groups. DBT focuses on the low-income segment of households and thus can be a more accurate way to provide relief to such groups and will also bring about savings through reduction in the subsidies provided by the government. An indicative process which may be followed for DBT is illustrated alongside.

—Transforming the power sector in Bangladesh, Bangladesh Independent Power Producers’ Association (BIPPA), PWC India

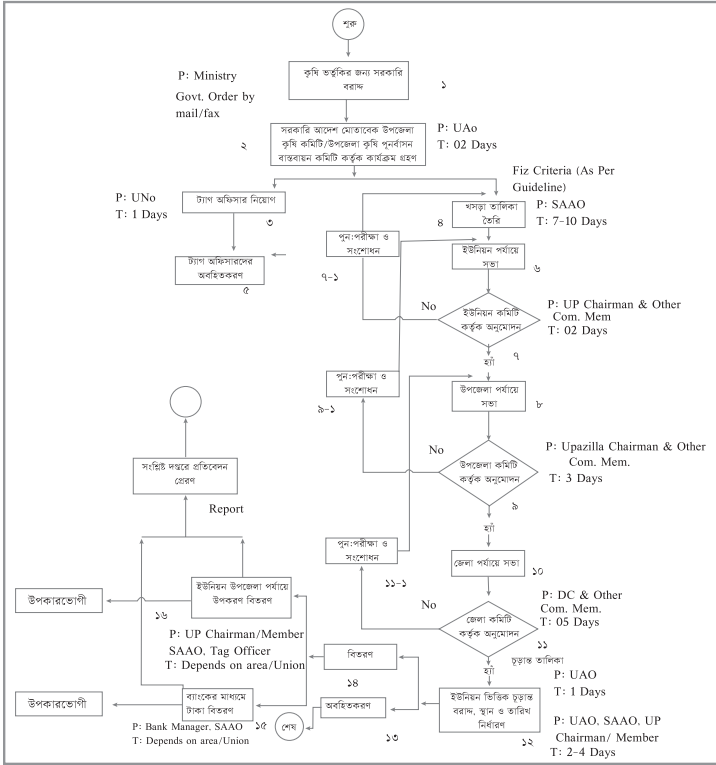
ভোক্তাকে সরাসরি ভর্তুকি প্রদান একটা চমৎকার জিনিস হবে যখন প্রশাসন ‘ডেটা ড্রিভেন’। ভর্তুকির সরাসরি হিসেব আসবে আপনার হাতে। সেটা নিয়ে আসছি সামনে।

ভোক্তাকে সরাসরি ভর্তুকি প্রদানের ধারণা, শনাক্তকরণ পদ্ধতি

মাঠপর্যায়ে খসড়া তালিকা

একদম মাঠপর্যায়ে, উপজেলা ও জেলাপর্যায়ের কৃষি অফিস থেকে কৃষিতে ভর্তুকি ও উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করার জন্য কাজ হচ্ছে অনেক আগে থেকেই। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে কৃষি সরঞ্জামাদি কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের মধ্যে রাখার এবং উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য বিভিন্ন সময় সরকারের দেওয়া ভর্তুকি উপকরণাদি কৃষকদের মধ্যে

বিতরণের জন্য অনেক ধাপে কাজগুলো করা হয়। তার একটা ধারণা আমরা নিচের ছবিতে দেখতে পারি।



চিত্র ১৩: ভর্তুকি বণ্টনের জন্য প্রসেস-ফ্লো, কৃতজ্ঞতা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মাঠপর্যায়ে এ ধরনের তালিকা তৈরি ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সভায় অনুমোদন এবং উপজেলা কমিটিতে পাঠানো হলেও সেটাকে উপজেলা পর্যায়ে সভা ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। সেই অনুমোদনের ভিত্তিতে জেলা কমিটিতে অনুমোদন ও উপজেলাভিত্তিক বরাদ্দ দেওয়া হয়। আমার ধারণা মতে, এই তালিকা তৈরিতে ব্লকচেইনভিত্তিক প্রযুক্তি এবং জাতীয় শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগুলোকে একসঙ্গে করলে এ ধরনের তালিকা সামনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

যেহেতু প্রতিটা মানুষের অবস্থানের পরিবর্তন হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং ডেটার সঙ্গে মোবাইলভিত্তিক ডেটা এবং পরিসংখ্যান ব্যুরো ‘প্রক্সি মিনস’ ডেটার মাধ্যমে এই তালিকাগুলো প্রতিনিয়ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপডেট হবে।

আমরা ভর্তুকি ব্যাপারে বেশ কয়েকটি পত্রিকার খবর দেখতে পারি।

কৃষি যন্ত্রপাতি কেনায় ভর্তুকি বন্ধ, বিপাকে কৃষক

কৃষি যন্ত্রপাতি জনপ্রিয় করার জন্য তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে একটা প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছে সরকার। ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, থ্রেসার, রিপার, কমবাইন্ড হার্ভেস্টার কেনা হবে প্রকল্পের আওতায়। বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা বাদে দেশজুড়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের আওতায় হাওর ও লবণাক্ত জেলায় ৭০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হবে। অন্যান্য জেলায় দেওয়া হবে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি। কৃষক যেসব যন্ত্র পছন্দ করবেন সেগুলোই দেওয়া হবে। জোর করে কৃষি যন্ত্রপাতি চাপিয়ে দেওয়া হবে না। কৃষক গ্রুপের সদস্যরাই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

যাতে কেউ এই সুবিধা নিয়ে অন্যজনের কাছে কৃষিযন্ত্র বিক্রি করে না দিতে পারেন সেজন্য কৃষি কার্ড রয়েছে এমন কৃষকেরাই কেবল ভর্তুকি পাবেন।

—মফিজুল সাদিক, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

নিচের এই খবরটি ভারতের। তারা সর্বজনীন ন্যূনতম আয় নিয়ে কথা বলছে।

সারের ভর্তুকি সরাসরি কৃষককে দিতে সুপারিশ

কেন্দ্রীয় সরকার... প্রকল্পে নথিভুক্ত দেশের প্রায় ৯ কোটি কৃষককে বছরে তিন দফায় বছরে ৬০০০ টাকা করে দিচ্ছে। সিএসপিআর সুপারিশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র পেলে, সারের ভর্তুকি নিয়ে দেশের প্রতিটি কৃষক পরিবার বছরে ১১০০০ টাকা করে পাবেন, যা প্রস্তাবিত ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম বা সর্বজনীন ন্যূনতম আয়ের প্রায় সমান। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ‘সারের ভর্তুকির টাকা সরাসরি কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, এতে কৃষকরা নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন কী সার কিনবেন।’

—২৪ সেপ্টেম্বর, এইসময়, ইন্ডিয়া টাইমস

এই খবরটা আমাদের কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ নিয়ে।

কৃষকদের কার্ড দিচ্ছে সরকার

বাংলাদেশে কৃষিখাতে ভর্তুকির টাকা সরাসরি কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

কৃষি কার্ডের আওতায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ডিজেলের জন্যে ভর্তুকি পাবেন ৮০০ টাকা, আর মাঝারি কৃষকরা পাবেন ১০০০ টাকা করে। মি. আলী বলছেন যে কৃষকদের মাঝে সহায়তা বিতরণ করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের একটা বড় ভূমিকা থাকবে।

তিনি বলেন, কৃষকরা ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলবেন এবং কৃষকদের মাঝে যে সহায়তা বিতরণ করা হবে, তার টাকা সরকার ওই অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবে, যাতে স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না ওঠে।

—ওয়ালিউর রহমান মিরাজ, বিবিসি বাংলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বেশ পুরোনো খবর, তবে তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রান্তিক কৃষকের হাতে ডিজিটাল কৃষি কার্ড

প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র কৃষকের কৃষিঋণের অর্থ ‘এ-কার্ডে’ (ডেবিট কার্ড) পৌঁছে যাচ্ছে। কৃষক মোবাইল ফোনের সাহায্যে ‘এ-কার্ড’ দিয়েই সার, বীজ, কীটনাশকসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ প্রয়োজনমাত্রিক কিনতে পারছেন। তারা ঋণ পরিশোধে ছয় মাস সময় পান। এতে ফসল তোলার পরই বিক্রির জন্য তাড়াহুড়ো করতে হয় না। ফলে বাজারে ভালো দাম ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন কৃষকেরা। বেসরকারি সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ ও এমপাওয়ারের কারিগরি সহায়তায় ঢাকা আহছানিয়া মিশনের ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর, ভোলা ও খুলনার চারটি উপজেলার দেড় হাজার কৃষক পরীক্ষামূলকভাবে এ-কার্ডের মাধ্যমে এই সুবিধা পাচ্ছেন। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষিঋণ ও কার্ডের সেবা দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া। এক বছর ধরে প্রান্তিক চাষিরা সহজ শর্তে ও ১০ শতাংশ সুদে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ পাচ্ছেন। ঋণের টাকা কৃষকের এ-কার্ডে জমা থাকে। মূলত কৃষকের ১০ টাকার ব্যাংক হিসেবের বিপরীতে কার্ডটি ইস্যু করা হয়।

—৮ ডিসেম্বর ২০১৭, প্রথম আলোর গোলটেবিল আলোচনা, প্রথম আলো

নতুন আয়কর পদ্ধতি: পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট

বুদ্ধিমান আয়কর সংস্থা এবং তার কাজ

আয়কর আইনি নীতিমালা, পাল্টায় দ্রুত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আয়করের অংশে একটা ছোট ধাক্কা খেলাম। একজন (একজন ব্যক্তি অথবা একটা সংস্থা) আয়কর ঠিকমতো প্রদান করছেন কি না সেটা জানার জন্য ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ এখন একটা বড় হাতিয়ার। আয়কর নীতিমালার হাজারো বিধি এবং ‘এসআরও’, চালান এবং আইনি ধারা পড়ে একমাত্র কৃত্রিম বুদ্ধিমানই পারবে যেকোনো আয়কর সঠিকভাবে নিরূপণ করতে। আমার নিজের আয়কর, বেতন, গাড়ির নীতিমালা পড়তে পড়তেই বুঝে গেলাম এই নীতিমালা খুব পাল্টায়, অল্প সময়ে। একেক সময়ে একেক নিয়ম। এগুলো মনে রাখা কষ্ট মানুষের পক্ষে, তাই এখন খুব দাম আয়কর আইনজীবীদের।

তবে যে জিনিসটা বুঝতে পারছি, সামনে সবকিছুই করবে সফটওয়্যার, যার নখদর্পণে থাকবে সব আয়কর আইনের অলিগলি। এটা সম্ভব। এ ধরনের সফটওয়্যারের কাজও দেখেছি আমি। তবে এটা ঠিক যে, দেশের সর্বজনীন সব উন্নয়ন কাজগুলোর (ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সামাজিক উন্নয়ন) জন্য যে ধরনের ‘ক্যাশ-ফ্লো’ অর্থাৎ টাকা পয়সার প্রয়োজন তার জন্য আয়কর ব্যবস্থার প্রসেস অটোমেশন, বিশেষ করে সঠিক আয়কর নিরূপণ অতীব জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের মতো দেশগুলোর জন্য।

২৫ বছর ধরে পরিসংখ্যানের ব্যবহার- ডেটা অ্যানালিটিকস

পৃথিবীর বড় বড় আয়কর সংস্থাগুলোর কেস স্টাডি পড়তে গিয়ে দুটো জিনিস বুঝলাম। ১. আয়কর সংস্থাগুলো গত ২৫ বছর ধরে কিছু ফর্মে ডেটা অ্যানালিটিকস চালিয়ে আসছেন সঠিক আয়কর নিরূপণের জন্য। সেটা বর্তমানের ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ না হলেও পরিসংখ্যানের অনেক টুল ব্যবহার করে আসছেন এই কাজে। ২. আয়কর সংস্থার মূলত দুটো কাজ। বিশেষ করে এই একবিংশ শতাব্দীতে। প্রথমত, যারা আয়কর দিচ্ছেন, তাদের ট্যাক্স ‘কমপ্লায়েন্স’ অর্থাৎ হাজারো নীতিমালা মেনে ঠিকভাবে আয়কর প্রতিপালন করছেন কি না, সেটা ঠিকমতো অ্যানালাইসিস করা। দ্বিতীয় ব্যাপারটায় পরে আসছি।

অ্যানালিটিকস ও অভিজ্ঞতা

The scope of advanced analytics is now expanding into new areas, going beyond identifying suitable cases for audit to include methods of enforcing filing and payment compliance, providing better taxpayer service and debt management, and informing policy at a more strategic level.

—Artificial intelligence in taxation, A case study on the use of AI in government, BCG

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এখানে সেই আয়কর দেওয়ার মধ্যে অবৈধ ‘আচরণ’ অর্থাৎ প্যাটার্ন শনাক্তকরণ পদ্ধতি— একজন আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এই বছর কত টাকা আয়কর হতে পারে, সেটার একটা প্রেডিকশন তৈরি করে প্রদানকারী মূল টাকার সংখ্যার সঙ্গে মেলালে এই ব্যাপারটি সহজে বোঝা যায়। এর পাশাপাশি, শুধু মানবসম্পদ দিয়ে প্রতিটা আয়কর দেখে সেটার সঠিকতা নিরূপণ করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষ করে, এতো মানুষের দেশে।

২০১৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৫৩ শতাংশ ‘ওইসিডি’ আয়কর সংস্থাগুলো ‘প্রেডিকটিভ’ মডেলিং ব্যবহার করেন এ ধরনের প্যাটার্ন বের করতে। সেই প্যাটার্ন বের করা থেকে শুরু করে, তাদেরকে দিয়ে সঠিক আয়কর নিরূপণ করে আয়কর প্রদানকারী সংস্থা অথবা ব্যক্তির কাছ থেকে স্বচ্ছতা এবং সমঝোতার ভিত্তিতে সেই টাকা আদায়ের ব্যাপারটিকে একটা ‘প্রসেস অটোমেশন’র মধ্যে ফেলেছে অনেক দেশের সংস্থাগুলো। এই কাজগুলো

দেখে মাথা খারাপ হয়ে যাবে আপনার। কারণ, একটাই। ডেটা মিথ্যা বলে না।

আয়কর সংস্থার জন্য বুদ্ধি শনাক্তকরণ

এখানে আমার মনে হয়েছে, একটা আয়কর সংস্থার জন্য বুদ্ধি শনাক্তকরণ (কোথায় টাকা কম দেখানো হচ্ছে বারবার), সেটার ‘অ্যানালাইটিক্যাল’ অর্থাৎ চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং সেটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সেটা বের করে আগে। এর পাশাপাশি, ফলাফল মূল্যায়নের জন্য বেশির ভাগ কর সংস্থাগুলো শুরুতে জেনেরিক মডেল ব্যবহার করে। সেই মডেলগুলো দক্ষতা পেতে থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। মানুষের অভিজ্ঞতার মতো। যতো ডেটা, তত ভালো কাজ করে এই মডেলগুলো।

আয়কর এবং এআই

To manage the changing tax landscape, alongside the increased use of analytics, tax authorities and tax advisors are starting to explore the possibilities for deploying sophisticated data analytics and Artificial Intelligence (AI) in tax to facilitate compliance and assist professionals and their clients with commonly encountered questions.

—Artificial Intelligence, Entering the world of tax, Deloitte Insight

আমার দেখামতে, আয়কর সংস্থাগুলো বিভিন্ন ধরনের মডেল ব্যবহার করছিল বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিশেষ করে যখন যেটা কাজে লাগে। ‘প্রডিকটিভ অ্যানালাইটিকস’ অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণগুলো সম্ভাব্য সমস্যাগুলোর পূর্বাভাস দেবার চেষ্টা করে, যাতে আয়কর সংস্থাগুলো একটা সমস্যা তৈরি হবার আগেই তার ব্যবস্থা নিতে পারে। এদিকে ‘প্রেসক্রিপটিভ অ্যানালাইটিকস’ অর্থাৎ ‘ব্যবস্থাপূর্ণ’ বিশ্লেষণগুলো সংস্থাগুলোকে নতুন একটা কর ব্যবস্থা তৈরি করার আগে অথবা পরে করদাতাদের ওপর সেই নতুন নীতিমালাগুলো কীভাবে প্রভাব ফেলছে অথবা ফেলবে, সেটার মডেল তৈরিতে সাহায্য করছে।

এটা একটা বিশাল প্রাপ্তি, ঘটনাকে সিমুলেশন করে। ঘটনা ঘটান আগে অথবা পরে করদাতারা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন, সেটার

মডেল। এর পাশাপাশি মডেলের ধারণায় আয়কর সংস্থা নতুন কোনো সেক্টর (অথবা কোন জিনিসগুলো নতুন সেক্টর হিসেবে খোলা যায়), বিভাগ বা কিছু নির্দিষ্ট কেসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ বেছে নিতে পারে, যেটা কাজ করবেই। সম্প্রতি নতুন এই পন্থাগুলো দিয়ে ব্যবহৃত মডেলের বিভিন্ন অংশকে একসঙ্গে যুক্ত করে ভালো ফলাফল পাচ্ছে বিভিন্ন দেশ।

বিহেভিয়ারিয়াল সায়েন্স^{২৩}, মানুষের মনের কথা

ইদানীং দেখছি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য এবং আরও কিছু কর কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সমর্থিত বেশ কিছু মডেল তৈরি করতে শুরু করেছে, যা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি অথবা কোম্পানিগুলোকে শনাক্ত করে তার আগের প্যাটার্ন দেখে বের করে যাতে তাদের উদ্ভাবিত কোন কোন রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াগুলো (একেক কোম্পানির জন্য একেকরকম) তাদের জন্য কাজ করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিয়ে কোন কোন কৌশল সেই কোম্পানি সহজেই মেনে যাবে, সেগুলো বের করার মডেল চালু হয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বললে, কোম্পানির মনের কথা পড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেটা পদ্ধতি বের করবে, যেটা কাজ করবেই।

সেই মডেলগুলোর কোন আউটপুটের ভিত্তিতে কোম্পানি/ব্যক্তি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাবে অথবা সহজে মেনে নেবে বলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ‘প্রেডিকশন’ অর্থাৎ অনুমান করার চেষ্টা করে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, মডেলগুলো ডেটার সাহায্য নিয়ে ভালোভাবে কাজ করেছে। এই কৌশলগুলো, যা মানুষের ‘আচরণ’ বিজ্ঞানের পাশাপাশি ডেটা মাইনিংয়ের ভেতরে ঢুকে, সংস্থাটির পক্ষে যেই ‘প্রতিনিধিত্বকারী’ কেসগুলো ঠিক করে দেবে। এর পাশাপাশি, সেগুলোকে অধাধিকার হিসেবে নিয়ে তা নিশ্চিত করার কাজটা করে মডেল। ফলে রাজস্ব আদায় হয়, দুপক্ষকে খুশি রেখে। নীতিমালা মেনে।

২৩. তবে, আমি যখন ডেটা দেখি তখন অবাক হই, একটা বিশাল সম্ভাবনার ওপর বসে আছি আমরা।

আয়কর প্রদানকারীদের যথার্থ পরিষেবা এবং শিক্ষা প্রদান

মনে আছে তো, আয়কর সংস্থার আরেকটা বড় কাজের কথা? আমার ধারণা, এটা বিশাল কাজ। প্রথম কাজ শুনেছেন আগে। দ্বিতীয়ত, করদাতাদের নীতিমালাগুলোকে আরও সহজ এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সহজে মেনে চলার জন্য আয়কর প্রদানকারীদের যথার্থ পরিষেবা এবং শিক্ষা প্রদান করে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বিশ্বের বিভিন্ন আয়কর সংস্থাগুলো দ্বিতীয় অংশটির জন্য অনেক ধরনের উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসে, যাতে সাধারণ জনগণ আয়কর ব্যাপারটাকে ভীতিকর না মনে করেন। বরং ওই ধারণাগুলো থেকে এতে উৎসাহিত বোধ করেন। দেশ গড়ায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে।

এক সংস্থা, তবে গ্রুপভিত্তিক আলাদা মাথা

প্রেক্ষিকশন

Tax authorities across some countries are using AI models along with analytics to predict higher-risk tax payers. The result is increased revenue collection and lower tax avoidance.

—How AI can help governments manage their money better, Ernst & Young Global Limited

আয়কর ধারণার পূর্বাভাস

কর সংস্থাগুলো সবচেয়ে ভালো ফলাফলের জন্য স্পেসিফিক কিছু নাগরিকদের অথবা সংস্থাগুলোকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে— তাদের সঙ্গে কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে আলাদাভাবে যোগাযোগ করলে যথাযথ আয়কর নিয়ে আসা যায়। তার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেমগুলোকে ব্যবহার করতে পারে গ্রুপভিত্তিক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলো হবে পূর্বাভাস দেবার জন্য একটা অসাধারণ টুলকিট।

আমার পড়া কেস স্টাডিতে একটা আয়কর সংস্থার একজন বিশ্লেষক উল্লেখ করেছেন যে কোনো ব্যক্তি অথবা একটা সংস্থার যদি ‘শুরুতে আয়কর পরিশোধ না করার ট্র্যাক রেকর্ড থাকে, এদিকে তাদের আর্থিক তথ্য যদি বলে যে তারা বেশ ভালো করছে’ তাহলে একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা মডেল বলতে পারে এই সংস্থা অথবা ব্যক্তির ‘ফিন্যান্সিয়াল

স্টেটমেন্ট' ভালো দেখাচ্ছে তবে তারা আয়কর সময়মতো দেবার জন্য আলাদাভাবে কাজ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, গতানুগতিক চিঠি চালাচালির মধ্যে না গিয়ে তাদের সঙ্গে বসে কীভাবে একটা সময়ের মধ্যে প্রণোদনা দিয়ে একটা ভালো পরিমাণের টাকা উদ্ধার করে নিয়ে আসা যায়, সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাহায্য করতে পারে।

মানুষের 'আচরণ' বিজ্ঞান এবং ডেটা মাইনিং

দেখা গেছে, নাগরিকদের এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ স্কোর করছেন এই নতুন মডেলে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের কী ধরনের প্রক্রিয়া হতে পারে, সেগুলো আসবে আচরণ বিজ্ঞান এবং ডেটা মাইনিংয়ের ফলাফল থেকে। এর পাশাপাশি আয়কর প্রদানকারী সেই নাগরিক এবং সংস্থাগুলোর ফিরতি প্রতিক্রিয়া প্রতিবছর মডেলে ইনপুট দিয়ে রাখলে এই মডেলগুলো একদম মানুষের মতো করে আচরণ করতে পারবে। আমার 'ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং'য়ের অভিজ্ঞতা বলে, মানুষের আচরণের অনেকটুকুই অনুকরণ করতে পারছে বর্তমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলগুলো।

মানুষের বিহেভিয়ারিয়াল সায়েন্স অর্থাৎ কোন অবস্থায় বা কোন সময়ে কোন ব্যক্তি অথবা সংস্থাগুলো এই আয়কর জমা দেওয়ার ব্যাপারে 'ভালো রেসপন্স' অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া দেখাবে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে আগে। সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভালো ফলাফল দিচ্ছে অন্যান্য সেক্টরে। সেই হিসেবে কোন মানুষটা কবে, কোন জিনিস কিনবে, সেটা বের করা গেলে আয়করও বের করা সম্ভব। সেই ধারণা নিয়ে কাজ করছে অনেক আয়কর আদায়কারী সংস্থা। মানুষের আচরণগত বিজ্ঞান বলে, মানুষ যেকোনো একটা ট্রিগার পয়েন্টে কাজ করে। এক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভালোভাবে জানাতে পারবে সেই ট্রিগার পয়েন্টগুলো কখন, কোথায় এবং কীভাবে লাগাতে হবে।

কোম্পানিগুলোর ট্যাক্স এড়ানোর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য পূর্বাভাস

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আয়কর আদায়কারী সংস্থাগুলোকে একটা রাষ্ট্রকে চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় আয় আনতে গিয়ে একজন ব্যক্তি এবং কোম্পানিগুলোর ট্যাক্স এড়ানোর বিরুদ্ধে লড়াই করার সম্ভাব্য পূর্বাভাস তৈরি করে দেয়। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এ ধরনের মডেলগুলো

প্রায়ই নির্দিষ্ট সেক্টর এবং একই ধরনের কোম্পানিগুলোকে মনে রেখে প্রশিক্ষিত হয় এবং সেখানে অডিটররা প্রতিনিয়ত ঠিকমতো ইনপুট দিলে এই মডেল অসাধারণভাবে কাজ করবে।

ক্লাস্টারিং মেথড, একেক সেগমেন্টে সাদৃশ্যপূর্ণ করদাতা

ডেটা নিয়ে অন্য সেক্টরে কাজ করতে গিয়ে যেটা বোঝা গেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কোনো কোম্পানি ঠিকমতো চলছে কি না সেটারও ধারণা পাওয়া যায়, এই মডেলগুলো থেকে। অনেক আয়কর আদায়কারী এজেন্সি ক্লাস্টারিং মেথড ব্যবহার করে, যেসব করপ্রদানকারী সংস্থা এবং ব্যক্তিরা একই ধরনের, তাদের নিজ নিজ সেগমেন্টে ভাগ করে সরাসরি তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারছে।

অর্থাৎ, কোনো করদাতা একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা বোঝার জন্য এবং তাদের নতুন উপায়ে সেগমেন্ট হিসেবে ভাগ করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন সিস্টেমগুলো ব্যবহার করে কিছু সংস্থা ক্লাস্টারিংয়ের পদ্ধতিগুলোকে পরীক্ষা করে দেখছে।

ডেটার ভেতরের প্যাটার্ন

Some [Tax] agencies are also experimenting with clustering methods, using AI systems to understand which taxpayers are most similar to each other, and to segment them in new ways. Social network analysis is helping to uncover complex VAT frauds that span multiple actors, and AI can be used to augment this as datasets become larger and more complex

—Advanced Analytics for Better Tax Administration, OECD iLibrary, 13 May 2016

সোশ্যাল মিডিয়া এবং মডেলের সংমিশ্রণ

এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যানালাইসিসে কোম্পানিগুলোর জটিল ভ্যাত জালিয়াতিগুলো উদ্ঘাটনে সহায়তা করছে এবং অন্য জায়গায় ঠিকমতো আয়কর দিচ্ছে কি না সেগুলো বের করা যাচ্ছে খুব অল্প সময়ে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটা কাজের একটা কো-রিলেশন আছে। একটা জায়গায় কোনো ঘটনা ঘটলে সেটা ‘ইমপ্লিকেশন’ অবশ্যই আরেকটা জায়গায় থাকবে। এ ধরনের ঘটনা আমরা বাংলাদেশেই দেখছি।

অনলাইন সেগমেন্টে একটা কোম্পানির কাজ এবং আয় যেরকম জাঁকজমকপূর্ণ, তার সঙ্গে ভ্যাট জমার হিসেব মেলাতে গেলে জটিল সমস্যায় পড়েন ভ্যাট গোয়েন্দারা। তবে, এই জিনিসকে ‘ট্যাক্সেশন ডোমেইনে’র একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য নয় বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ‘ইন জেনারেল’ সব ধরনের কাজে লাগানো যেতে পারে। এ ছাড়া, নির্দিষ্ট কেসভিত্তিক আলাদা আলাদা সেক্টর নিয়ে কাজ করতে পারে নির্দিষ্টভাবে এই মডেল।

বাংলাদেশ এবং উৎসে আয়কর কর্তনের হিসেব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে একটু পাশে রেখে একটা কথা বলি। এখনই কী সম্ভব হতে পারে— তার একটা ধারণা। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ডেটাহাব (সবার জন্য ডেটা এক্সচেঞ্জ) ডিজাইন করতে গিয়ে একটা জিনিস বুঝেছি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিটা উৎসে সংযোগ থাকলে রিয়েল-টাইম অনলাইন ভেরিফিকেশন হতে পারত প্রতিটা উৎসে। তাহলে ব্যক্তি/কোম্পানি পর্যায়ে প্রতিটা এন্ট্রি আলাদা করে ‘চেক’ করার প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে একেবারেই। এটা সম্ভব এখনই। সবারই ‘এপিআই’ তৈরি হয়ে আছে সংযুক্ত হবার জন্য। এখন ক্লাউডের রাজত্ব।

এতে ব্যক্তি অথবা কোম্পানিগুলোর আয়কর কর্তনের হিসেব পাওয়া যেত ড্যাশবোর্ডে, যা সাহায্য করতে পারত দেশের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের মানুষগুলোকে পুরো বিষয়টা বুঝতে। কোন সেক্টরে বেশি আয়ের চাপ নিতে পারছে না, সেটার সিমুলেশন চালানো যাবে এখনই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চাইলে এখনই এ ধরনের ‘রিয়েল-টাইম অনলাইন ভেরিফিকেশন’ শুরু করতে পারে। সেটা নিমেষেই কমিয়ে দেবে হাজারো জটিলতা। নীতিমালায় তাদের সেই ম্যান্ডেট আছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট’ ব্যবস্থাপনা

বুদ্ধিমান ‘পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’

শুরু হয়েছে পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম

Bangladesh has signed a \$100 million financing agreement with the World Bank, on Thursday, to improve public service delivery

through an effective, efficient, and transparent public financial management system.

Strengthening Public Financial Management (PFM) Program to Enable Service Delivery program will support the government's PFM Action Plan 2016-2021, according to a press release.

—World Bank helps Bangladesh strengthen public financial management, June 29th, 2019, Dhaka Tribune

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্টে’র মতো কঠিন কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ ছেড়ে দিতে পারেন আস্তে আস্তে, এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপরে। এটা তাদের প্রতিদিনের অ্যাকাউন্টিংয়ের ত্রুটিগুলোকে হ্রাস করবে। এর পাশাপাশি এই ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি চিহ্নিত করতে, ট্যাক্স জালিয়াতি এবং আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে এই ধারণাটা সহায়তা করবে। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হচ্ছে, এ ধরনের ব্যবস্থাপনা, রুটিন প্রক্রিয়াগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করে, সহযোগী এজেন্সিগুলোকে, বিশেষ করে যেখানে এই হিসেব/গণনা হয়, সেখানে মানব ইনপুটকে ‘ফোকাস’ করে সেটার মধ্যে ভুল ইনপুট দেবার আগেই একটা সঠিক ধারণা তৈরি করে দেবে।

নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ডেটা নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এ ধরনের ব্যবস্থাপনা মানুষকে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে ‘ডেটা থেকে অন্তর্দৃষ্টি’ ব্যবহার করে। ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, মানুষের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি ডেটার ইনপুট এ ধরনের ‘ক্রিটিক্যাল’ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সহায়তা করবে। কখন কোন সিদ্ধান্ত সবার জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসবে, সেগুলো নিয়ে ভালো ভিজুয়ালাইজেশন দেয় এ ধরনের টুলগুলো।

এই ধরনের আউটকাম অর্থাৎ ফলাফলগুলো সরবরাহ করতে পারছে এমন প্রযুক্তি— যেমন মেশিন লার্নিং, রোবোটিক প্রক্রিয়া, অটোমেশন এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, যাদের পেছনে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ডেটা প্রসেসিং টুল। তাদের ফলাফলগুলো নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য, ধারাবাহিক, স্বচ্ছ এবং সময় মতো হওয়ার জন্য, এর পেছনের ডেটা (ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান, নিরীক্ষা রিপোর্ট, করদাতাদের উৎস থেকে সরবরাহকৃত ডেটা, ব্যাংক এবং অন্যান্য

মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত ডেটাসহ) সহজলভ্য হওয়া দরকার। সেটা করতে পারে জাতীয় ডেটা এক্সচেঞ্জ, অর্থাৎ ডেটা হাব। এই ধরনের প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি।

কী করতে পারবে এই প্রোগ্রাম?

The program will help improve fiscal forecasting, public budget preparation, and execution, as well as enhance financial reporting and transparency in the ministry of education, ministry of health, finance division, local government division, roads, public works, and local government.

—World Bank helps Bangladesh strengthen public financial management, June 29th, 2019, Dhaka Tribiune

আচ্ছা, এ ছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট’ আর কী কী করতে পারেন?

আর্থিক অপরাধ রোধ ও দুর্নীতির পূর্বাভাস

পৃথিবীব্যাপী আর্থিক অপরাধ দেশগুলোকে এবং আর্থিক পরিষেবা খাতকে জর্জরিত করে চলেছে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী একমাত্র মানি লন্ডারিং এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাধের জন্য ব্যয় হয় প্রায় ৩.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিয়ন্ত্রককারী সরকারি সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থ পাচার শনাক্ত করতে বেশ কয়েক বছর ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

এর ব্যবহারের মাধ্যমে তারা মানব পাচার, মাদক, অস্ত্র বিক্রয় এবং সন্ত্রাসবাদের জন্য তহবিল তোলার কাজকে হ্রাস করতে সহায়তা করছে। উন্নত দেশের সরকারগুলো বিভিন্ন দুর্নীতি এবং জালিয়াতির পূর্বাভাস পাওয়ার জন্য ডেটা থেকে প্যাটার্ন পাওয়ার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার শুরু করেছে।

সরকারি কেনাকাটায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে টাকা সাশ্রয়

সরকারি টাকার একটা বড় অংশ যায় বড় কেনাকাটায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করে কেবল ক্রয় প্রক্রিয়াগুলোকে সহজ করাই নয়, বরং একটা লম্বা সময় ধরে সরকারের পক্ষে কী কী কেনাকাটা হতে পারে সে ধরনের

প্রেডিকশন, আর জন্য প্রয়োজনীয় সাপ্লাই চেইন সুব্যবস্থাপনা অর্থ সাশ্রয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশে যেসব পণ্যের জন্য অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরশীল, এই পণ্যগুলোকে ঠিকমতো সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াগুলোকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাজিয়ে দিতে পারে। সেই পণ্যগুলোর সরবরাহকারীদের সাপ্লাই চেইন ব্যাহত হবার আগেই পূর্বাভাস দেবে এ ধরনের সিস্টেম। এর পাশাপাশি সরবরাহকারীদের সঙ্গে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট তৈরি করে দেবে এই টুল— যাতে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

এর পাশাপাশি, বিশেষত সরকারি চালান প্রক্রিয়াকরণের পুরো অংশকে স্বয়ংক্রিয় করা সম্ভব, যাতে টাকা সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া জালিয়াতির মধ্যে না পড়ে। প্রস্তাবিত ক্রয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংগ্রহের কাজগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করা যেতে পারে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে। একইভাবে সরকারি ব্যয় হ্রাস করার সুযোগগুলো চিহ্নিত করা যাবে এর মাধ্যমে।

পাবলিক সেক্টরের নিরীক্ষণের জন্য অসংগতিগুলো শনাক্ত করা

সরকারি কাজে অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং অর্থাৎ নিরীক্ষণের জন্য প্রচুর ডেটার প্রয়োজন হয়। ডেটা থেকে সত্যিকারের সমস্যা বের করতে গেলে মানুষের পক্ষে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে অনেক বেশি। এ কারণে অনেক বেশি ডেটা প্রসেস করার ব্যাপারটি ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিংয়ের ওপরে। বর্তমানে মানুষ যে কাজগুলো করছে, বিশেষ করে প্রতিটা ফাইলের মধ্যে কী কী সমস্যা রয়েছে, সেটা বের করতে গেলে মানুষ হিসেবে যেখানে ফোকাস দেওয়া উচিত, বিশেষ করে কোন ভুলগুলো ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত, তাহলে মানুষ নিরীক্ষকের ওপরে চাপ কমে।

ডেটা থেকে বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রমাণে বোঝা যায় কোন কাজগুলো জালিয়াতি হয়েছে আর কোন কাজগুলোর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল রয়েছে, এই প্যাটার্ন বের করতে সহজাত ক্ষমতা আছে ডেটার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করলে সরকারের যত খরচের ট্রানজাকশন হয়েছে, তার মধ্যে কিছু অংশ কেউ লুকিয়ে রাখলে, সেই প্যাটার্নটা বের করা সম্ভব। অনেক দেশে বর্তমানে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন অডিটর সফটওয়্যার’ ব্যবহার করছে সরকারি ও বেসরকারি বড় বড় হিসেব মেলাতে গিয়ে।

নিচে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সফটওয়্যারের কিছু সাফল্য, যাকে সহজেই ‘ট্রান্সফার’ করা যেতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেমে।

১. করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সফটওয়্যার সিস্টেমে একটি পৃথক মডিউল সংযোজন এবং ৩৫ লাখ উপকারভোগীকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
২. সফটওয়্যারের পেনশন মডিউল ব্যবহার করে পেনশনারগণকে সরাসরি তাদের ব্যাংক হিসেবে মাসে মাসে পেনশন এবং ভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে। ৩,৮১,০০০ পেনশনার ইএফটির মাধ্যমে পেনশন পাচ্ছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে সব পেনশনারকে ইএফটির আওতায় আনা হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় পেনশন মডিউলের উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।
৩. সরকারি কর্মকর্তারা সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেশের সব স্থানে অনলাইনে পেপারলেসভাবে বেতন বিল দাখিল করতে পারছেন। বর্তমানে প্রায় দুই লাখ কর্মকর্তা অনলাইনে বেতন বিল দাখিল করছেন।
৪. জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেটভিত্তিক সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসেবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। সঞ্চয়পত্রের কিস্তির সুদ এবং আসল নগদায়নের অর্থ ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সঞ্চয়পত্রকে পেপারলেস করা হয়েছে।
৫. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যেন ট্রেজারির বাইরে পড়ে না থাকে, সে উদ্দেশ্যে নগদ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য সফটওয়্যারে নতুন মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। সফটওয়্যার ব্যবহার করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদের ভাতা প্রদানের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫০ লাখের বেশি উপকারভোগীকে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ঘরে বসে চালান জমাদানের উদ্দেশ্যে অটোমেটেড চালান ও ই-চালান বাতায়ন চালু করা হয়েছে।

—সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়

নীতিমালা তৈরিতে এআই

নীতিমালা তৈরিতে কেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?

একটা পত্রিকার প্রতিবেদন, নীতিমালা ঠিকমতো মানা না নিয়ে

ঢাকায় দুই সিটি করপোরেশন ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা সড়ক খোঁড়াখুঁড়ি করে। সড়ক খনন ও পরে মেরামত কার্যক্রমে সমন্বয় ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। সিটি করপোরেশন এলাকায় সড়ক খোঁড়াখুঁড়ির ক্ষেত্রে এসব সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতেই ২০১৯ সালের ‘ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা’ প্রণীত হয়। দুই সিটি করপোরেশন ছাড়া ঢাকা ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, ডিপিডিসি, ডেসকো, বিটিসিএলের মতামত ও সুপারিশ নিয়ে এটি চূড়ান্ত করা হয়েছিল।

—০২ জানুয়ারি ২০২১, প্রথম আলো

যেকোনো নীতিমালা তৈরি করা হয় একটা জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিষয়গুলোর ভালো-মন্দ চিন্তা করে। সেটা তৈরি, তার ঠিকমতো প্রয়োগ এবং কেন ভঙ্গ করছে সেটার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে— ডেটার সাহায্য না নেওয়া। অর্থাৎ সবার ইনপুট নেওয়া হলেও সেখানে অদৃশ্য কিছু সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। যেটা সমাধান করতে পারে ডেটা ড্রিভেন ‘ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম’।

আচ্ছা, নীতিমালা কী? আর নীতিমালার সঙ্গে সিদ্ধান্তের সম্পর্ক কী? কেনই—বা একটা নীতিমালা ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারছি না? শেষমেষ, কেনই—বা সিদ্ধান্তগুলো আমরা ছেড়ে দিতে যাচ্ছি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর? মানুষের দ্বারা, মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, এর প্রতিকার কী?

শুরুতে নীতিমালা। উইকিপিডিয়া খটমটে ভাষায় কী বলছে একটু দেখে আসি।

নীতিমালার সংজ্ঞা

নীতিমালা হচ্ছে সিদ্ধান্ত এবং যৌক্তিক ফলাফল লাভের একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা। মূলত এটি একটি বিবৃতি, যাকে একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের শাসনকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নীতি গ্রহণ করা হয়। কোনো বিষয় বা উদ্দেশ্য উভয়ক্ষেত্রেই নীতিমালা থাকতে পারে। বিষয়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার নীতিগুলো সাধারণত শীর্ষ বিষয়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় করা হয়, যা অবশ্যই অনেক কারণের আপেক্ষিক গুণাবলির ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। ...

...সরকার, বেসরকারি সংগঠন বা গোষ্ঠী এমনকি ব্যক্তিও এই ধারণাটির ব্যবহার করতে পারে। রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশ, করপোরেটের গোপন নীতি এবং সংসদীয় আদেশের নীতি এগুলো হলো নীতিমালার উদাহরণ। নীতিমালা আইনভেদে ভিন্ন হয়। আইন বাধ্য বা বিরত করতে পারে (যেমন কর আদায়সংক্রান্ত আইন) এবং নীতিমালা হলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি, যার ফলে মাধ্যমে সর্বোচ্চ ফলাফল লাভ করা যায়।

সহজ ভাষায় বললে, নীতিমালা এমন একটা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একটা ব্যাপারে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। যেহেতু নিয়ম কেউ মানতে চান না, সে কারণে সবারই ইনপুট নিয়ে বানানো হয় এ ধরনের নীতিমালা, যা সবাই মানতে পারেন। যেমন, অফিসের ‘পাসওয়ার্ড নীতিমালা’। যেহেতু এই ধরনের নীতিমালা কেউ পছন্দ করেন না, সে কারণে সংস্থার নীতিনির্ধারণীতে যারা আছেন, তারা এমন একটা নীতিমালা বানিয়ে দেন, যাতে সবাই একটা ‘ন্যূনতম’ স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখেন।

সবার জন্য নীতিমালা, স্বচ্ছতার ভিত্তিতে

শুরুতে পাসওয়ার্ড নীতিমালা হয়তোবা আরও কঠিন করে লেখা যেত, তবে সবার সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে এবং যেটা প্রতিদিন করা সম্ভব, সে ধরনের ‘ন্যূনতম’ সীমানা রেখে একটা নীতিমালা তৈরি করা হয় পুরো অফিসজুড়ে। নীতিমালার একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে এতে বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যাপারটা খুব ভেতর থেকে দেখা হয়। একটা নীতিমালা পড়ে যাতে কোনো গোষ্ঠী বলতে না পারেন যেখানে তাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। তবে যেকোনো নীতিমালা পরিবর্তন হতে থাকে

ব্যবহারকারীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয় নীতিমালার বিভিন্ন মানদণ্ড।

যেকোনো নীতিমালা এমনভাবে করা হয়, যাতে এখান থেকে সবাই একই ধরনের সুবিধা পায় স্বচ্ছতার ভিত্তিতে। এ পদ্ধতিতে এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে সবাই সুফল পায়। যেমন ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার নীতিমালা। এই পদ্ধতিতে একজন সাধারণ মানুষ কত কম ঝামেলা করে একটা ট্রেড লাইসেন্স পেতে পারে, সেটার কিছু পদ্ধতি তৈরি করে দিয়েছে সরকারি প্রশাসন।

এর পাশাপাশি, এই নীতিমালাগুলো এমনভাবে তৈরি করা, যাতে রাষ্ট্রের সার্বিক নীতিমালার সঙ্গে যায়, যেমন, উদ্যোক্তা তৈরি করা। এই নীতিমালাগুলো সাধারণত সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে হয়ে থাকে, যাতে কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এখানে বৈষম্যমূলক আচরণ না পান। এ কারণে, নীতিমালা তৈরিতে আমার ‘না’ নেই।

ব্যবহারিক ও প্রশাসনিক নীতিমালা

উদাহরণ হিসেবে আরেকটা নীতিমালা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। যেমন, পাসপোর্ট পাওয়ার আবেদনের নীতিমালা। এখানে যেভাবে একজন সাধারণ জনগণ কীভাবে পাসপোর্ট তৈরি করার জন্য আবেদন করবেন তার নীতিমালার পাশাপাশি একজন সাধারণ নাগরিক কী ধরনের ‘ক্রাইটেরিয়া’ পূর্ণ করলে উনি পাসপোর্ট পাবেন, সে ধরনের আরেকটা নীতিমালা থাকছে পাসপোর্ট অফিসের জন্য।

এই নীতিমালাকে খুব সহজে অটোমেট করা যায়, বর্তমান সব নির্ণায়ক এবং মানদণ্ড বজায় রেখে। আমরা এখানে দুটো নীতিমালার কথা বলছি, যার মধ্যে প্রশাসনিক নীতিমালা যেই নির্ণায়ক এবং মানদণ্ডের মধ্য দিয়ে পাসপোর্ট দেওয়া হবে— সেটাকে পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে। এ ব্যাপারে নীতিনির্ধারকদের কিছু ভীতি কাজ করতে পারে, যা পাইলট পর্যায়ে পর্যালোচনা করার স্কোপ থাকে।

আমরা যারা ব্যাপারটাকে সেভাবে বিশ্বাস করি না; তারা একটা ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করার আগে কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একজন ক্রেডিট কার্ড গ্রহীতার ক্রেডিট স্কোর, তাকে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা যায় কি না,

ভবিষ্যতে সে টাকাটা ফেরত দিতে পারবে কি না, এই ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কোনো ধরনের প্রতারণামূলক কার্যক্রম হবে কি না, এই কাজগুলো হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

‘ডেটা ড্রিভেন’ সরকারের ম্যাগনেট

সেভাবে এখন প্রশাসন যেহেতু ‘ডেটা ড্রিভেন’ সরকার হিসেবে তার নিজস্ব সার্ভিস ডেলিভারিগুলোকে আরও সহজতর করে নিয়ে আসছেন, সেখানে এ ধরনের পাসপোর্ট ইস্যু-রিনিউয়াল/অনাপত্তি ছাড়পত্র/ছোট আকারের লাইসেন্স ইস্যু করার একটা বড় অংশ পুরোপুরি কিছু নীতিমালার ধারণায় কয়েকটা লজিক দিয়ে অটোমেট করা যায়। যেখানে মানুষের কোনো স্পর্শ থাকবে না। সবশেষে পাসপোর্ট ইস্যু হবার আগে হয়তোবা মানুষকে সেই লুপে আনা যেতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সেই ভয়টা না কাটছে।

আমরা যেটা দেখেছি অ্যালগরিদম, বিগ ডেটা অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমরা যা-ই বলি না কেন, সবকিছুই সাহায্য করছে মানুষকে ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। এখানে প্রাইভেট সেক্টর যেভাবে তাদের অনেক কাজ ছেড়ে দিয়েছে কিছু স্পেসিফিক অ্যালগরিদম এবং বিগ ডেটা অ্যানালাইটিকসের ওপরে যাতে একটা অ্যালগরিদম সিদ্ধান্ত নিতে পারে মানুষের সাহায্য ছাড়াই। এর পাশাপাশি অ্যালগরিদম কেন এবং কীভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সেটা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচ্ছে সিস্টেমে। এর মধ্যে কোনো ধরনের ‘ওভাররাইডিং’ ফ্যাক্টর থাকলে অর্থাৎ সেই শেষ সিদ্ধান্তকে পাল্টাতে পারে মানুষ। তাহলে ভয় কোথায়?

মানুষের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন যন্ত্রের কাছে; মানুষের সাহায্যে

স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত

AI can be used to enhance the accuracy and efficiency of decision-making and to improve lives through new apps and services. It can be used to solve some of the thorny policy problems of climate change, infrastructure and healthcare. It is no surprise that governments are therefore looking at ways to build AI expertise

and understanding, both within the public sector but also within the wider community.

—AI is here. This is how it can benefit everyone, The World Economic Forum, 01 Sep 2020

সেই একই জিনিস আমরা চাইছি সরকারে, যেখানে প্রতিটি স্তরে ক্ষমতা দেওয়া আছে মানুষের ওপরে। এটা ঠিক যে, অনেক দেশেই এই ব্যাপারটা এখনো ছেড়ে দেওয়া আছে পুরোপুরি মানুষের হাতে। অর্থাৎ একটা ছাড়পত্র অথবা একটা পারমিট দেবার জন্য কাকে কোন পারমিট দেওয়া হবে, অথবা কাকে দেওয়া হবে না, সেই ধরনের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া আছে মানুষের হাতে।

সমস্যা শুরু হয় যখন একজন বা কিছু মানুষের প্রতি মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণ, টাকা-পয়সার লেনদেন এবং প্রসেসের ভেতরে স্বচ্ছতার অভাব হয়। সেখানে মানুষের ‘বায়াস’ অথবা একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের সম্পর্কের কথা চলে আসে। যার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো, তার পারমিট আগে; আর যার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তার পারমিট পরে অথবা সেটা ঘুরতে থাকে।

আমাদের মতো দেশগুলোতে মানুষ ভয় পায় যখন আমরা ধারণা করি মানুষের হাত থেকে সব ক্ষমতা চলে যাচ্ছে যন্ত্রের কাছে। আসলে আমরা যেটা বুঝতে পারছি না: যে কাজগুলো যন্ত্র করছে তা মানুষের সাহায্যের জন্য করছে, যাতে শেষ সিদ্ধান্তটা মানুষ নিতে পারে। এ ছাড়া যেসব ছাড়পত্র কম টাকার লেনদেন অথবা সোজা ধরনের ছাড়পত্রগুলোকে গ্রহণ পুরোপুরি ‘অটোমেট’ করা যেতে পারে শুরুতে। এতে মানুষের ভয় কমতে থাকবে আস্তে আস্তে। বিশেষ করে যন্ত্রের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, যখন ছোট ছোট সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়া হবে যন্ত্রের ওপরে। এ সিদ্ধান্তগুলো তৈরি করে দেব আমরা মানুষ। যেমন, বিমানের ‘অটো-পাইলট’ এখন অনেকটাই নির্ভরযোগ্যতা পেয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

ছোট ছোট সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়া যায় যন্ত্রের কাছে

মানুষের দরকার নেই সব জায়গায়

What if, instead of thinking of automation as the removal of human involvement from a task, we imagined it as the selective inclusion of human participation? The result would be a process that harnesses the efficiency of intelligent automation while remaining amenable to human feedback, all while retaining a greater sense of meaning.

—Humans in the Loop: The Design of Interactive AI Systems, GE WANG, October, 2019

হেলথকেয়ার সেক্টরে এখন প্রচুর ডায়াগনস্টিক টুল এসেছে যেগুলোর পেছনে কাজ করছে মেশিন লার্নিং এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিকস। আমরা সেসব রিপোর্ট মেনে নিচ্ছি কোনো ধরনের প্রশ্ন ছাড়াই। অথচ এ ধরনের রিপোর্ট যা সরাসরি ইম্প্যাক্ট করছে মানুষের শারীরিক অবস্থার ওপর। সেখানে আমরা ছোট ছোট ‘ছাড়পত্র’, ক্লিয়ারেন্স, অথবা অনাপত্তিপত্র অথবা ‘অব্ল টাকার লাইসেন্স’ ছেড়ে দিতে চাচ্ছি না এই অটোমেশনের ওপরে।

মানুষকে এ ধরনের ছোট ছোট সিদ্ধান্ত থেকে বের করে নিয়ে আসলে যিনি সার্ভিসটির গ্রহীতা এবং যিনি সার্ভিস দিতে যাচ্ছেন, সেই দুটো মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হবার সম্ভাবনা কম থাকবে। এগুলো চলবে ‘রুল বেইজড’ সিস্টেমের ওপর। যেমনটা চলছে ব্রিজের টোল কালেকশনের কাজ। মনুষ্যবিহীনভাবে।

দরকার ডেটা শেয়ারিং, সংস্থাগুলোর ভেতরে

ট্রেড লাইসেন্স পেতে যদি বিভিন্ন সংস্থার অনেকগুলো ‘ছাড়পত্র’ অথবা কাগজের ফটোকপি জমা দিতে হয়, যা আসলে দরকার নেই। কারণ, সরকারি সংস্থাগুলো একে অপরের সঙ্গে ‘কানেক্টেড’ থাকলে ট্রেড লাইসেন্স প্রদানকারী সংস্থা বাকি সম্পর্কিত সংস্থাগুলো থেকে ‘ইলেকট্রনিক কোয়েরি’ করে মিলিয়ে নেবে সব তথ্য। ওই ব্যক্তি অথবা সংস্থার ব্যাপারে।

সবশেষে, মানুষ যদি শেষ সিদ্ধান্ত দিতে চান, সেটাও করা সম্ভব একদম শেষ পর্যায়ে। তবে এই জিনিসটাকেও সরিয়ে ফেলতে হবে মানুষের প্রতি মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং স্বচ্ছতা আনার জন্য। আমি এখানে মানুষের সক্ষমতার নিয়ে আলাপ করছি না বরং মানুষের ক্ষমতার কিছু অপব্যবহারের অংশগুলোকে কমিয়ে আনার একটা পদ্ধতি তৈরি করার কথা বলছি।

মানুষকে বের করে আনতে হবে এই ‘অপারেশনাল’ লুপ থেকে

সমস্যা হচ্ছে মানুষকে প্রতিটা জায়গায় বিশেষ করে সিদ্ধান্তের প্রতিটা লুপে আনলে সবকিছুই দেরি হতে পারে বলে এই অটোমেশনের ধারণা। পাসপোর্ট একটা নাগরিক অধিকার, তবে তার জন্য যত ধরনের নিরাপত্তা ছাড়পত্র বা অন্যান্য তথ্যের দরকার হয়, সেগুলো সব সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাছে আছে।

আগেই বলেছি, যেহেতু সরকার ডেটা ড্রিভেন, এতে প্রতিটা সংস্থার মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান এ ধরনের ডিজিটাল প্রশাসনের পূর্বশর্ত। তবে, এখানে বেশ কিছু সমস্যা আছে। সরকার অর্থাৎ যেকোনো দেশের প্রথাগত সরকারের স্ট্রাকচার সাধারণত ডেটাবান্ধব নয়। সেই পুরোনো স্ট্রাকচার থেকে নতুন স্ট্রাকচারে আসতে সময় লাগছে বেশ কিছুটা। তবে এ ব্যাপারে সাহায্য করছে নতুন প্রজন্ম, তাদের ডিজিটাল লিটারেসি অর্থাৎ সক্ষমতা দিয়ে।

সরকারগুলোর নতুন কার্যপদ্ধতি: নীতিমালার স্ট্যান্ডার্ডগুলোর যোগসূত্র

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রচুর ডেটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একটা জিনিস বোঝা গেছে: বিশ্বজুড়ে সরকারগুলোর ওপর গভীর ইম্প্যাক্ট ফেলছে এর নতুন কার্যপদ্ধতি। এত বছর সরকারগুলো যেভাবে নিজেদের চালাত, সেই ফ্রেমওয়ার্ক থেকে বের হয়ে নতুন ধারণায় নিজেদের সন্নিবেশ করানো একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ।

সুতরাং, এই বিষয়টির ব্যাপারে সরকারের যারা গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করছেন, তাঁরা এবং ‘স্কলার’, যারা ডেটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করছেন, তাদের একটা যোগসূত্র হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়টির বিশ্লেষণগুলোকে ঠিকমতো উপস্থাপনা করা গেলে এই

নতুন পদ্ধতি জনগণের সার্ভিস ডেলিভারিতে ভালো ‘ইম্প্যাক্ট’ ফেলবে। প্রশাসনকে তখন জনমুখী বলা যেতে পারে।

এর পাশাপাশি যারা প্র্যাকটিশনার, অর্থাৎ সরকারের ভেতর এই তত্ত্বকে অনুসরণ করছেন, সে ধরনের অনুশীলনকারীদের একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা উচিত, যাতে বর্তমান অবস্থা থেকে নতুন অবস্থায় উত্তরণের জন্য যা যা নীতিমালায় পরিবর্তন করা প্রয়োজন, সেটার বিশ্লেষণ আসবে সামনে।

ডেটার ব্যবহারের ধারণা পাবলিক সেক্টরে নতুন নয়, তবে সেটাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনগুলোর সম্ভাব্য এবং প্রকৃত ব্যবহার সরকারি খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন কোন জায়গায় তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক— বিবেচনার দিকগুলোকে প্রভাবিত করবে, সেটা জানা জরুরি।

অনেক গল্প হলো, কিন্তু নীতিমালা তৈরি হয় কীভাবে? আর সেটাকে ডেটা দিয়ে তৈরি না হলে টেকসই হবে কি?

সিদ্ধান্তে অ্যালগরিদমের ব্যবহার

ডেটা ড্রিভেন সরকার

The powerful combination of algorithms and digital data, whether as Artificial Intelligence, Big Data Analytics or algorithmic decision-making systems, is supposed to revolutionise not only business, but how government works as well – turning it into a ‘data-driven government’.

—Predictive Analytics and AI in Governance: Data-driven government

সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যালগরিদমের ব্যাপক ব্যবহার

সত্যি কথা বলতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষ অ্যালগরিদমের ব্যবহার করছে বহু বছর ধরে। এর পাশাপাশি, সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্তে অ্যালগরিদমের ব্যবহার চলে আসছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। হয়তোবা এই অ্যালগরিদমগুলো এই মুহূর্তে মানুষের তত্ত্বাবধানে তৈরি করে দেওয়া হলেও আস্তে আস্তে এই অ্যালগরিদম তৈরি এবং প্রণয়ন সবকিছুই চলে

যাচ্ছে মেশিন লার্নিং, বিগ ডেটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে। আমার অভিজ্ঞতা তা-ই বলছে।

এই ‘অ্যালগরিদম’ কী?

অ্যালগরিদমকে আমরা ধরতে পারি সেই ফ্লোচার্টের মতো, যার মাধ্যমে আমরা যেকোনো যন্ত্রপাতির সমস্যা বের করি। যেমন ধরুন, ট্রাবলশুটিং ফ্লোচার্ট। টিভিতে ছবি আসছে না, তবে শব্দ আসছে, তাহলে করণীয় কী, টিভির ছবি ঝিরঝির করছে অথবা ছবি ওপর থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে (আমাদের সময়ের টিভির জন্য প্রযোজ্য) তখন করণীয় কী, সেটা স্পষ্ট বলা থাকে সেই ফ্লোচার্টে। এই ধরনের ফ্লোচার্টে ডান দিকে যদি ‘হ্যাঁ’ হয় তাহলে একধরনের কাজ; আর যদি ‘না’ হয় তার জন্য আরেকটা ফ্লোচার্টের ধারণা দেওয়া থাকে।

কম্পিউটার ভাষায় আমরা অনেক সময় এটাকে ‘ডিসিশন ট্রি’ বলি। যার অর্থ হচ্ছে যদি একটা গাছের গোড়ায় সব সমস্যা নিয়ে শুরু করি তাহলে যতই গাছের ওপরে উঠতে থাকব, ততই ডালপালা, কাণ্ড বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ তত সমস্যাটা ছোট অর্থাৎ ‘ন্যারো ডাউন’ হতে থাকবে। এই সিদ্ধান্তের ‘ট্রি’ আছে সবকিছুর মূলে।

অ্যালগরিদম মানে সমস্যা সমাধানের রাস্তা

তাহলে অ্যালগরিদম কীভাবে সমস্যার সমাধান করবে? অ্যালগরিদমটা তৈরি করা হয়েছে একটা নীতির ওপর নির্ভর করে। এটা সেই রুলসেট অথবা নীতিমালা, যার মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সমস্যাকে সমাধান করা যায়। এই কাজগুলো মানুষ যেভাবে করতে পারে, কম্পিউটারকেও শেখানো হয়েছে কীভাবে এই ধরনের রুলসেটগুলো পড়ে সমস্যাগুলোকে সমাধান করার জন্য একটা একটা করে ‘ডিসিশন ট্রি’ ধরে শেষে তার একটা সমাধানে আসে। সমস্যার সমাধানে ‘ন্যারো-ডাউন’ করে নিয়ে আসে সমস্যাগুলোকে।

এই রুলসেটগুলো হাতেকলমে তৈরি অথবা মেশিন জেনারেটেড হলেও পেছনের ভিত্তি একই। এটা হলে ওটা হবে, অথবা আরেকটা হবে (ইফ-দেন-এলস) অথবা এই জিনিসগুলোর মানদণ্ড হিসেবে পূর্ণ হলে তখন পরের জিনিসটা কাজ করবে। আমার ‘ট্রেড লাইসেন্স’ পাওয়ার ক্ষেত্রে দশটা শর্ত

(উদাহরণ হিসেবে বলছি) পূরণ করতে হলে সেটা পূরণ হওয়ামাত্রই ইস্যু হয়ে যাবে ট্রেড লাইসেন্স আমার নামে।

মানুষকে কিছু ‘অদরকারি’ সিদ্ধান্তের লুপ থেকে বের করে আনা

অ্যালগরিদমকে দিয়ে সিদ্ধান্তগুলো নেবার অর্থ হচ্ছে এখানে মানুষকে সেই লুপে রাখা হচ্ছে না। কারণ, মানুষ এ ধরনের সামান্য (রিপিটেটিভ) কাজের অনেক ওপরে উঠে গেছে। আগে রাস্তার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতেন ট্রাফিক সার্জেন্ট, তবে ব্যাপারটা অনেকখানি অমানবিক হওয়ায় এই জিনিসগুলো চলে গেছে ট্রাফিক লাইটের পেছনের অ্যালগরিদমের ওপর দিয়ে।

এখন আট রাস্তার মোড়েও ট্রাফিক লাইট পুরো শহরের ট্রাফিক অ্যালগরিদমের সঙ্গে সম্পর্ক/কো-রিলেশন মেনে চালিয়ে নিতে পারে ভালোভাবেই। এটা সম্ভব না মানুষের পক্ষে। পুরো শহরকে এক অ্যালগরিদমের আওতায় চালানোর জন্য দরকার নেই মানুষকে। এটা যন্ত্রের কাজ। মানুষের সাহায্যে। যান্ত্রিক কাজে যন্ত্র ভালো।

এলিভেটর এবং গাড়ির সিদ্ধান্তের অ্যালগরিদম

আগে ‘এলিভেটর’ চালাতেন আমাদের মতো মানুষ। এখন এলিভেটরের ভেতরে উন্নতমানের মানুষের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা অ্যালগরিদম বসিয়ে মানুষকে বের করে ফেলা হয়েছে সেই লুপ থেকে। আমরা যখন গাড়ি চালাই, গাড়ির সামনে,-পেছনে এবং দুপাশে অন্যান্য গাড়ি খুব কাছাকাছি এলেই আমাদের অ্যালার্ট করে দেয় গাড়ির ভেতরের সেন্সরের অ্যালগরিদম। এর পাশাপাশি গাড়ির সামনে হঠাৎ করে কিছু চলে এলে চালক হিসেবে আমরা ব্রেক না করলেও সেটাও করে দিচ্ছে গাড়ির সিদ্ধান্ত নেবার অ্যালগরিদম। এর অর্থ হচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি গাড়ির সিদ্ধান্ত নেবার অ্যালগরিদম চালু করেই আমরা গাড়ি চালাচ্ছি আরও ভালো সহযোগিতা পাওয়ার জন্য।

দুই লেনের মধ্যে একটু বেশি সময় গাড়ি থাকলেই জানান দিচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে, মানে এক লেনে আসার জন্য। মানুষের তো চারদিকে চোখ নেই, তবে এখন গাড়ির আছে সেটা। সে কারণে গাড়ির সিদ্ধান্ত নেবার

কিছু ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছি গাড়ির হাতে। আস্তে আস্তে, অটো-পাইলটে চলে যাবে পুরোটাই। মানে, আমাকে অফিসে নামিয়ে গাড়ি চলে আসবে বাচ্চাদের স্কুলে নামাতে। বাচ্চাদের স্কুলে নামিয়ে চলে যাবে দোকানে ডেলিভারি নিতে। এতে সড়ক দুর্ঘটনা কমে আসবে প্রায় শূন্যের কৌটায়।

ওয়াশিং মেশিনের ‘ফাজি’ লজিক

ধরুন, আপনার বাসার ওয়াশিং মেশিনের কথা। সেই কবে থেকে শূনে আসছি ‘ফাজি লজিক’, যা আপনার কাজে সাহায্য করছে প্রতিনিয়ত। যেহেতু কাপড় সাবান দিয়ে ধোয়া, সাবান-পানি ফেলে ভালো পানি দিয়ে পরিষ্কার এবং শুকানো একটা লম্বা সময়ের ব্যাপার, আমরা সাহায্য নিচ্ছি ‘প্রি-ডিফাইন্ড’ অ্যালগরিদমের। সে কারণে কাপড় ধোয়ার শুরুতে একটা সময় ভিজিয়ে রাখা, কাপড় ধোয়া, কাপড়ের মধ্যে বারবার নতুন পানি দিয়ে কাপড় থেকে সাবান-পানি ফেলে দেওয়া এবং শেষে কাপড়গুলোকে শুকিয়ে ফেলা- এ সবকিছুই করছে মানুষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই।

পুরো ৬০ মিনিট কাপড় থাকছে যন্ত্রের তত্ত্বাবধানে, মানুষের কোনো ইনপুট ছাড়াই। এ কাজে অ্যালগরিদম ব্যবহার করছে ওয়াশিং মেশিনের ভেতরের সব সেন্সরের ইনপুট। মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়ের মতো। মেশিনে কাপড় দেওয়ার পর থেকে সেই কাপড়ের ওজন মেপে কতটুকু পানি, অথবা ডিটারজেন্ট, কতবার ঘোরাতে হবে, কখন কখন পানি ছাড়তে হবে এবং নতুন পানি নিতে হবে- এ রকম অনেক কাজ মানুষ ছেড়ে দিয়েছে যন্ত্রের সিদ্ধান্তের ওপরে।

ফেসবুকের নিউজফিড অ্যালগরিদম

অ্যালগরিদমের সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে থাইভেট সেক্টরে এবং সেটার দৃশ্যমান আউটপুট পাচ্ছি তাদের বিভিন্ন সার্ভিস ব্যবহার করে। আমাজন আমাকে চেনে বন্ধুর থেকে ভালো। তার শপিং রিকমেন্ডেশন একদম ‘লাজওয়াব’। এদিকে আপনার-আমার ফেসবুক নিউজফিডে কোন ‘কনটেন্ট’ আসবে, কখন আসবে, কীভাবে আসবে, কোন ক্রমে আসবে; সেগুলো সব নির্ধারণ হয় সম্পর্কিত কিছু অ্যালগরিদমের ইনপুটের ওপর ভিত্তি করে।

ফেসবুকের প্রতিটা কনটেন্ট, আপনার বন্ধুরা অথবা যারা সেই ফেসবুক পেজের সঙ্গে আছেন, তাদের বিভিন্ন ধরনের ‘ইন্টার-অ্যাকশন’ অর্থাৎ উনারা ওই সেই কনটেন্ট নিয়ে যা করছেন, সেটার একটা ‘স্কোরিং’ চলে আসছে আপনি কোন কনটেন্ট দেখবেন অথবা দেখবেন না। ফেসবুক চাইবে না এমন ধরনের কনটেন্ট নিয়ে আসতে, যেটা আপনি অথবা আপনার বন্ধু কখনোই ‘ইন্টার-অ্যাকশন’ করেননি। ফেসবুক অথবা যেকোনো সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম আপনাকে তাদের সঙ্গে ধরে রাখার জন্য ধীরে ধীরে ছোট একটা পছন্দের বলয় তৈরি করে দেবে, যা আপনাকে সব ধরনের কনটেন্ট দেখার জন্য বাধাগ্রস্ত করবে।

আপনি যদি কখনোই একটা মতাদর্শের ব্যাপারে কোনো ধরনের ‘লাইক’, ‘কমেন্ট’ বা ‘শেয়ার’ না করেন, তাহলে ধীরে ধীরে সেই মতাদর্শের কনটেন্ট আপনার নিউজ ফিড থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এর মানে এই নয় যে সেই মতাদর্শ খারাপ, তবে আপনাকে পছন্দের নিজস্ব লুপের মধ্যে রেখে দেবে। এটা একটা খারাপ দিক বটে। আপনার মনে হবে, আপনি যে ‘মতাদর্শ’ অথবা নিজস্ব যেই ‘পারসপেকটিভ’ লালন-পালন করছেন, পৃথিবীর সবাই ওই মতাদর্শের মধ্যে আছেন। এটা একটা হতাশার ব্যাপার। কারণ, আপনি মতের ভিন্নতা দেখে তৈরি হবার মানসিক সক্ষমতা হারালেন। মতের ভিন্নতাকে দাম দেবার কারণে বেশ কিছু দেশ এখনো উদ্ভাবনীতে পৃথিবী সেরা!

তবে, এ ব্যাপারগুলো থেকে আস্তে আস্তে সরে আসছে ফেসবুক। একটা নির্দিষ্টসংখ্যক ‘ভাইরাল’ কনটেন্ট কিছু শতকরা হিসেবে পাঠিয়ে দেয় আপনার ফিডে। তবে বড় বড় কোম্পানির যারা ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দেন, তাদের চাপে পড়ে সত্য এবং মিথ্যা তথ্যের জন্য নতুন কিছু অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সত্য/মিথ্যাকে তারা চমৎকারভাবে ‘ট্যাগ’ করতে পারছে। আর এই সবকিছুই ঘটছে অ্যালগরিদমের কল্যাণে। মানুষের স্পর্শ ছাড়াই।

শ্রম চাহিদা ও বেকারদের (লেবার মার্কেট) সহায়তা অ্যালগরিদম

ইউরোপের অনেক দেশে তাদের বাজারে শ্রম চাহিদা (লেবার মার্কেট) এবং বেকারদের সহায়তা করার জন্য অ্যালগরিদম দিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে ২০১৪ সালে। কোন স্পেসিফিক মানুষটাকে এই ব্যাপারে সহায়তা করতে হবে এবং কী ধরনের সহায়তা করতে হবে,

সেই জায়গায় তাদের কিছু প্রশ্ন দিয়ে ওই মানুষটা শ্রমবাজারে ঢুকতে পারবে কি না সেটা যাচাই করে। একজন মানুষ শ্রমবাজারে জন্য প্রস্তুত নাকি— এখনো প্রস্তুত নয়, সে ধরনের একটা ‘ক্ল্যাসিফিকেশন’ অর্থাৎ হ্যাঁ/না দিয়ে আলাদা করে ফেলতে পারে তাদের অ্যালগরিদম দিয়ে।

স্বাস্থ্যসেবা খাতের বিলের সত্যখান অর্থাৎ ভেরিফিকেশন

স্বাস্থ্য খাতের বিল

The government of Berlin uses AI to identify possibly fraudulent health bills of its civil servants.

—Predictive Analytics and AI in Governance: Data-driven government

সরকারি কর্মকর্তাদের হাসপাতাল খরচ, ওষুধের বিল, বিভিন্ন ডাক্তারের কনসালটেশন ফি, মেডিকেল ডায়াগনস্টিক সার্ভিসের বিলের মধ্যে বাড়তি, ‘প্রতারণাপূর্ণ’ অথবা ‘অযাচিত’ বিল আছে কি না সেটা দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বেশ কয়েকটি দেশের কেসস্টাডি থেকে বলছি, ব্যাপারটা খুবই সহজ। কারণ, অনেক বছর ধরে একটা সিস্টেম যখন কোন ‘বিল’ সঠিক এবং কোনটা সঠিক নয় শেখে পুরোনো ডেটা থেকে। এটা একটা প্যাটার্ন, তবে একটা বিলের কোন অংশ সরকার কর্তৃক পরিশোধযোগ্য এবং কোনটা নয়, সেটা বের করেছে এই মেশিন লার্নিং।

কোন অপারেশনের জন্য কী ধরনের খরচ অথবা কোন ওষুধগুলোর দাম কত হতে পারে অথবা কোন হাসপাতালে কয় দিন থাকলে কত বিল হতে পারে, সেটার যথেষ্ট ধারণা আছে সেই পুরোনো ট্রেনিং ডেটাতে। এভাবে বেঁচে যাচ্ছে প্রচুর সরকারি অর্থ। সিস্টেমের কাজ হচ্ছে একটা প্রশ্নবোধক ‘ফ্ল্যাগ’ তোলা, এই বিলটাতে সমস্যা আছে অথবা আরেকটা বিলে এই ধরনের সমস্যা, যা গ্রহীতার সঙ্গে কথা বলে বিল পরিশোধ করা যায় খুব সহজে।

প্রৈডিকটিভ অ্যানালাইসিস: সামনে দেখা

তবে যেহেতু এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা এবং অসাধারণ কিছু ‘প্রৈডিকটিভ’ অ্যালগরিদম একসঙ্গে কাজ করছে সে কারণে পুরোনো

লম্বা সময়ের ডেটাতে এমন কিছু প্রজ্ঞা লুকিয়ে থাকে অর্থাৎ এমন ধরনের প্যাটার্ন, যা আমরা মানুষ কখনোই ধরতে পারিনি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অনেক বেশি ডেটাতে এমন কিছু ধারণা দেখেছি, যা সচরাচর বোঝার উপায় নেই। কারণ, সেই ধরনের প্যাটার্নগুলো খুব একটা ঘটে না, তবে একটা প্রশাসনের জন্য এই ধরনের জ্ঞান লাভজনক।

কেন ছিনতাই বাড়ছে অথবা কেন মানুষ কাজ হারাচ্ছে, সেটার প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস করলে বেশ কিছু তথ্য থাকতে পারে, যার সঙ্গে বর্তমান শিক্ষার হালের একটা ব্যাপক কো-রিলেশন আছে। কেন বাচ্চারা বাড়ি পালায় অথবা সামনে কোন কোন বাচ্চা বাড়ি পালাতে পারে, সে ধরনের কো-রিলেশন পাওয়া সমস্যা নয়। কাদের মানসিক সমস্যা অথবা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা আছে এবং সেটা কখন আত্মহত্যার দিকে মোড় নিতে পারে, সে ধরনের স্টাডি বাঁচাতে পারে প্রচুর মানুষ, ঘটনা ঘটর আগে।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, কোন বাচ্চাদের রাষ্ট্রের সহায়তা লাগবে অথবা কোন বাচ্চার পরিবারের ভেতরে মাঝেমধ্যে সমস্যা হচ্ছে, সেগুলো বের করাও সেরকম সমস্যা নয়। আমাদের মতো দেশে ‘সোশ্যাল সার্ভিস’ সেভাবে গড়ে না উঠলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের বাচ্চাদের সহায়তায় চালু হয়েছে অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। সেখানে পুরোনো ডেটাসেট থেকে জানা যায় কীভাবে বাচ্চাদের সমস্যা হয়েছিল আর সামনে কী ধরনের সমস্যা আসতে পারে। নতুন বাচ্চাদের স্কুলের পারফরম্যান্স, কয়টা ডাক্তারের ভিজিট অথবা কয়টা মিস হয়েছে, বাবা-মার পুলিশ রেকর্ড জানাতে পারে কখন একটা বাচ্চার ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে। প্রেডিক্টিভ অ্যানালাইসিস। ঘটনা ঘটর আগেই জানাবে।

সামাজিক অ্যালগরিদম: কী ঘটতে যাচ্ছে সামনে?

আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যখন অনেক কমপ্লেক্স ডেটা নিয়ে কাজ করে, তখন সেখানে এমন কিছু প্যাটার্ন দেখে, যেটা সাধারণ মানুষ হিসেবে কখনো আমরা চিন্তা করতে পারি না। তবে সেটা ঘটে। আর, সে কারণেই যত বেশি ডেটা, তত বেশি প্রজ্ঞা। এ ধরনের মেশিন লার্নিং মডেল যেকোনো বাচ্চার ব্যাপারে পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। হয়তোবা ‘সোশ্যাল সার্ভিস’ থেকে সেই

বাসায় একটা রুটিন খোঁজখবরের ভিজিট একটা বাচ্চার জীবন বাঁচাতে পারে।

ডেটা বলছে, আমাদের মতো দেশে যেখানে শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক অবক্ষয় বাড়ছে, সেখানে ব্যাপারটাকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সামগ্রিকভাবে মানসিক সমস্যা। এটা বাড়ছে দ্রুতগতিতে। এই ব্যাপারগুলোকে এখন ধরা যাচ্ছে বিভিন্ন ঘটনাগুলোতে, যা আগে অনেক কম ছিল। মানসিক সমস্যাও এখন একটা বড় সমস্যা যদি আগে থেকে না ধরা যায়। এখন দরকার সামাজিক অ্যালগরিদম, সমস্যা হবার আগেই যাতে সেটাকে ঠিক করা যায়।

নীতিমালা তৈরির ফ্রেমওয়ার্ক, পলিসি সাইকেল

পলিসি সাইকেলের মডেল

Harold Lasswell's popular model of the policy cycle divided the process into seven distinct stages, asking questions of both how and they how public policies should be made. [4] With the stages ranging from (1) intelligence, (2) promotion, (3) prescription, (4) invocation, (5) application, (6) termination and (7) appraisal, this process inherently attempts to combine policy implementation to formulated policy goals.

—Policy cycle, Wikipedia

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং ‘পলিসি সাইকেল’

প্রেমণে সেনাবাহিনী থেকে প্রায় সাত বছরের জন্য আমাকে কাজ করতে হয়েছিল বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে। জনস্বার্থে গ্রাহকস্বার্থ রক্ষা করার জন্য টেলিযোগাযোগ এবং প্রযুক্তি নিয়ে লাইসেন্সধারী কোম্পানিগুলোর ব্যাপারে কী ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, সেগুলো কাজ করতে গিয়ে পরিচয় পেলাম ‘পলিসি সাইকেল’-এর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, এই পলিসি সাইকেল যেকোনো নীতিমালার উন্নয়ন, বিকাশ এবং বিশ্লেষণের জন্য একমাত্র টুল হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এভাবে বলি— হ্যারল্ড লাসওয়েলের কাজ থেকে ধারণা হিসেবে নিয়ে পলিসি সাইকেল ডেভেলপ করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের একজন পরামর্শক শিখিয়েছিলেন ব্যাপারটা হাতেকলমে।

আমার দপ্তরের প্রধান কাজ ছিল টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সধারীদের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, বিধি এবং পরিচালনসংক্রান্ত নির্দেশনা তৈরি, যেখানে রাষ্ট্রপক্ষ, গ্রাহকস্বার্থ এবং পুরো বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ বাজারে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড অর্থাৎ সমতা বজায় রাখতে পারে। এর পাশাপাশি সার্ভিসগুলোর সহনশীল ট্যারিফ অর্থাৎ সেবার দাম— যেমন, ফোনের কলের দাম, ইন্টারনেট প্যাকেজের দামের যৌক্তিকতা, সার্ভিসগুলোর হোলসেল এবং প্রান্তিক পর্যায়ের দামের মধ্যে অসংগতিগুলোকে গ্রাহক পর্যায়ে কীভাবে প্রভাবিত করছে, সেগুলো দেখতে হতো প্রতিনিয়ত।

‘পলিসি সাইকেল’, সব নীতিমালাই সম্পর্কিত

ডায়নামিক পলিসি

The Dynamic Public Policy-Cycle has the potential to generate better and more inclusive solutions to complex societal problems in a more efficient way. In this way, the public policy-cycle becomes more agile and dynamic as well as allowing for the participation of experts and civil society organizations.

—Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation, July 2020

তবে, এই ৭ বছরে নীতিমালাগুলো তৈরি করতে গিয়ে বিভিন্ন ‘পলিসি প্রসেস’ নিয়ে কাজ করছিলাম, যার মধ্যে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনের মূল চাওয়াটাকে কীভাবে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটা নিয়ে চলত হাজারো ‘আরএন্ডডি’।

এতে ভালো ‘ইনসাইট’ পাওয়া যেত, বিশেষ করে অপারেটর থেকে ডেটা নিয়ে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই ‘পলিসি সাইকেল’ সবচেয়ে ভালো কাজ করে যখন ডেটা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মজার কথা হচ্ছে, এই পলিসি সাইকেলে যখন শুরুতে একটা সমস্যা ঠিকমতো শনাক্ত করা হয় এবং সেই সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে গিয়ে কোথায় কোথায় হাত দিতে হবে এবং তার পাশাপাশি কোন কোন অংশ ঠিক করলে একটা নীতিমালা প্রণয়ন করা যাবে, সেটার ব্যাপারে একটা ভালো ধারণা পেতে হয় ডেটা থেকে।

রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা, শুরুতেই সমস্যাটা কী?

এর শুরুটা হয় একটা রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা (জনপ্রতিনিধি থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে) দিয়ে, যা থেকে কীভাবে একটা পলিসি বা নীতিমালা প্রণয়ন করা যায়, সেটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আসবে সেই সমস্যাগুলোর ডেটা থেকে। সমস্যাটাকে ঠিকমতো শনাক্ত করা একটা বড় বিষয় বটে।

এর পাশাপাশি, এর বাস্তবায়নের সময় কী কী সমস্যা হচ্ছে এবং সেটাকে কীভাবে ‘ইভ্যালুয়েট’ অর্থাৎ কোন ডেটা দিয়ে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, সেটাও দেখার বিষয়। অনেক সময় দেখা যায় যে পরবর্তী কার্যকর অংশে নতুন একটা পলিসি সাইকেলের প্রয়োজন পড়ে। কারণ, সব নীতিমালা একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

প্রথম পর্ব: সমস্যাকে ঠিকমতো শনাক্ত করা

যেকোনো নীতিমালার শুরুতে দরকার হয় একটা ‘সামাজিক সমস্যা’, যাকে রাজনৈতিক অবস্থান থেকে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন হতে পারে। এ ধরনের সমস্যাগুলো আসতে পারে বিভিন্ন রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা, যেমন নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো অথবা এই মুহূর্তে বড় সমস্যা থেকে, যার সমাধান হয়তোবা এখনো সেভাবে নীতিমালায় ‘ম্যাপিং’ অথবা ‘ট্রান্সলেট’ করা সম্ভব হয়নি।

সরকার কীভাবে এ ধরনের সমস্যাগুলোকে ঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারে? বিগ ডেটা অর্থাৎ ‘হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট’ থেকে। প্রতিদিনের পত্রপত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে ঠিকমতো ‘মনিটর’ অর্থাৎ নিরীক্ষণ এবং সেটাকে একই পার্সপেক্টিভ থেকে অ্যানালাইসিস করলে আমাদের দেশে প্রচুর সমস্যা শনাক্ত করা সম্ভব এখনই। গত পাঁচ বছর ধরে কোন কোন বিষয়গুলো পত্রপত্রিকায় এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ‘ভাইরাল’ ছিল, সেটা দেখলেই ব্যাপারগুলো বোঝা সে রকম সমস্যা নয়।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ইন্ডিকেটর এবং উন্নয়নের ডেটাগুলোকে ঠিকমতো বুঝতে পারলে এগুলোকে বোঝা তেমন ঝামেলার নয়। এ ছাড়া, সরকারি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী ‘হটলাইন’ এবং কলসেন্টারগুলো প্রচুর

ডেটা যোগ করছে প্রশাসনের কাজে। প্রতিদিনের অটোমেটেড অ্যানালাইসিস ড্যাশবোর্ডে আনলে, সেখানে অনেক ধরনের সমস্যা পাওয়া যাবে, যেগুলো সমাজকে প্রতিনিয়ত অস্থিতিশীল করে তুলছে। বর্তমানে ডেটা সমস্যা নয়, সমস্যা ঠিক পার্সপেক্টিভ থেকে অ্যানালাইসিসে।

ধরা যাক, সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মকৌশলে সুযোগ-গ্রহীতাকে ঠিকমতো শনাক্ত করা একটা সমস্যা বটে। পৃথিবীজুড়ে, বিশেষ করে আফ্রিকা এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটা দেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে জনগণকে অর্থাৎ একটা বিশাল এবং বিশেষ ধরনের জনগোষ্ঠীকে ঠিকমতো শনাক্ত করতে মোবাইল ফোনের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করছে বিগ ডেটার সাহায্যে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের এখন মোবাইল ফোনগুলো পৌঁছে গেছে সবার হাতে হাতে।

এর অর্থ হচ্ছে, এই যন্ত্রগুলোকে ব্যবহার করা যায় এক একজন মানুষের সঙ্গে এক-একটা হিউম্যান সেন্সর হিসেবে। জিনিসটা সারা দিন থাকে, হয় তার পকেটে অথবা রাতে মাথার কাছে। সেই জিনিসটা থেকে অসাধারণ প্রজ্ঞা পাচ্ছে প্রশাসনগুলো, ‘অ্যানোনমাইজ’ অর্থাৎ কারও নির্দিষ্ট ডেটা না ব্যবহার করে।

বাংলাদেশ সরকার যখন ‘কোভিড-১৯’ অর্থাৎ মহামারির সময় দুস্থ জনগোষ্ঠীকে ঠিকমতো শনাক্ত করতে কাজ করছিল, তখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বেশ কিছু প্রজেক্টের প্রস্তাবনা দিয়েছিল অনেক উন্নয়ন সহযোগী এবং সব মোবাইল কোম্পানিগুলো। সরকারের অন্য পদ্ধতিগুলোর (প্রক্সি মিনস) সঙ্গে বিশেষ করে দুস্থ জনগোষ্ঠীকে (অথবা যারা কয়েক মাসের মধ্যে ওই সীমানায় চলে যাবেন) ঠিকমতো শনাক্ত করতে প্রচলিত টুলগুলোর তার পাশাপাশি মোবাইল ফোনের ব্যবহারের হার, কখন ব্যবহার হচ্ছে, কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, ইনকামিং ও আউটগোয়িং কলের হার, সেই ফোনটা তার বাসা থেকে আর কোথায় কোথায় যায়, অর্থাৎ কত বৃত্তাংশে উনি ঘুরছেন এবং কত দূরে যেতে হয়, ফোনের এয়ারটাইম কত টাকা করে এবং কীভাবে ভরা হয়, কখন ভরা হয়, কত টাকা অন্যকে দেওয়া হয়, টাকাগুলো নিজে ভরেন না অন্য কেউ ভরে দেন, কী ধরনের সার্ভিস কেনেন- এ ধরনের তথ্য বেনামে অর্থাৎ ‘অ্যানোনিমাস মোডে’ নিয়ে অসাধারণ লেভেলের দারিদ্র্যের মাপকাঠি তৈরি করা যায়।

এর সঙ্গে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসগুলোর একই ধরনের তথ্য ব্যবহার করলে একজন প্রকৃত দুস্থ মানুষকে শনাক্ত করা কোনো সমস্যাই নয়। এ ধরনের ডেটা খুব কাজে লাগে, যখন একটা দেশ অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যায়, বিশেষ করে ‘খাদ্যনিরাপত্তার’ অংশ থেকে। এর পাশাপাশি মানুষের ইনপুট থেকে বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যম এবং হাটবাজার থেকে খাদ্যশস্যের দাম ট্র্যাক করে বোঝা যায় জনগণ সেগুলো ঠিকমতো কিনতে পারছেন কি না। এর সঙ্গে মানুষের কেনার সামর্থ্যের যে ইন্ডিকটর রয়েছে, তার অ্যানালাইসিস করলে সামনে কোন কোন জিনিসের দাম বাড়তে বা কমতে পারে, সেটার একটা ভালো ‘ফোরকাস্টিং’ করা সম্ভব।

ডেটা থেকে নীতিমালা প্রণয়ন

সামাজিক একটা সমস্যা যখন রাজনৈতিক অ্যাগেন্ডার ভেতরে ঢুকে যায়, তখন রাজনৈতিকভাবে ওই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। সব ধরনের নীতিমালা শুরু হয় একটা ফাইনাল আউটকাম দিয়ে, জনগণের জন্য সমস্যা সমাধানের জন্য কোন রাস্তায় হাঁটলে ব্যাপারটাকে সহজে এবং সর্বজনীনভাবে সবার উপকারে আসবে। এ ব্যাপারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটা অ্যানালিটিকস এ ধরনের মডেলের ঝামেলাপূর্ণ অংশগুলোকে আসল নীতিমালার সমস্যার সঙ্গে ম্যাপিং করে একটা প্রমাণভিত্তিক অর্থাৎ ‘এভিডেন্স বেইজড’ নীতিমালা প্রণয়ন সম্ভব হয়। মানে সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মানুষ প্রমাণগুলোকে মিলিয়ে দেখবে।

২০০৮ সালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে টেলিযোগাযোগ সার্ভিসগুলোর ‘ভয়েস কল’ এবং ‘এসএমএস’-এর মূল্য বোঝার জন্য একটা মার্কেট অ্যানালাইসিস করছিলাম। সত্যি বলতে, একটা ভয়েস কল অথবা এসএমএসের যৌক্তিক দাম নিয়ে আমরা সন্দেহান্বিত ছিলাম। যারা বাজারে প্রতি মিনিটের ভয়েস কল বিক্রি করছে প্রতিযোগিতা ঠিকমতো না থাকলে অপারেটরদের অদক্ষতার জন্য গ্রাহকদের পকেটে কাটলে সেটা গ্রাহকস্বার্থের বিপরীতে যায়।

সমস্যা শনাক্ত করতে গিয়ে যেটা বোঝা গেল, বাংলাদেশের গ্রাহকেরা তাদের ভয়েস অথবা এসএমএস ব্যবহারের জন্য সঠিক অর্থাৎ যৌক্তিক দামটা দিচ্ছেন নাকি অপারেটরদের অদক্ষতার জন্য বেশি পয়সা খরচ হচ্ছে? অনেকে বলতে পারেন যে বাজারে এত অপারেটর, সেখানে প্রতিযোগিতাই সেগুলো ঠিক করে দেবার কথা, সেখানে সিডিকেশন একটা সমস্যা। এর পাশাপাশি, সর্বনিম্ন সিলিং আরও সমস্যা, মানে এই ৬০ পয়সার নিচে নামতে পারবে না।

এই জিনিসটা যখন একটা রাজনৈতিক ‘প্রবলেম স্টেটমেন্ট’ হিসেবে দাঁড়ায়, তখন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রচুর ডেটা প্রয়োজন হয়েছে ‘এভিডেন্স বেইজড’ নীতিমালা তৈরি করতে গিয়ে। তখন দেখেছি ডেটার কথা বলার ক্ষমতা, নীতিমালা তৈরি করতে গিয়ে। ডেটা ভালো ধারণা দেয় একটা বাজার সম্পর্কে। এর পাশাপাশি মানুষের সেই জিনিসটা কেনার সামর্থ্য আছে কি না সেটা বের হয়ে আসে ‘প্রক্সি মিনস টেস্ট’ থেকে। সবই ডেটার খেলা।

‘প্রক্সি মিনস টেস্ট’

The term ‘proxy means test’ is used to describe a situation where information on household or individual characteristics correlated with welfare levels is used in a formal algorithm to proxy household income, welfare or need. Given the administrative difficulties associated with sophisticated means tests and the inaccuracy of simple means tests, the idea of using other household characteristics as proxies for income is appealing.

শুরুতে, এক অপারেটর থেকে আরেকটা অপারেটরে একটা কল পাঠাতে কত পয়সা লাগতে পারে, সেটা জানা জরুরি। প্রতিটা অপারেটরের ডেটা, বিশেষ করে মোবাইল ফোন কোম্পানি অথবা ল্যান্ডলাইন অপারেটর থেকে অন্যান্য দেশের ‘বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং’ দিয়ে শুরু হয় এ ধরনের কাজ। তবে, এর পাশাপাশি যখন একটা ‘কস্ট বেইজড’ অর্থাৎ প্রতিটা কল কম্পোনেন্ট ধরে— খরচের হিসেব নিয়ে একটা মডেল তৈরি করা যায়, যেখানে প্রতিটা অপারেটরদের খরচ অ্যালোকেশনের হিসেব জমা দেওয়া যায় রেগুলেটরকে।

কোথায় কোথায় ফিক্সড খরচ অর্থাৎ কমন খরচ, যার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেগুলোকে কমানোর উপায় নেই, কোথায় ইনভেস্টমেন্টগুলো ইতিমধ্যে ব্যবহার হয়ে গেছে, তাদের যন্ত্রপাতির ডেপ্রিসিয়েশন খরচ, 'রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট' কীভাবে আসছে, বিভিন্ন স্ট্রাকচারাল প্যারামিটার, যা প্রতি মিনিটের ভয়েস কলের মূল্যের সঙ্গে যোগ হচ্ছে, দেশের কর ব্যবস্থাপনা, স্পেকট্রাম, (যদি থাকে, বিশেষ করে মোবাইল অপারেটর) লাইসেন্স ফি, বিভিন্ন ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য বাড়তি খরচ ইত্যাদির ডেটা সবকিছুই যোগ হচ্ছে একটা মডেলে, যা অপারেটরদের আন্তঃসংযোগের প্রতি মিনিট কলের হিসেবের সঙ্গে যোগ হচ্ছে। যদি বর্তমান 'কস্ট স্ট্রাকচারে'র ওপরে মডেল করা হয়, তখন সেখানে 'লং রান ইনক্রিমেন্ট কস্ট' মডেলিং ব্যবহার করে আমরা শেষ পর্যন্ত একটা মডেল বের করতে পেরেছিলাম, যা একটা দক্ষ অপারেটরের জন্য প্রায় প্রতিটা খরচের কম্পোনেন্টকে হিসেবে আনতে পেরেছিল।

কস্ট মডেলিং

Incremental cost methods are a type of bottom-up approach that arguably can improve and facilitate entry and competition. Incremental costing is a form of marginal cost pricing, with the distinction that incremental costs measure the additional cost of providing an increment (instead of just one additional unit), which can be a service or a network element.

—Infrastructure Regulation, body of Knowledge

সেভাবেই একজন অপারেটর আরেকজন অপারেটরের কাছে পাইকারি কত সর্বনিম্ন পয়সায় প্রতি মিনিটে কল পাঠাতে পারবে, সেটা আমরা নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই দুই বছরের ডেটা এক্সারসাইজের মাধ্যমে। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করলে হয়তোবা পুরো জিনিসটাকে নামিয়ে আনা যায় কয়েক মাসে। নেটওয়ার্ক সার্ভিসের বিভিন্ন খরচের অংশগুলোকে যখন একটা ভয়েস কল অথবা ইন্টারনেট সার্ভিসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'রাউটিং টেবিলে' ফেলা হয়, তখন এর মধ্যে সবকিছুই বের হয়ে আসে। সেখানে 'ফরওয়ার্ড লুকিং' অর্থাৎ সামনে একটা সার্ভিসের দাম কত হতে পারে, সেটাও বের করে নিয়ে আসতে পারে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। তার কাছের পুরোনো অর্থাৎ হিস্টোরিক্যাল ডেটা থেকে।

ফিনল্যান্ডের একটা শহরে ‘শিশুকল্যাণ এবং মনোরোগ সেবা’র উন্নয়নে প্রায় ১৪ বছর ধরে ৫ লাখ ২০ হাজার কেস ফাইল ডেটা ব্যবহার করে একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম তৈরি করতে গিয়ে বেশ কিছু জিনিস আবিষ্কার করে। সেই নতুন পদ্ধতিতে তারা প্রায় ২৮০টা ফ্যাক্টরকে আলাদা করে আনতে পারে, যোগুলোর প্রভাব এই শিশুকল্যাণ সার্ভিসে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এ ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম থেকে একটা বাচ্চার খারাপ কিছু হবার আগেই পূর্বসতর্কতা ব্যবস্থা নিয়েছে সেই সংস্থা। ডেটা দিয়ে সম্ভব অনেক কিছুই। সেই বিশ্বাসটা থাকা জরুরি নীতিনির্ধারকদের।

ডেটা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা

একটা নীতিমালা তৈরি করার পাশাপাশি অন্যান্য কোন নীতিমালাগুলো এই নতুন নীতিমালাকে প্রভাব ফেলছে, সেটার ভালো ধারণা পাওয়া যায় ডেটা ড্রিভেন প্রশাসন থেকে। সবশেষে, সেই নীতিমালার কোন কোন অংশগুলো বাস্তবায়নযোগ্য অথবা যোগ্য নয়, সেটাকে বের করতে পারবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। প্যাটার্ন অ্যানালাইসিসে এটা অসংগতি শনাক্তকরণ, অর্থাৎ অ্যানামলি ডিটেকশন। সাধারণ মেশিন লার্নিং মডেল পারে এগুলো করতে।

এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার প্রসেসে একটা এলাকার গণতান্ত্রিক অন্তর্দৃষ্টি অর্থাৎ ‘ডেমোক্রাটিক ইনসাইট’ এবং সামনে কী ঘটতে পারে তার একটা সিমুলেশন নিয়ে বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলাম। তবে, একটা জিনিস বুঝেছি, এ ধরনের প্রেডিকটিভ অ্যানালাইসিস নীতিমালার প্রতিটা বিধির অংশগুলোকে আলাদা করে কীভাবে সেটাকে পুরো জনসংখ্যার ওপর প্রভাব ফেলবে, সেটার ভালো ধারণা তৈরি করা যায়। ডেটার খেলা এখানেই।

ফ্রান্সের সিমুলেশন, কর এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা

ফ্রান্স তাদের কর পদ্ধতির বিভিন্ন নীতিমালা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাগুলোর মধ্যে কিছু ডেটা নিয়ে সিমুলেশন চালিয়ে দেখেছিল কীভাবে একেকটা কর পদ্ধতির নীতিমালা সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাগুলোর ওপর আলাদা করে প্রভাব ফেলেছিল। এই দুটো জিনিসের মধ্যে একটা ‘অপটিমাল’ ব্যালান্স করতে পেরেছে ভালো কিছু মডেল।

এর সঙ্গে সরকারের সামগ্রিক বাজেট এবং একেকটা এলাকার জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মানকে সঙ্গে রেখে কীভাবে কর পদ্ধতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাগুলোকে ভালোভাবে সমন্বয় করা যায়, সেটার জন্য বেশকিছু সিমুলেশন মডেল তৈরি করে তারা। সেটার ফলাফল ভালো বলেই সেটাকে আস্তে আস্তে যুক্ত করেছে আরও সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পগুলোতে।

এর পাশাপাশি— একটা দেশের সবার জন্য একটা ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম অর্থাৎ সর্বজনীন ন্যূনতম ভাতার সঙ্গে কীভাবে অন্যান্য নীতিমালাগুলোকে জনবান্ধব করা যায়, সেটার জন্য তাদের সিমুলেশন প্ল্যাটফর্ম অসাধারণ কাজ করেছে। সর্বজনীন ন্যূনতম ভাতা হচ্ছে ওই রাষ্ট্রের নাগরিক মাত্রই ওই ভাতা পাবেন, আলাদা কোনো যোগ্যতা লাগবে না। এই সিমুলেশন প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য সব কিছু হচ্ছে নীতিমালাগুলোর সঙ্গে সংগতি রেখে, মডেলের সাহায্য নিয়ে। আমরা হয়তোবা ধারণা করছি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একেকটা নীতিমালা পড়ে সেই নীতিমালার কোন কোন অংশ অন্যান্য নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক সেটা বুঝবে কীভাবে?

এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন একটা অবস্থানে চলে এসেছে যেখানে ‘ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং’ দিয়ে নীতিমালা থেকে তার অ্যাকশন পয়েন্টগুলোকে আলাদা করে সেগুলোকে অন্যান্য নীতিমালার সঙ্গে ‘কো-রিলেট’ করতে পারে। ফলে নীতিমালাগুলোর মধ্যে কোথায় কোথায় প্রাসঙ্গিক এবং কোথায় অপ্রাসঙ্গিক এবং কোথায় তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং কোন জায়গাগুলো ‘বাহুল্য’ মানে দরকার নেই (অন্য নীতিমালায় আগে থেকে আছে), সেগুলো বের করে দিতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। সেই কাজগুলো আমি নিজে দেখেছি।

বাংলাদেশের সুবিধা হচ্ছে যেকোনো আইনগত কাগজপত্র এবং আইন শুরুতেই তৈরি হয় ইংরেজিতে। ইংরেজির ‘ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং’ মানুষের থেকেও অনেক ভালো হয়ে গেছে। বাংলাতে ‘ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং’ কাজ শুরু হলেও সেটা ইংরেজির মত সে রকম সক্ষমতা পেতে একটু সময় লাগবে। আমি যেহেতু এই ফিল্ডে কাজ করছি, সে কারণে এ ব্যাপারে একটা ভালো ধারণা আছে। যেহেতু বাংলাদেশের সব আইন, নীতিমালা, বিধি এগুলো শুরুটা ইংরেজিতে করা হয় বলে বিভিন্ন আইনের মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা, বাহুল্যতা অথবা সাংঘর্ষিক অংশ বের করা যায় খুব

সহজে, মানুষের সাহায্য ছাড়াই। সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত ‘ওয়ারগেমিং’ কনসেপ্টে নীতিমালার ধারণা একইভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

ডেটার সঙ্গে নীতিমালার বাস্তবায়ন

প্রশাসন যখন সেই নতুন নীতিমালাকে বাস্তবায়ন করতে যাবেন, তখন তার প্রতিটা অঙ্গ ঠিকভাবে কাজ করছে কি না, সেটা দেখার জন্য ডেটার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। নীতিমালাগুলোর আউটকাম অর্থাৎ সেই নীতিমালা বাস্তবায়ন করলে কী ধরনের ফলাফল আসতে পারে, সেটার ধারণা আসবে যখন সেই দেশের জনগণের ইনপুটগুলোকে ঠিকমতো মনিটরিং করা যাবে। এই মুহূর্তে আমরা ‘সিমুলেশন’ ব্যবহার করব না। বরং, সত্যিকারের ডেটা ভালো কাজ করবে। পত্রপত্রিকা, সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কল সেন্টার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে ঠিকমতো ডেটা সংগ্রহ করে সেটার অ্যানালাইসিস করতে পারলে তার জন্য ভবিষ্যৎ প্রেডিকশন এবং কীভাবে সিদ্ধান্তগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করা যায়, তখন সেটার ব্যাপারে ভালো ধারণা আসবে।

ফিনল্যান্ডের যে সরকারি সংস্থাটা দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাটি চালায় তার নাম হচ্ছে ‘কেলা’। সংস্থাটি আগে থেকেই প্রতিটি সুবিধাভোগীর অ্যাপ্লিকেশন এবং কারা কোন সুবিধা পেতে পারে, সেই পুরো ব্যবস্থাপনাকে স্বয়ংক্রিয় করে ফেলেছে। এটা দিয়ে কে যোগ্য অথবা কার যোগ্যতার সমস্যা রয়েছে, সেগুলোর সিদ্ধান্ত নেবার অংশটিকে ফেলে দিয়েছে রুল বেজড সিস্টেমে। বুঝতেই পারছেন, এই সংস্থাটি এই পদ্ধতিতে ১৫ মিলিয়ন ইউরোর বেশি সামাজিক সুবিধা বণ্টন করে থাকে সুবিধা ভোগীদের সঙ্গে।

সে কারণে এর আইন এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালাগুলোকে, বিশেষ করে কে কী ধরনের সুবিধা পাবেন, কীভাবে পাবেন, কার মাধ্যমে পাবেন, কখন পাবেন, কেমন করে পাবেন সবকিছুকে ম্যাপিং অর্থাৎ ট্রান্সলেট করে এনেছে রুল বেইজড অ্যালগরিদমে। সমস্যা হলেই তখন মানুষ দেখে। তার আগে সব চলছে রুলসেটে। মানুষ লুপে না থাকার কারণে সমস্যা নেই বললেই চলে।

একটা আবেদনপত্র যখন সিস্টেমে আসে, (সরকারের একটাই ‘ফেস’ অর্থাৎ মাথা) তখন থেকে কোন ধরনের তথ্যগুলো হলেই সেই আবেদনপত্রটা যোগ্য

হবে এবং কোন আবেদনপত্রে কী ধরনের ডেটা থাকলে সেটা প্রাধিকার পাবে এবং আবেদনপত্রগুলোতে প্রশাসনের অন্যান্য কোন কোন জায়গায় ইনপুট লাগবে, সেগুলোকে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে রুল বেজড সিস্টেম। কারণ, সব ডেটা তো সরকারের কাছে। কেন এক অফিস বলবে, আরেক অফিসের ওই ছাড়পত্রগুলো নিয়ে আসেন? পুরো ব্যাপারটাকে গতিশীল করার জন্য যে সফটওয়্যারগুলো কাজ করছে— সেগুলোর পেছনে আস্তে আস্তে যোগ হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এ ছাড়া গতি নেই। বিশেষ করে, স্বচ্ছতা এবং গতি আনতে।

কারণ, এই কাজগুলো কখনোই মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। হাজারো রুলসেট, একজন এটা পেলে আরেকজন এটা পাবেন না, আরেকজনের বয়স ৫০ হলে এই সুবিধা পাবেন, ওই এলাকায় এই সুবিধা পাওয়া যাবে— এ ধরনের রুলসেটগুলোকে ঠিকমতো মেলাতে পারবে সফটওয়্যার। আর সেটা মানুষের কাজ নয়। মানুষ রুলসেট তৈরি করে দেবে যন্ত্রকে, যন্ত্র সেটাকে মিলিয়ে করে ফেলবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশালকার এই কাজ সঠিক সময়ে, নিখুঁতভাবে নামিয়ে দিতে হবে।

মানুষের কাজ কী? আমাদের কাছে রয়েছে ড্যাশবোর্ড যা পুরো সিস্টেমের প্রতিনিয়ত সমস্যাগুলো বুঝে সেভাবে রুলসেটগুলোকে আপডেট করে নিচ্ছে। এই একই ব্যবস্থাপনা সম্ভব বাংলাদেশে, যেখানে আমাদের বিশাল জনসংখ্যা এবং কাজের কমপ্লেক্সিটির পাশাপাশি ‘কে যোগ্য’ এবং কখন, কাকে, কোন সুবিধাটা দিতে হবে, সেগুলো মানুষের সাহায্য নিয়ে শুরু করলেও আস্তে আস্তে পুরো জিনিসটাকে অর্থাৎ পুরো ব্যবস্থাপনাকে ছেড়ে দিতে হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে। এ ছাড়া, আমাদের মতো এত জনবহুল দেশে নিখুঁতভাবে এত বড় ব্যবস্থাপনা চালানো অসম্ভব। মানুষের ‘বায়াস’ একটা বড় সমস্যা, সেটা থাকবে না যন্ত্র।

ডেটার সঙ্গে নীতিমালার ‘মূল্যায়ন’, নীতিমালা কাজ করেছে, করেনি

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যেকোনো নীতিমালার মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় যখন এর পেছনে একটা ভালো সময় দেওয়া হয়। তবে, এই মূল্যায়ন তখনই ঠিক হবে যখন এই নীতিমালার থেকে প্রাপ্ত অংশগুলোকে আলাদা করে কীভাবে জনগণের সাহায্যে লেগেছে অথবা লাগেনি সেটা জানা যাবে। সেটার জন্য প্রশাসনকে সেই ব্যাপারে ঠিকমতো ডেটা সংগ্রহ করে সেটাকে অ্যানালাইসিসে ফেললে অনেক কিছু জানা যাবে।

যে ধরনের নীতিমালাগুলোতে প্রযুক্তি এবং নীতিমালার প্রজেকশন একই রাস্তায় হাঁটবে, তখন সেই নীতিমালাগুলোকে পাশাপাশি রেখে তার বিভিন্ন অংশগুলোকে নতুন করে বিন্যস্ত করতে পারবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। যেখানে নীতিমালাগুলো ঠিকমতো কাজ করতে পেরেছে অথবা পারেনি সেটা জানা যাবে। সেখানে ‘এজাইল’ সফটওয়্যার ফ্রেমওয়ার্কের মতো প্রশাসনকে নীতিমালাগুলোকে পুনরায় সমন্বয় করে সর্বজনীন করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারে।

উগান্ডাতে মা এবং শিশুর মধ্যে ‘এইডস’ অর্থাৎ ‘এইচআইভি’ রোগটা কীভাবে সংক্রমণ হচ্ছে, সেটার ব্যাপারে একটা নীতিমালা ঠিকমতো বিন্যস্ত করা গেছে— যখন তারা বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা সেন্টারগুলো থেকে ঠিকমতো ডেটা সংগ্রহ করে সেটাকে অ্যানালাইসিস করতে পেরেছে। সেখানে তারা প্রায় শতাধিক ফ্যাক্টরগুলোকে আলাদা করে কোন কোন ইনপুটগুলো এই সংক্রমণকে কমাতে পেরেছে, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন মডেলকে সুন্দরভাবে কাজ করাতে পেরেছে। ওষুধের সাপ্লাই কখন শেষ হতে পারে অথবা কোন কোন বদ-অভ্যাসগুলো এ ধরনের সমস্যাকে আরও বাড়াতে পারে, সেগুলোকে মাথায় নিয়ে এ ধরনের মডেলকে মূল্যায়ন অর্থাৎ ইভ্যালুয়েট করতে গেলে— নতুন কিছু পদ্ধতির বিন্যস্ত দেখা গেছে সেই কেস স্টাডিতে। এর অর্থ ডেটাই জীবন বাঁচায়।

আমাদের নীতিমালাগুলোকে পাল্টাতে হবে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থাপনায়। সেটার জন্য দরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

সামগ্রিক প্রস্তাবনা

আমাদের এই বিশাল ফ্রেমওয়ার্কের প্রস্তাবনাগুলোকে ভাগ করে ফেলব কয়েকটা স্ট্রাকচারে। প্রথম কয়েকটা ধাপের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সেরকম সম্পর্ক নেই, তবে এই ধাপগুলো ছাড়া পরের ধাপে যাওয়া দুষ্কর হবে। আমাদের কথা ‘এবিসি’ অর্থাৎ এআই, বিগ ডেটা, ক্লাউড। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের জন্য ডেটার ব্যবহারকে দক্ষতার পর্যায়ে নিতে হলে ডেটা যেখানে রাখা হবে, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলোকে ‘হাইব্রিড ক্লাউডে’ নেবার জন্য কিছু আলাপ হয়েছে এখানে। এর পাশাপাশি ডেটাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক এবং কো-রিলেশন বোঝার জন্য ডেটাগুলোকে নিজ নিজ সংস্থার অফিসের পরিবর্তে জাতীয় ডেটা সেন্টারে অথবা দেশের প্রাইভেট ক্লাউডে আনার পরিকল্পনা করতে হবে। এতে সরকারের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মন্ত্রণালয়, চিফ ইনফরমেশন অফিসার

অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অনেক দেশের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে দায়িত্ব নেন একটা ‘সুপার’ লিড মন্ত্রণালয়, যাদের কাজের ধারা হবে ‘ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মন্ত্রণালয়-এর মতো। আপনি জমির নামজারি করবেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাজ, তবে যখন সেটা ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারিতে যাবে, সেটার শেষ কাজটা নামিয়ে দেবে ‘ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মন্ত্রণালয়’। অনেকটাই, আমাদের ‘এক্সেস টু ইনফরমেশন’ প্রজেক্টের মতো, তবে যাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করার সুবিধার্থে। সিঙ্গাপুরের সব মন্ত্রণালয়ের ‘ডিজিটাল’ অংশের কাজে আছে ‘ইনফো-কম মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি’ অর্থাৎ আইএমডিএ।

সবার কাজ একীভূত করে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে দায়িত্বে তারা।
তারাই দেশের ‘ডিজিটাল ফ্রন্ট-এন্ড’।

বাংলাদেশকে পুরোপুরি ‘ট্রান্সফরম’ করতে প্রয়োজন একজন ‘চিফ ইনফরমেশন অফিসার’, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো। তার ধারণা থাকবে দেশের ‘এন্ড টু এন্ড’ ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ব্যাপারে। উনি একাধারে সরকারি কর্মকর্তা এবং দেশের ‘চিফ ইনফরমেশন অফিসার’, প্রতিটা ডিজিটাল সার্ভিসের ইন্টিগ্রেশনের জন্য।

‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট’, ব্লকচেইন ‘ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার’

আমাদের পাঁচটা ডেটাসেট, ক. বাংলাদেশে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (সিআরভিএস), খ. জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাসেট, নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ, গ. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঘ. ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিআরটিএ এবং ঙ. পাসপোর্ট ডেটাসেট, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে নিয়ে একটা একীভূত ‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ তৈরি করা যায় ‘সিআরভিএস’কে ঘিরে।

আমি দেখেছি বেশ কয়েকটি দেশে ব্লকচেইনভিত্তিক ‘আইডেনটিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ তৈরি করেছে। আমরাও এ ব্যাপারে অগ্রগামী থাকতে চাই। আমাদের পাঁচটি ডেটাসেটে ডেটা’র ইন্টেগ্রিটি খারাপ নয়, তবে এর নিরাপত্তা দেবার জন্য একটা ভালো গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম থেকে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, যারা অনেক দেশেই এ ধরনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিচ্ছেন। ‘সিকিউরড’ভাবে। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘জয়েন্ট এন্টারপ্রাইজ ডিফেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ ধারণাটা দেখতে পারি।

উদ্ভাবনা ও চিন্তা করতে শেখা

Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think.

—Albert Einstein

সার্ভিসের প্রসেস সহজীকরণ ধাপ এবং বিভিন্ন উদ্ভাবনা ল্যাব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রাস্তায় হাঁটার শুরুতে আমাদের প্রশাসনের কাজগুলোকে নিয়ে আসতে হবে ‘রুল বেজড’ সিস্টেমে। তার আগে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে কাজের ধাপগুলো। সরকারের যেকোনো ছাড়পত্র, পারমিট, লাইসেন্স অথবা সনদপত্র পাওয়ার জন্য একটি সংস্থা থেকে আরেকটি সংস্থার ছাড়পত্রের ফটোকপি নেওয়া নিরুৎসাহিত করতে হবে। কারণ, একজন সেবাপ্রার্থী সরকারের কাছে আসবেন খালি হাতে, সরকারের আন্তঃসংযোগ, অর্থাৎ আন্তঃসংস্থা ছাড়পত্র গ্রহণের ব্যাপারগুলো থাকবে প্রশাসনের ভেতরেই।

সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়ায় সরকারিভাবে বিভিন্ন ‘এক্সপ্লোরেরটর’, ইনোভেশন ল্যাব, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন উদ্ভাবনা ল্যাবকে যুক্ত করা যেতে পারে একেকটা সংস্থার সরকারি সার্ভিসের সহজীকরণ প্রসেসে। এতে ‘প্রাইজম্যানি’ হিসেবে বড় ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হলে ‘সংস্থাভিত্তিক’ বিভিন্ন সার্ভিসের সহজীকরণ চলে আসবে ছয় মাসের মাথায়। এই সহজীকরণের ফলে যত বেশি সরকারি ফি আয় হবে, সেগুলো থেকে কিছু টাকা প্রনোদনা হিসেবে ফেরত দেওয়া যেতে পারে, যারা সেই নতুন পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণ করবেন। সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে যারা এই সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ‘বেটা টেস্টিং’য়ে যুক্ত থাকবেন তারাও পেতে পারেন একই ধরনের প্রণোদনা।

সেবা সহজীকরণ প্রসেস ম্যাপ তৈরি, সংস্থাভিত্তিক

এ মুহূর্তে একটা কার্যকর এবং নাগরিকবান্ধব সেবা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য বর্তমানে যেই ধাপগুলো নিয়ে সংস্থাগুলো কাজ করছে, সেটার ‘ফ্লো-চার্ট’ দিয়ে ভেতরের বিশ্লেষণ না করলে—অ্যানালগ পদ্ধতির সমস্যাগুলোকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কনভার্ট করলেও সমস্যাগুলো দূর হবে না। সেখানে যেই ‘ওয়ার্ক-ফ্লো’ নিয়ে কাজ করা দরকার, সেই প্রসেস ম্যাপ নিয়ে কাজ শুরু করেছে সরকারের বেশ কয়েকটি সংস্থা। সেখানে যোগ করতে হবে বাকি সংস্থাগুলোকে।

সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়ায় আগে কতগুলো ধাপ ছিল এবং বর্তমানে কতগুলো ধাপ ‘নির্দৈনন্দিন’ প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে পুরো ব্যাপারটিকে ‘ডিজিটাল’

অর্থাৎ সফটওয়্যারে মাইগ্রੇট করলে কতগুলো ধাপ কমিয়ে আনা যাবে, সেটার একটা প্রমিত পদ্ধতি তৈরি করতে হবে বর্তমান পদ্ধতিতে। এর পরে আসবে ‘রুল-বেজড’ সিস্টেম, সেখানে মানুষ আস্তে আস্তে বের হয়ে যাবে সিদ্ধান্তের ‘লুপ’ থেকে।

ইউনিক শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে অনলাইন আবেদনের বাধ্যবাধকতা

ক. সব ধরনের আবেদনের জন্য একটা ইউনিক শনাক্তকরণ পদ্ধতি ব্যবহার, এবং ব্লকচেইনে ‘মাইগ্রেশন’ করার আগে এ মুহূর্তে ‘জাতীয় পরিচয়পত্র’কে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রকে বাধ্যতামূলক করার পরও ‘ব্যাকএন্ডে’ জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাসেট সংযোগ না থাকায় ব্যাপারটাকে ঠিকমতো কাজ করানো যাচ্ছে না। উদাহরণ হিসেবে, ভূমি অফিসে জাতীয় পরিচয়পত্র ডেটাসেটে সংযোগ না থাকলে তথ্য যাচাইয়ের সময়ে ‘নামজারি’তে ভুল তথ্য যেতে পারে।

খ. ‘আন্তঃসংস্থা আন্তঃসংযোগ’ তৈরি করতে হবে সরকারি সকল প্রয়োজনীয় ডেটাসেটের ভেতরে। সরকারের বেশির ভাগ ডেটাই ‘পাবলিক’, সে হিসেবে প্রয়োজনীয় সব সংস্থার ডেটাসেটগুলোকে যার দরকার যতটুকু উন্মুক্ত করে দিতে হবে সরকারি আরেকটা সংস্থার কাছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ছাড়া বাকি সব সংস্থার ‘আন্তঃসংস্থা আন্তঃসংযোগ’ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এতে, শুরুতে ফটোকপি নেওয়া বন্ধ করতে হবে। তখন সংস্থাগুলো এর মধ্যেই নিজেদের প্রয়োজনে যুক্ত হবে ‘ইলেকট্রনিক সার্ভিস বাসে’ যেখানে অন্য সংস্থাগুলো এর মধ্যেই যুক্ত আছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ‘অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস’ প্রমিত করার কাজ করবে ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার’ (বিএনডিএ)।

গ. আইনগত ভিত্তি তৈরি করতে হবে, সব ইলেকট্রনিক যোগাযোগের জন্য। প্রশাসনকে আইন করতে হবে, যেখানে কাগজের পাশাপাশি সব ইলেকট্রনিক যোগাযোগকে আইনগত ভিত্তি দেওয়া সম্ভব হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ইলেকট্রনিক যোগাযোগকে আইনগত ভিত্তি দেবার ফলে তাদের সব কাজ অনলাইনে শুরু হয়েছে সেই ২০০০ সাল থেকে।

এর ফলে, পৃথিবীজুড়ে ‘ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট’-ভিত্তিক অনেক সার্ভিস কোম্পানি এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

ঘ. একজন সেবাগ্রহণকারী সংস্থা অথবা ব্যক্তি, সরকারি ‘ইউনিক শনাক্তকরণ’ পদ্ধতির মাধ্যমে আবেদন করবেন একটা পোর্টালে, যেখানে অন্যান্য সংস্থার ছাড়পত্র হিসেবে তার পত্রের নম্বর যোগ করে দিলেই হবে। যেমন, সেবাগ্রহীতার কাছে ‘জাতীয় পরিচয়পত্র’ অথবা ‘জন্মনিবন্ধন’ অথবা ‘ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর’ হিসেবে শুধু সংখ্যাগুলোকে আবেদনপত্রে যোগ দিলেই চলবে। এর পাশাপাশি কোথাও কোন অন্য সংস্থার লাইসেন্স, পারমিট অথবা ছাড়পত্রের প্রয়োজন পড়লে সেখানে সেই পত্রের সংখ্যার নম্বরটা দিলেই চলবে। কোনো স্ক্যানকৃত ডকুমেন্টকে আপলোড করার প্রয়োজন নেই। সেই ভেরিফিকেশন সিস্টেম অভ্যন্তরীণভাবে (সফটওয়্যারের ‘অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস’র মাধ্যমে) সেই পত্রের নম্বর অনুসারে ‘স্ব’ ‘স্ব’ সংস্থা অথবা বিভাগ থেকে ‘সত্যায়ন’ অর্থাৎ যাচাই করে নিয়ে আসবে।

ঙ. সেবাগ্রহীতাদের বিভিন্ন দপ্তরে স্বশরীরে আসার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এ মুহূর্তে সবকিছুই করা সম্ভব অনলাইনে। সেবাগ্রহীতা ও সেবাদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজন কমিয়ে আনতে হবে। জরুরি সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর ব্যাপারে এ নিয়মের কিছু ব্যত্যয় ঘটতে পারে।

সংস্থাগুলোর মধ্যে ডেটা শেয়ারিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার

ক. সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে ডেটা শেয়ারিং করার আগে সবাই চেয়েছিলেন নিজস্ব ডেটা সেন্টার। আমার অভিজ্ঞতা বলে, সবার জন্য আলাদা করে ডেটা সেন্টার করলে প্রচুর অর্থের অপচয় এবং এই সার্ভারগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য যে ধরনের জনবল দরকার পড়ে, সেটা সরকারের বেতন-ভাতার স্কেল থেকে জোগান দেওয়া দুস্কর। সরকারি ডেটা সেন্টারগুলোতে যে ‘কমন’ অর্থাৎ ‘বেসলাইন’ অবকাঠামো তৈরির প্রয়োজন পড়ে, সেই একই খরচে প্রায় ২০টা সংস্থার ডেটা এক জায়গায় রাখা যাবে।

খ. হাইব্রিড ক্লাউড ডেটা সেন্টারের জন্য একীভূত ইনফ্রাস্ট্রাকচার: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনে সব ধরনের ডেটাসেটকে একই জায়গায় আনার পরিকল্পনা থাকতে হবে। প্রয়োজনে ‘ডিজাস্টার রিকভারি সাইট’ অন্য কোথাও হতে পারে, তবে একটার সঙ্গে আরেকটার ‘কো-রিলেশন’ করার জন্য তাদেরকে কাছাকাছি আসতে হবে। আর এর জন্যই প্রয়োজন হাইব্রিড ক্লাউড।

গ. সরকারি সব ডেটা সার্ভিস আসবে প্রাইভেট সেক্টরের (সর্বনিম্ন ১০ বছরের চুক্তি) চুক্তিবদ্ধ কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে। সরকারের পক্ষে প্রতিবছর হার্ডওয়্যার পাল্টানো/‘আরএমএ’ ইদুর দৌঁড় ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয় বলে সেটা ১০ বছর অন্তর টেন্ডারের মাধ্যমে ‘অ্যাজ আ সার্ভিস’ কিনতে পারে নিয়োজিত সরকার। ডেটার অভ্যন্তরিন নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা থাকতে পারে সরকারি/চুক্তিভিত্তিকভাবে কর্মকর্তাদের হাতে। তবে, সেটা আইনি প্রক্রিয়ায় ঠিকমতো লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার’ (বিএনডিএ)

(এন্টারপ্রাইস সার্ভিস বাস, জাতীয় ডেটাহাব)

এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাস ছাড়া আমাদের সবকিছুই প্রায় অচল। সরকারি ও বেসরকারি সব ডেটা আসতে হবে একই এন্টারপ্রাইস সার্ভিস বাস আর্কিটেকচারে। বাংলাদেশে দুটো জায়গায় এই আর্কিটেকচার আছে, তবে সেটার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা জরুরি। সবাই এন্টারপ্রাইজ সার্ভিস বাসে আসবে, তবে ডেটা শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সংস্থাগুলোর মধ্যে সহজ ‘মেমোরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং’ থাকতে পারে। উদাহরণ হিসেবে—পাসপোর্ট অধিদপ্তর জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার’ দিয়ে সংযুক্ত থাকবে, তবে ডেটা শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সংস্থাভিত্তিক এক পৃষ্ঠার সহজ ‘মেমোরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং’ থাকতে পারে।

ডেটা সেন্টারের প্রাইভেটাইজেশন/পিপিপি^{২৪}, ক্লাউড

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ ডেটা সেন্টার বন্ধ করে দিচ্ছে, একীভূত করার সুবিধার্থে— ক্লাউডে। শুরুর দিকে বাংলাদেশের অনেক সংস্থা নিজস্ব ডেটা সেন্টার তৈরি করলেও পরবর্তী সময়ে সেগুলোর আলাদাভাবে ডেটা নিরাপত্তা এবং ভালো ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার ধীরে ধীরে অন্য সংস্থাগুলোকে নিরুৎসাহিত করছে, আলাদা করে নিজস্ব ডেটা সেন্টার করার জন্য। এগুলোর ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা অনেক খরচের, যখন আলাদা জায়গায় থাকে।

খ. সরকারের ডেটা সেন্টার নীতিমালা অনুযায়ী সংস্থাগুলোর মূল ডেটাসেটগুলোকে আস্তে আস্তে জাতীয় ডেটা সেন্টারে সরিয়ে আনলে ডেটার নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা দক্ষ লোকের হাতে পড়বে। সেদিক থেকে জাতীয় নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আইন প্রয়োগকারী এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের ডেটা সেন্টারগুলো এক জায়গায় করা যেতে পারে। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯/১১ এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মতো ধারণায়— সব নিরাপত্তা সংস্থার ডেটা নিজেদের মধ্যে ‘এক্সচেঞ্জ’ করার সুবিধা কাজে লাগিয়ে তথ্যগুলোকে ‘কো-লোকেশন’ তবে আলাদা ভার্যুয়াল নিরাপত্তা বলয়ে রাখা যেতে পারে।

গ. উন্নত দেশগুলোর সরকারের ‘ক্লাউড ফাস্ট’ নীতিমালা, (কোরা সার্ভিস দিচ্ছে?) ব্যাপারটা দেখলে পুরো ধারণা পরিষ্কার হবে। আমাদের সরকারের ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ব্যবস্থাপনায় যা খরচ হয়, সেখানে তার সিকিভাগ খরচ করলে সেই সার্ভিস যন্ত্রসহ পাওয়া সম্ভব। আমাদের সার্ভিস নিতে হবে ডেটার ব্যবহারে। সেই ১০ বছরে কাজ কত হার্ডওয়ার লাগবে, কখন কোনটা আপগ্রেড করতে হবে, সেটা করবে চুক্তিভিত্তিক কোম্পানি। ডেটা নিরাপত্তার ফ্রেমওয়ার্ক বানিয়ে দেবে তারা, ব্যবস্থাপনায় থাকতে পারে কিছু সরকারি মানুষ।

ঘ. ‘জেইডিআই’ অর্থাৎ ‘জয়েন্ট এন্টারপ্রাইজ ডিফেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ হচ্ছে পেন্টাগনের সঙ্গে মাইক্রোসফটের ১০ বিলিয়ন ডলারের ক্লাউড অর্থাৎ মেঘ চুক্তি। এখানে তারা ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস দেবে

২৪. প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ

পেন্টাগনকে। চুক্তি অনুসারে, মাইক্রোসফট ১০ বছর ধরে পেন্টাগনকে তার আইটি অবকাঠামোকে আধুনিকীকরণের জন্য ক্লাউড-ভিত্তিক কম্পিউটিং ও স্টোরেজ পরিষেবা সরবরাহ করবে।

স্পেকট্রামকে নামিয়ে আনতে হবে সহনীয় মূল্যে

স্পেকট্রামের ন্যায্য দাম কীভাবে হতে পারে?

Spectrum prices should promote efficient use of spectrum. As a vital natural resource, the price of spectrum should be sufficient to ensure that it is valued and used wisely. Use of spectrum provides considerable benefits to the economy and benefits from spectrum should be maximized.

—Guidelines for the review of spectrum pricing methodologies and the preparation of spectrum fee schedules, ITU

শহর এবং গ্রামে মোবাইল ইন্টারনেট এবং আমাদের অফিস, বাসার ব্যবহৃত প্রান্তিক পর্যায়ের যন্ত্রপাতির যোগসূত্রের প্রাণ হচ্ছে স্পেকট্রাম। প্রতিটি দেশের স্পেকট্রাম একটি জরুরি রিসোর্স, যাকে ব্যবহার করে একটা দেশ পুরোপুরি ডিজিটাল সার্ভিস-নির্ভর হয়ে উঠতে পারে। তবে, এই সমস্যার শুরু হয় যখন স্পেকট্রাম ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় না—এর দামের ফারাকের জন্য। স্পেকট্রামের সুখম দাম না হলে সরকার যেভাবে তার ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয়, সেভাবে এই স্পেকট্রাম যদি লাইসেন্সধারী অপারেটররা ঠিকমতো কিনতে না পারে, তখন এই ব্যবহারযোগ্য সম্পদ থেকেও সেই স্পেকট্রামের সুফল পায় না জনগণ।

‘অপরচুনিটি কস্ট’ কী?

In microeconomic theory, opportunity cost, or alternative cost, is the loss of potential gain from other alternatives when one particular alternative is chosen over the others. In simple terms, opportunity cost is the loss of the benefit that could have been enjoyed had a given choice not been made.

—Wikipedia

আর ঠিক এই কারণেই স্পেকট্রামের ন্যায্য দামের হিসেব বের করার জন্য পৃথিবীতে প্রচুর নিয়ন্ত্রক কমিশন মাইক্রোইকোনমিক তত্ত্বের ভিত্তিতে ‘অপরচুনিটি কস্ট’ অর্থাৎ এই স্পেকট্রাম না থাকলে ব্যবহারকারীদের

যত টাকা দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থাপনায় এই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হতো, সেই তত টাকার ফারাকের হিসেব নিয়েই স্পেকট্রামের দাম সমন্বয় করে। সরকার স্পেকট্রামের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না বলে এটাকে বিক্রি করা যাবে না, সেটাই একটা বিপজ্জনক ‘ক্যাচ ২২’ পরিস্থিতি। এতে, জনগণ তার স্পেকট্রামের ওপরে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ফলে, একটা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত না থাকার ফলে জনগণের যে সামগ্রিক ক্ষতি, সেটা স্পেকট্রামের দামের অনেকগুণ বেশি। দাম বেশি পেলাম অথবা কম পেলাম সেই তর্কে না গিয়ে স্পেকট্রামের দাম ধার্য হওয়া উচিত ‘অপরচুনিটি কস্ট’-এর ধারায়। যত তাড়াতাড়ি এই স্পেকট্রাম ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হব আমরা, তত তাড়াতাড়ি দেশ সামগ্রিক একটা ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে।

ডেটা ‘সিকিউরিটি’ সরকারিভাবে নিশ্চিত করা কষ্টকর

গ্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ ছাড়া ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সমস্যা বটে। এ ধরনের অনেক মডেল কাজ করছে পৃথিবীব্যাপী। সেরা কোম্পানি সেবা বিক্রয় করবে ডেটা ‘সিকিউরিটি’ প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস হিসেবে। সরকার কিনবে সার্ভিস হিসেবে। সার্ভিসের ব্যত্যয় হলে সে ধরনের জরিমানার বিধান থাকবে।

ইলেকট্রিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলোকে সিকিউরিটি প্রদান

গত কয়েক বছরে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক উন্নত হয়েছে। এগুলোকে ‘সিকিউর’ করতে হবে, যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো কোনো ঘটনা না হয়। ইলেকট্রিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো বসে গেলে অনেক সমস্যা হতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য ইলেকট্রিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলোকে ‘ফেইল-সেফ’ হতে হবে। সেটার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আক্রমণ থেকে বাঁচার পূর্বাভাস পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

লাইসেন্সবিহীন ওপেনসোর্স প্রযুক্তির ব্যবহার (ছোট স্কেলে)

আমাদের মতো দেশে সরকারে ব্যবহারের জন্য লাইসেন্সধারী সফটওয়্যার এখনো প্রযোজ্য নয়। প্রচুর দেশীয় কোম্পানি দাঁড়িয়ে গেছে, যারা ওপেনসোর্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাৎসরিক ভিত্তিতে সার্ভিস দিতে পারে। আমি নিজে বিশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার চালাচ্ছি— ওপেনসোর্সকে মূল হিসেবে ধরে রেখে। লাইসেন্সধারী সফটওয়্যার এবং প্ল্যাটফর্মের জন্য প্রতিবছর ‘অ্যানুয়াল মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্টে’র নামে যত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়, তার সিকিভাগ খরচ করে দেশীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দিয়ে একই স্কেলের সফটওয়্যার তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। আমার ৩০ বছরের সরকারি অভিজ্ঞতা তা-ই বলে।

সফটওয়্যারের লাইসেন্স যদি পুরো ইনভেস্টমেন্টের একটা বিশাল অংশে চলে যায়, তাহলে সেই ইনভেস্টমেন্ট গলদ রয়েছে। আমার ভালো লাগছে এ কারণে, প্রশাসন বাংলাদেশি অনেক কোম্পানিকে দিয়ে গভর্নেন্ট ‘ইআরপি’ অর্থাৎ ‘জিআরপি’ তৈরি করেছে, যার সুফল পাচ্ছে বর্তমান প্রশাসন।

আমি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রজেক্টগুলো দেখেছি, বেশির ভাগ জায়গায় শুরুতে কমার্শিয়াল অ্যাপ্লিকেশন কিনলেও সেটা থেকে সরে আসছে সবাই। বিশ্বব্যাপী টেক ইন্ডাস্ট্রি ঘুরে যেটা দেখেছি, তার শুরুর সিকিভাগ করতে আমরা কিনি কমার্শিয়াল ডেটাবেইস, অথবা অ্যাপ্লিকেশন, যার অধিকাংশ চলে যায় অ্যাপ্লিকেশনের লাইসেন্স এবং বাৎসরিক মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্টে। একটা প্রজেক্ট মূল্যমান ৫০ কোটি টাকা হলে সেখানে অ্যাপ্লিকেশনের লাইসেন্স এবং বাৎসরিক মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্টে যদি চলে যায় ১৫ কোটি টাকা, যা আসলে কয়েকটা কাগজের মূল্যমানের সমান।

আমি কমার্শিয়াল অ্যাপ্লিকেশন খারাপ বলছি না, বরং আমরা নিজেদের বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ওপেনসোর্স প্রোডাক্ট দিয়ে দেশের বাইরে কাজ পেলেও দেশের বেশির ভাগ কাজ চলে যায় বাইরে। এতে শক্ত ভিত তৈরি হচ্ছে না ভেতরে। আমি নিজেই কয়েকটা বড় বড় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছি, যার মূলমন্ত্র ছিল ওপেনসোর্স। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ডেটাসেট জাতীয় পরিচয়পত্রের চমৎকার ‘এপিআই’ ব্যবহার করেছে মোবাইল অপারেটর এবং অনেকে এই ওপেনসোর্স ফ্রেমওয়ার্কে। এ মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় জাতীয়

পরিচয়পত্র ডেটাসেটের বিশাল ‘এপিআই’ অ্যাক্সেস ওপেনসোর্সে চলতে পারলে বাকিদের সমস্যা থাকার কথা নয়।

প্রশাসনে একীভূত ‘এলড্যাপ ডিরেক্টরি’ সার্ভিস

সরকারি অফিসে বিভিন্ন কাজের ধাপের ওপর ব্যবহারকারীদের ‘রোল’ এবং ‘অ্যাক্সেস রাইট’ ঠিকমতো ব্যবহার করার জন্য একটি ‘একীভূত’ অর্থাৎ ‘দেশব্যাপী ডিরেক্টরি সার্ভিস’ প্রয়োজন। সেখানে মাইক্রোসফটের কমার্শিয়াল ‘অ্যাকটিভ ডিরেক্টরি সার্ভিস’ খুব নামকরা হলেও এখানে ওপেনসোর্স বেশকিছু অল্টারনেটিভ সলিউশন আছে। পৃথিবীর প্রায় সব আইটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা এ ধরনের ডিরেক্টরি সার্ভিস ব্যবহার করে থাকেন, তাদের গ্রাহকদের কোথায় কীভাবে কাজ করবেন তার ক্ষমতায়ন করতে। আমাদের দেশে এখনো যেহেতু স্বাক্ষরের প্রচলন রয়েছে এবং আমরা একে অপরের স্বাক্ষরকে চিনি না বলে ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টের নিরাপত্তার জন্য সব প্রশাসনিক অফিসের মধ্যে ডিরেক্টরি সার্ভিস প্রচলন করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়ার গবেষণায় আনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০% ফান্ড ‘রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ অর্থাৎ সরকারি সেবা সহজীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে বিদেশি পরামর্শদাতা নিয়োগ না করে দেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিভিন্ন গবেষণায় অর্থায়ন করা যেতে পারে। এই বিশেষ অর্থায়ন বাংলাদেশের সমস্যাগুলোকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বরাদ্দ করা যেতে পারে। শহরভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা— যেমন ট্রাফিক, দুর্নীতি দূরীকরণে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হলে সরকারের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশীয় সমস্যার দিকে মনোযোগ দেবে।

প্রণোদনা: উদ্ভাবনা ‘ল্যাব’, এক্সেলেটর এবং ইনকিউবেটর তৈরিতে

দেশের বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর উদ্ভাবনা ‘ল্যাব’, এক্সেলেটর, ইনকিউবেটরগুলো কেন তৈরি করেছে? ৩০+ জনবল দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপের মতো দরকারি একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারলে সেই দেশ কোথায় পৌঁছাবে সেটা চিন্তা করে দেখুন।

দশটা স্কিল দরকার গ্লোবালাইজেশনের জন্য

কোন দশটা স্কিল আমাদের দরকার? আমি নিজে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ‘সোলার + হাউপ’, নাই-ফাই ক্লাস্টার ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের বাজারে স্কিলের একটা বড় গ্যাপ রয়েছে, যা পাওয়া যাচ্ছে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে। বাংলাদেশের ভেতরের অনেক ‘স্পর্শকাতর’ প্রজেক্ট চলে যাচ্ছে ভিয়েতনাম, ভারত, থাইল্যান্ড, এবং আরও কয়েকটা দেশে। তাদের স্কিলসেট আমাদের কাছাকাছি হলেও ওরা ‘গ্লোবাল ট্রেন্ড’ ধরতে পেরেছে। ওরা জানে, বর্তমান ‘সফটওয়্যার ট্রেন্ড’ কোন দিকে যাচ্ছে এবং কীভাবে সেই সফটওয়্যারগুলোকে খুব সহজে (মাইক্রোসার্ভিস ভিত্তিক) ডেলিভারি দেওয়া যায়? কীভাবে একটা সফটওয়্যার নির্দিষ্ট কিছু হার্ডওয়্যারের ওপর ভিত্তি না করেও চালানো যায়। সফটওয়্যার এখন অন্য লেভেলে পৌঁছে গেছে, আমাদের সেটা ধরতে হবে।

সহজীকরণ প্রসেস ম্যাপ থেকে ‘রুল বেইজড’ পদ্ধতিতে কনভার্সন

সরকারি অফিসের সেবা সহজীকরণের জন্য, আমি সরেজমিনে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ডকুমেন্টেশন অনুযায়ী যে কয়েকটা কেসস্টাডি দেখেছি, সেখানে একটা কাজের বর্তমান ধাপ সংখ্যা এবং পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবনার পরে যেভাবে ধাপের সংখ্যা কমেছে, তা খুবই আশাব্যঞ্জক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, সরকারি অফিসের সেবাগ্রহীতাদের জন্য আগের ধাপ থেকে বর্তমান ধাপ প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কমে গিয়েছে। এটা একটা বিশাল কাজ। এই ধরনের উদ্ভাবনা অন্যান্য সরকারি অফিসে নিয়ে যাওয়া হলে সেবাপ্রার্থীদের অনেক দুর্ভোগ কমবে। এর পাশাপাশি, ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টেশনের আদান-প্রদান শুরু হলে সরকারি অফিসে যাওয়া-আসার ব্যাপারটা কমে আসবে।

এর আগেও বলেছি, প্রশাসন— ৬ মাসের মধ্যে সেবাপ্রদানকারী সংস্থাগুলোকে অনলাইনে সেবাগ্রহীতাদের সংস্থার অফিসে না এসে পূর্ণ সার্ভিস ডেলিভারির জন্য সেই সংস্থাকে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত করলে সামনের ১ বছরে সব সার্ভিস সম্পূর্ণ অনলাইনে আনা সম্ভব। সমস্যা প্রযুক্তিতে নয়, সমস্যা আমাদের মানসিকতায়, ইন্টেলেকচুয়াল গ্যাপ। তবে, আমার অভিজ্ঞতা বলে, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সংস্থাপ্রধানের ওপর।

ভর্তুকিকে প্রান্তিক পর্যায়ে নিতে প্রয়োজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি ব্যবস্থায় প্রান্তিক জনগণকে সরাসরি যুক্ত করলে প্রশাসন জনগণের আরও কাছাকাছি চলে আসবে। এতে জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে যতই দূরত্ব থাকুক না কেন, সবকিছুই কমে আসবে, ডেটার ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে। তখন, সবাই স্বেচ্ছায় তাদের ডেটা আপডেট করবেন নিজের প্রয়োজনে। ভর্তুকি ব্যবস্থায় প্রাথমিক অবস্থায় জনগণকে একটি একীভূত শনাক্তকরণ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, যা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় পরিচয়পত্রসহ আরও ৪টি ডেটাসেটের সঙ্গে কাজ শুরু করা যেতে পারে।

তবে, বিদ্যুৎ, কৃষিসামগ্রী থেকে, স্কুলের বইখাতা— সবকিছুই প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব, বিশেষ করে ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায়। এই ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী ব্যবস্থাপনার মতো সমমানের অথবা একই সিস্টেমের মধ্যে কাজ করতে সক্ষম। এখানে ডেটা হাবের মতো প্রয়োজনীয় সংযোগ তৈরি হয়ে আছে দেশের বিভিন্ন ডেটাসেটের মধ্যে। এখন প্রয়োজন সংস্থাগুলোর মধ্যে সহজ ‘ডেটা শেয়ারিং’ চুক্তি।

এআই’র ব্যবহারে সবাইকে সমাজে ফিরিয়ে আনা: মানবিক রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে থাকবে প্রশাসনের মানবিক আচরণ। ইউরোপের ইতিহাস পড়লে বোঝা যায়, কীভাবে ইউরোপ এখন এতো মানবিক চিন্তা করছে? অথচ, তাদের রক্তারক্তির ইতিহাস খুব বেশি আগের নয়। মানুষ ভুল করে এবং সেই ভুলের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হয় প্রচলিত আইন অনুসারে।

তবে, এর পাশাপাশি মানুষ কেন ভুল করছে অথবা কোন সমস্যার প্রেক্ষিতে একজন মানুষ একটা বেআইনি কাজ করেছে, সেটা দেখার সময় এসেছে। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে কোন পরিবেশে কী ধরনের অপরাধ হচ্ছে এবং সেই অপরাধের মূল সমস্যা খুঁজে বের করে সমাধান করছে অনেক উন্নত দেশ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমাদের বিচারব্যবস্থার সংস্কার (আসছে সিরিজ হিসেবে) এবং বর্তমানে যারা বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে সময় কাটাচ্ছেন, সেটার সময়সীমা পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে।

মানুষের জীবন একটাই, তাকে পুনর্বাসন অর্থাৎ সুস্থজীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমাদের। ডেটাই দেখাবে আমাদের সেই পথ। যারা নিজের অজান্তে অপরাধের দিকে পা বাড়িয়েছেন অথবা সামনে না জেনে অপরাধ করে বিপদে পড়তে যাচ্ছেন, তাদেরকে ডেটার সাহায্যে খোঁজখবর নিয়ে আলাদাভাবে কাউন্সেলিং করলে ভবিষ্যতে অপরাধী হবার আশঙ্কা থেকে বের করে আনা সম্ভব।



প্রতিটি মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য, অভিযোজিত শিক্ষাপদ্ধতি, স্বল্পমূল্যে আবাসন, পাবলিক ট্রানজিট সিস্টেম, সরকারি সেবা সহজীকরণ ইত্যাদি কাজে দক্ষতার পাশাপাশি সহমর্মিতার ভিত্তিতে সবার জন্য সব ধরনের সার্ভিস জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে— তাদের নিজে থেকে বলার আগেই।

ঘটনা অথবা দুর্ঘটনার আগাম খবর নিয়ে তৈরি হবে আগাম ধারণার প্রশাসন। একটি শহরের হাসপাতাল, স্কুল অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কোন এলাকায় হলে সবার জন্য সুবিধাজনক হবে— আগাম ধারণার প্রশাসন এসব জানবে ডেটা থেকে। আলোকিত অর্থনীতির দেশগুলো কীভাবে তাদের নাগরিকের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করেছে তার প্রযুক্তি নিয়েই এই বইয়ের গল্প।

~ Artificial Intelligence



9 789849 564881

ADARSHA

+88 02 9612877

+880 1793296202

www.adarsha.com.bd

